গঙ্গা নদীর স্রোত

বিশ্বনাথ সাধুখাঁ

—ঃ পরিবেশক ঃ—
এস, দাস এণ্ড কোং
৩৭/৬ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা—১৩৬৮

প্রকাশক :
এস. দাস
লেক টাউন
কলিকাতা-৫৫

প্রচ্ছদ শিল্পী :
মৃণাল চক্রবর্তী

মুদ্রাকর :
যশোদা মাইতি
লিপি মুদ্রণ
৩৮, শিবনারায়ণ দাস লেন
কলিকাতা-৬

। এক ।

ইন্দিরা দেবী সুবীরকে বললেন, কাকদ্বীপে গেলে তো যেতে পারতিস! ওরা তো অনেকে যাচ্ছে। তুইও যা না—

না, থাকগে, সুবীর বললো, কি হবে ঐ জলা জায়গায় গিয়ে? তা ছাড়া আমার এখনও অনেক পড়া বাকী। সামনের মাসে আবার পরীক্ষা!

কিছু হবে না, তুই-একদিন পড়া বাদ গেলে কিচ্ছু হবে না! তুই-ও যা ওদের সাথে—ষ্টীমারে করে যাবি—কত আনন্দ! আর পনেরোই আগস্টের দিন। কী বা করবি?

সত্যি সত্যিই সুবীরের ইচ্ছে করে যেতে—কোনোদিন সে ষ্টীমার চড়েনি—তবুও সে যেতে চায় না কোথাও। কারণ, এ বাড়ীতে থাকবার সুবীরের কোন অধিকার নেই। বলতে গেলে সে অন্যের দয়ার ওপর বেঁচে আছে। তাই সে চায়, যতদূর সম্ভব সে খরচ বাঁচিয়ে চলবে। এমন কি সে একটাও সিনেমা দেখে না। এ বাড়ীর কর্তা সুধীনবাবু, আজকের এই দুর্দিনে তাঁর অনাবশ্যক পরিবার-বৃদ্ধিতে তিনি মনে মনে কিছুটা অসন্তুষ্ট। কিন্তু স্ত্রীর প্রতি অতিরিক্ত ভালবাসা। সে কথা তিনি কখনো প্রকাশ করেন না। এঁদের পয়সায় সুবীরের লেখাপড়া, খাওয়া-দাওয়া সবকিছু চলে—তাইতেই দিন দিন সে আরো মনমরা হয়ে যাচ্ছে।

মনে মনে তাই সে বললো, কেন মাসীমা, ক'দিন ধরে আমায় এক অনুরোধ করছেন? আমি গেলে আপনি সত্যিই খুশী হবেন, কিন্তু আপনার স্বামী তাতে হবেন অসন্তুষ্ট। সে কথা কি বোঝেন না?

ইন্দিরা দেবী আবার বললেন, কি, ঠিক যাচ্ছ তো?

কি আর করবে, এবারে সুবীর বলে, ঠিক আছে যাবো।

খুশীতে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন ইন্দিরা দেবী। ক'দিন ধরে এ ছেলেটাকে কিছুতেই রাজী করাতে পারছিলেন না। সুবীর দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছে, কোথাও সে যেতে চায় না, খেলবার সাথী নেই। বই নিয়ে তার রাতদিন কেটে যায়।

এখন সে যেতে রাজী হওয়ায় তিনি হাসিমুখে ওর পিঠে হাত রেখে বললেন, যেখানে যেতে চাইবে বলবে, এই বয়সে তো ঘুরবে-টুরবে! কোথাও না বেরোলে দেহ-মন ভালো লাগে?

ইন্দিরা দেবী চলে যেতেই সুবীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবলো—অন্যের মতন আনন্দস্রোতে গা মেলাবার বা গা ভাসাবার তার অবকাশ কোথায়? সে তার অন্তর্জ্বালায় জ্বলে পুড়ে মরছে প্রতিদিন। মৃত্যু ছাড়া কোথায় বা তার শান্তি? সে দশম শ্রেণীর ছাত্র। বয়েস সতেরো। প্রতিদিন সে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছে, পাস সে করবেই। পাস তাকে করতেই হবে। কিন্তু পড়ার সাথে সে তাল রেখে চলতে পারছে না—তবুও সে প্রাণ দিয়ে পরিশ্রম করে যাচ্ছে। ইংরেজীটা হয়েছে তার এক জ্বালা!

সে আজ পর্যন্ত কোনদিন কোনো বিষয়ে ফেল করে নি—অন্ততঃ পাস-সংখ্যাও সে তুলেছে। পরীক্ষায় ফেল আর মৃত্যু তার কাছে সমতুল্য। বেশী নম্বর বড়ো একটা পায় না। এ বছরে সুবীরকে ফেল করলে চলবে না; পাসের জন্য তাকে জীবন দিতে হলেও সে রাজী।

সুবীরদা, পঞ্চাশ হচ্ছে—

শুভ্রা এ বাড়ীর একমাত্র মেয়ে এবং ইন্দিরা দেবীর একমাত্র কন্যা। সুবীর ছাড়া সে আর কারো কাছে পড়তে বসবে না। শুভ্রা আজ রাত্রেও সুবীরের কাছে বসে গুণ শিখছিল। পঁচিশের সাথে পঁচিশ

দিয়ে একটা গুণ করতে দিয়েছিল তাকে সুবীর। আর শুভ্রা আজো তুই সংখ্যায় যোগ করে বসে আছে।

সুবীর বলে, হয় নি! এ ক'দিন তবে কি শেখালুম তোকে?

মুখ কাঁচুমাচু করে শুভ্রা বললো, আমি পারছি না! পঞ্চাশ হবে না? তবে কত হবে?

সুবীরের ইচ্ছা হলো, ওর কান তুটো মুলে দেয়। কিন্তু এ বাড়ীর মনিবের কন্যার গায়ে সে কোনোদিন হাত তোলে নি। তাই নিজেকে সে সামলে নিয়ে বললো, ছয়শো পঁচিশ হবে! দেখো, আমি করে দিচ্ছি—আর কোনোদিন ভুল করবে না—

নৈশ ভোজনের জন্য সুবীরের ডাক পড়লো। সেও বই মুড়ে উঠে পড়লো।

খাওয়ার টেবিলে এসে সে দেখলো অনেক রকম খাবার সাজানো হয়েছে। ওঃ, আজকে বাইরের কয়েকজন লোকের নিমন্ত্রণ ছিল —তাই এত ব্যবস্থা—তাইতে আজ গুরু ভোজন হবে বাড়ীর সবার।

বসে পড়লো সুবীর একটা চেয়ারে।

আজ তার কোনো পেট ব্যথা-ট্যাথা নেই। কাজেই পেট ভরে সে খেতে পারবে।

খাওয়ার মাঝে ইন্দিরা দেবী জিজ্ঞেস করলেন, সুবীর, তোর চিঠিটা পড়েছিস?

এই চিঠির কথাটা সুবীর আজ অনেকক্ষণ ভুলে গিয়েছিল। এখন মনে পড়তেই সব খাবার তার কাছে তেতো বলে মনে হলো। মনটা উদাস ও বিষণ্ণ হয়ে গেল। আঃ, এই খাওয়ার মাঝে কেন তাকে সে কথা মনে করিয়ে দেওয়া হলো!

অরুচি মুখে খাওয়া সেরে উঠে পড়লো সুবীর।

সবাই যে যার ঘরে এখন নিদ্রায় অচেতন।

কিন্তু সুবীরের চোখে এখনো ঘুম আসে নি। আসবেও না,

যতক্ষণ পর্যন্ত সে একটা কাজ সম্পন্ন না করবে।

বিছানা থেকে উঠে পড়লো সুবীর। এ ঘরটায় সে একা থাকে। আস্তে আস্তে সে ঘরের আলোটা জ্বাললো, তারপর জুতোর বাক্স থেকে একটা চিঠি বের করলো।

এ চিঠিটা আজ সকালে এসেছে। ইন্দিরা দেবী এটা সুবীরের হাতে তুলে দিয়ে বলেছিলেন, এই নাও, পড়ো—তোমার বাড়ীর চিঠি। সুবীর ইন্দিরা দেবীর সব কথা পালন করে, কিন্তু এই কথাটা আর পালন কবে না কখনো। সে জানে, প্রতি মাসে তার নামে একটা করে চিঠি আসে এবং সেটা কোথা থেকে আসে, তাও জানে সে ভালো করে। তার বাবা-মা লেখেন সুবীরের নামে।

জুতোর বাক্সে বাটা কোম্পানীর এক জোড়া নতুন জুতো রয়েছে, সেখান থেকে একটা খাম তুলে নিয়ে সুবীর ঘরের কোণে গিয়ে বসলো। তারপর দেশলাই জ্বেলে ওটা ধরালো। দেখতে দেখতে খামটা দাউ দাউ কবে জ্বলে উঠলো, সে মনে মনে বললো, জগতের সমস্ত পাপ এভাবে পুড়ে যাওয়া উচিত—

প্রতি মাসে ইন্দিরা দেবীর হাত থেকে খাম পেয়ে সবার অলক্ষ্যে ঐ জুতোর বাক্সে ফেলে রাখে। তারপর, সেইরাত্রেই সে ওটাকে পুড়িয়ে ফেলে তবে সে স্বস্তি পায়। একবার সুবীর সেরাত্রে আর চিঠি পোড়াতে পাবে নি। সেবারে তো সুবীরের সারারাত ঘুমই হয় নি। বিকেলবেলা হঠাৎ কয়েকজন অতিথি এসে পড়লো, আব অতিথিদের সারারাত থাকবার ব্যবস্থা হলো ঐ সুবীরের ঘরে। সে সারাটা রাত অন্য ঘরে বিছানায় শুয়ে ছটফট করেছে, আর অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে কয়েকবার ওঠানামা করেছে ভূতের মতন। পরদিন দ্বিপ্রহরে ছাদে উঠে চিঠিটা পুড়িয়ে তবে শান্তি পেয়েছে সুবীর।

তারপর সুবীর পোড়া ছাইগুলো একটা কাগজে পুরে গুলি পাকিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে দিল।

কোনদিন সে এ চিঠি খুলে পড়ে নি। চোরের মতন সে রাত্তিরবেলায় চুপি চুপি পুড়িয়ে ফেলে সবার অলক্ষ্যে। সুবীর জানে, মায়েরা এ জগতে একটা বিস্ময়কর। কেননা, ওরাই তো বলে, এই বিবাহিত জীবনে সুখ-আনন্দ কিছুই পেলুম না, শুধু পরের বোঝা টেনে বেড়ালুম ; সংসার মিথ্যে...জগৎ মিথ্যে...। এই কথা যে-মা বলে, সেই মা আবার নিজ পুত্রের সংসার-বৈরাগ্য বা সন্ন্যাসী হবার সাধ দেখলে ভয়ে, শঙ্কিত-কম্পিত হয়ে পুত্রের সত্বর বিয়ে দেবার জন্য ব্যবস্থা করে, আর সেই তথাকথিত 'মিথ্যার সংসারে' বেঁধে রাখার জন্য উঠে পড়ে লেগে যায়। সুতরাং মায়েরা বিস্ময়কর বটে !

হাতের দিকে সে তাকিয়ে দেখলো, ইস্, ছাই লেগে হাতটা একটু কালো হয়ে গেছে ! কোথায় মুছবে ?

হঠাৎ ওর নজরে পড়লো, ঘরের ওদিককার দেওয়ালে একটা কালো পর্দা ঝুলছে। সে এগিয়ে গেল পর্দার দিকে। এই পর্দার অন্তরালে কয়েকটা সিমেন্টের থাক রয়েছে সেখানে অনেক রকম জিনিস সাজানো আছে। সেই কালো রঙের পর্দার গায়ে হাতটা মুছে নিল সে চটপট করে।

তাপসী গঙ্গাবক্ষে নৌকায় করে উত্তর দিকে চলেছে।

এই খবর বাড়ীর কেউ-ই জানে না। সবাই জানে, তাপসী রাগ করে ওর মামার বাড়ীতে গেছে। তাই সবাই এখন পরম নিশ্চিন্তে নিদ্রায় মগ্ন।

নৌকার মাঝি জটাধর তাপসীকে বললো, এখন তুমি কোথায় যাবে ? বা যেতে চাও ?

তাপসী কোনো উত্তর দিল না, শুধু মুখ নীচু করে বসে রইলো। ওর বয়েস বছর ষোলো। অষ্টম শ্রেণীতে পড়ে। এখনো সে ফ্রক পরে।

মাঝি আবার বললো, বলো! আমাকে তুমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারো—আমি ওদের দলের কেউ নয়। আমি তোমাকে বাঁচাতে চাই। বোরখাটা খুলে ফ্যালো, দাঁড়াও—বলে মাঝি নৌকার দাঁড় টানা থামিয়ে উঠে দাঁড়ালো, তারপর তাপসীর গা থেকে বোরখাটা খুলে নিল।

বোরখাটা সরাতেই তাপসীর মুখটা দেখতে পেল এই প্রথম জটাধর। এতক্ষণ পর্যন্ত জটাধর তাপসীর মুখ দেখতে পায় নি। চাঁদের আলো এসে পড়েছে তাপসীর মুখে – অপূর্ব সুন্দর দেখাচ্ছে।

এখন আর তাপসীকে মুসলমান বলে মনে হচ্ছে না, কারণ, ওর গায়ে কালো বোরখাটা নেই। কয়েকটা মুহূর্ত ওকে আপাদমস্তক দেখে মাঝি নিশ্চিন্ত হলো—এ মেয়ে মুসলমান-ঘরের হতেই পারে না, এ সম্পূর্ণ বাঙালী-ঘরের গৃহস্থ মেয়ে। চাঁদের আলো ওর মুখে পড়ায় ওকে আরো অসহায়া দেখাচ্ছে।

এই নিস্তব্ধ রাত্রে গঙ্গার মাঝে তরণীর ওপরে সুন্দরী কিশোরী একাকিনী জড়সড়ো হয়ে বসে আছে—এরকম মধুর দৃশ্য মাঝি জটাধর তার জীবনে প্রত্যক্ষ করে নি, বা এরকম একটি মহাদুর্লভ যাত্রী নিয়ে রাত বারোটার পর সে গঙ্গায় পাড়ি দেয় নি আজ পর্যন্ত।

দাঁড় টেনে চলেছে জটাধর। সে জানে না, এই মেয়েটির কি নাম, জাত, ঠিকানা এবং এর কে কে আছে।

মাঝি জটাধর অল্পক্ষণ আগে তাপসীকে বাঁচিয়েছে দুইজন দস্যুর হাত থেকে। মমতায় এই মেয়েটিকে বাঁচাতে গিয়ে মাঝির অনেকগুলো টাকা ক্ষতি হয়েছে।

আজ রাত সাড়ে আটটার পর থেকে তাপসী তার কবিতার খাতাটা নিয়ে বসে ছিল। একটি বিশেষ পৃষ্ঠায় ওর চোখ নিবদ্ধ। এই পৃষ্ঠায় লেখা আছে একটা কবিতা।

এই কবিতাটা সে দু'দিন আগেই লিখে শেষ করেছে। তাপসী লেখাপড়ায় খুব ভালো মেয়ে—প্রতি বৎসর বাৎসরিক পরীক্ষায়

কোনো একটা স্থান অধিকার করবেই। কবিতা লেখা ওর খুব শখ। আজ দেড় বছর যাবৎ অনেক কবিতা লিখেছে—তার মধ্যে অনেকগুলিই ভালো ভালো।

পনেরোই আগস্টের দিনে তাপসীর স্কুলে গল্প-কবিতা-আবৃত্তি ও দেশাত্মবোধক গানের একটি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। তাতে পুরস্কারও দেওয়া হবে। তাপসী সেই প্রতিযোগিতায় একটা কবিতা দেবে বলে স্থির করেছে।

সেই কবিতাটা লিখে ফেলে, আজ দুপুরে তাপসী সেটা স্কুলে জমা দিয়েও ফেলেছে।

রাত্তিরে পড়তে বসে একসময় ওর কি মন গেল, কবিতার খাতাটা টেনে নিয়ে বসলো। সেই কবিতাটার পৃষ্ঠায় চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে তাপসী প্রত্যেকটি শব্দ আর একবার যাচাই করে নিচ্ছিল মনে মনে। যদিও এখন আর কিছু সংশোধন করলে কোনো লাভই হবে না—কেননা ওটা ইতিমধ্যে স্কুলে জমা দেওয়া হয়ে গেছে।

কবিতাটা এইরূপ :

নিষ্ফল অভিমান

জ্বলছে যৌবন, পুড়ছেও স্বপন—আমি আজো একাকিনী,
মাঝ-সমুদ্রে হারিয়েছি যেন নিজেই নিজের তরণী।
শত শত দিন সাজিয়েছি আমি তব গীতের ডালা,
পেলাম শুধু কেবল হেলা ; আর এই অন্তর্জ্বালা
নিয়ে আজও চলছি আমি—হায় রে এই কবিমন!
কাব্য-সৃজনে দিবো প্রাণ—নই নই আমি কৃপণ!
ছুটেছি যে-পথে আমি নিজে, সেই আমারই পথ—
হয়েছি বিফল প্রতিবারে নিয়ে ভগ্নমনোরথ।
শত শত মোর কবিতার মালা দিয়েছি তোমায় উপহার—
সফল না হয়ে জীবন আমার হলো ব্যর্থ বার বার।

কাব্যে যেন দিতে পারি প্রাণ—এই আমার বড়ো সাধ—
এই জীবনে এইটুকু চাই, তাই করো সেই আশীর্বাদ।

আসলে এটা আদৌ প্রেমের কবিতা নয়। এই কবিতার মাধ্যমে কিশোরী তাপসী তার হৃদয়ের ব্যথা-বেদনার কথা জানিয়েছে মা-সরস্বতীর কাছে। আরও অনেক কবিতা লিখে গেছে—এবং সেগুলো সব বিদ্যাদেবীর চরণে অর্পণ করেছে- তবুও সেই বিদ্যাদেবী ওর প্রতি মুখ তুলে চান নি। সে যে অনেক আশা করে আছে—একদিন সে প্রকৃত কবি হবে, তার লেখা ছাপা অক্ষরে বেরোবে, কিন্তু আজো ফলবতী হয়নি তার সেই আশার একটি কণা। তাই সেই মা-সরস্বতীর কাছে তাপসীর এই 'নিষ্ফল অভিমান'।

শুধু অভিমান নয়, কাব্য রচনার জন্য, ঈপ্সিত বস্তু লাভের জন্য তাপসী সব রকম ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত আছে।

কখন যে ন'টা বেজেছে, তাপসী জানতে পারে নি।

ওর সৎমা বিমলা দেবী মাঝে মাঝে এসে তাপসীর পড়ার ঘরে উঁকি-ঝুঁকি মারেন। আজকেও তিনি এলেন একবার ন'টার সময়। কোনো কোনোদিন তাপসী ওঁর আগমন টের পায়, কোন কোনদিন আবার পায় না।

খোলা দরজা-পথে বিমলা দেবী চলে এলেন তাপসীর চেয়ারটার পিছনে, এবং সেখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে তিনি তাপসীর কবিতাটা পড়ে যাচ্ছেন নীরবে।

তাপসী এত নিবিষ্ট মনে তার কাব্য-জগতে ছিল যে সে জানতেও পারেনি, তার পিছনে কি ঘটে যাচ্ছে।

এই তাপসী বিমলা দেবীর চোখের বালি, সব সময় তিনি দূর দূর করেন ওকে। বাড়ীর মধ্যে সর্বত্র তিনি চলাফেরা করেন বেড়ালের মতন নিঃশব্দে,—কিন্তু চীৎকার আর ঝগড়া করার সময় তিনি এমন গলা ফাটান যে আশেপাশের বাড়ী থেকে তা সুস্পষ্টভাবে শোনা যায়।

তাপসীকে এ বাড়ীর প্রায় সব কাজ করতে হয়। বিমাতা ওকে দিয়ে অনেক কাজ করিয়ে নেন। এ বাড়ীর সমস্ত জল একতলার টিউবওয়েল থেকে পাম্প করে তাপসী সংগ্রহ করে, তারপর সেই জল সে দোতলায় টেনে নিয়ে যায়। আর ঐ জলে একটু ছুঁতো পেলেই বিমলা দেবী অমনি হুস করে বালতি উল্টে দেন। তাপসীকে দিয়ে তিনি লঙ্কা বাটিয়ে নেন। লঙ্কা বাটলে ওর হাতে কী ভীষণ জ্বালা করে, তবুও মুখ বুজেই থাকে কাউকে বলতে পারে না। মাছ কাটার বেলায় বিমলা দেবী নিজ হাতে কাটবেন, আর পেঁয়াজ কাটার দরকার পড়লে তাপসীর ডাক পড়বে। এটা সেটা সংসারে যা-কিছু প্রয়োজন হবে, বাজার থেকে ও দোকান থেকে সমস্ত সংগ্রহ করতে হবে তাপসীকে। বিমাতার ছেলেমেয়েরা অঙ্ক-টঙ্ক না পারলে সেগুলোরও সমাধান করতে হবে ওকে।

এত করেও সৎমায়ের মন তাপসী আজো পায় নি। প্রতিদিন যে-কোনো একটা বিষয় নিয়ে সতীন-কন্যার সাথে তিনি ঝগড়া বাঁধাবেনই। সে নাকি লক্ষ্মীছাড়া বেহায়া মেয়ে—বাপের অর্থ ধ্বংস করে চলেছে। এ মেয়েকে নিয়ে তিনি ঘর করতে পারবেন না। হয় ঐ আপদ বিদায় হোক, নচেৎ তিনিই বিদায় হবেন। তাপসীর মৃত্যু-কামনা জানান ঈশ্বরের কাছে; শুধু তাই নয়, এমন কি মাঝে মাঝে মারধোরও করেন তাপসীকে।

তাপসী তখন অনেক ছোট। একবার সামান্য একটা মাছ-চুরির অপরাধে বিমলা দেবী খুন্তি পুড়িয়ে তাপসীকে এমন ছ্যাঁকা দিয়েছিলেন—যার দাগ এখনো তাপসীর বাঁ হাঁটুর ওপর থেকে মিলিয়ে যায়নি।

সৎমা নিজের ছেলেমেয়েদের গায়ে হাত তোলেন না, কিন্তু তাপসীকে ছুঁতোয় অছুঁতোয় মারতে তাঁর হাত কাঁপে না। এত সুন্দর মেয়েটাকে তিনি মারতেও পারেন! তাপসী এ বাড়ীর একমাত্র সুন্দরী। তার সৎমায়ের ছেলেমেয়েরা একটাও সুশ্রী নয়

—ভূত-প্রেতের মতন সব।

তাপসী যে কবিতা লেখে—এ খবর বাড়ীর কেউই জানে না আজো, এমন কি বিমলা দেবীও না। আজকে হঠাৎ তাপসীর কবিতা দেখতে পেয়ে তাঁর মাথায় আগুন জ্বলে উঠলো। আক্রোশে ফেটে পড়ে বললেন, অ্যাঁ! এসব হচ্ছে কি! পড়াশুনা সব জলে দিয়ে বসে বসে এই প্রেমের কবিতা বানানো হচ্ছে? এজন্যই বলি, এ মেয়েকে পড়িয়ে আর লাভ নেই! মাকে খেয়েছে, এবার আমাকে খাচ্ছে—নে সব খা, খা! বলি, তোর সেই পিরিতের মামার বাড়ীতে গিয়ে থাকতে পারিস না?

বলতে বলতে ক্ষিপ্রহস্তে তাপসীর ঐ খাতাটা টেনে নিয়ে দুমড়ে মুচড়ে সেটা তিনি ঘরের কোণের দিকে উঁচু করে ছুঁড়ে দিলেন।

আর মলাটটা আধখোলা হয়ে খাতাটা ঘরের কোণে উপুড় হয়ে পড়লো। পৃষ্ঠাগুলি সব এলোমেলো আর ভাঁজ খেয়ে গেছে। তাপসীর কতদিনের কত সাধের কবিতা আজ কী নির্মমভাবে দলিত!

তাপসী সেদিকে অল্পক্ষণ তাকিয়ে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সে বললো, ফেলে দিলে কেন আমার খাতাটা? আমি কি করেছি তোমার? কবিতা লিখেছি তো বেশ করেছি!

বিমলা দেবী এতে আরো রেগে গিয়ে তেড়ে এলেন। বললেন, অ্যাঁ, আমাকে চোখ রাঙানো! এ মেয়ে এইরকমই হবে - আমি তো জানতুম! দাঁড়া, তোর দেখাচ্ছি - বলে ওর চুলে হিংস্রভাবে একটা টান দিলেন। তারপর ঠাস ঠাস করে গোটা তিনেক চড় মেরে গেলেন ওর গালে।

এতেও শান্ত হলেন না তিনি। তাপসীর মাথাটা ধরে দেওয়ালের সাথে তিনি জোরে ঠুকে দিতে গেলেন। কিন্তু তাপসী বোধহয় বুঝতে পেরেছিল কিছু, তাই সেই মুহূর্তে ঝুপ করে সে বসে পড়ে মেঝেতে।

আর বিমলা দেবী নিজের টাল সামলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন ঐ দেওয়ালের ওপর। তাঁর মেদবহুল দেহটা এতে কিছুই লাগল না।

এই দেওয়ালটা যদি তাপসীর মাথায় লাগতো, তা হলে ওর মাথাটা নির্ঘাত ফেটে যেতো। এইরকমভাবে আরো দু'বার ওর সৎমা ওর মাথা ফাটিয়ে দিয়েছেন। রাত্রে তারপর তাপসীর সে কী জ্বর!

উঠে দাঁড়াতেই তাপসী আবার একটা চড় খেলো। তবুও সে ঘুরে গিয়ে দাঁড়ালো টেবিলটার ওদিকে—যাতে সৎমা আবার ওকে মারতে এলে, টেবিলটার ওপাশ দিয়ে সে পালিয়ে যাবে। মুখ-চোখ ওর লাল হয়ে গেছে, চোখে অন্ধকার দেখছে, মাথাটাও ঝিমঝিম করছে। ওর চোখের কোলে টলমল করছে বড়ো বড়ো দু'ফোঁটা অশ্রু।

এদিকে সৎমা চেঁচিয়ে যাচ্ছেন স্বর তুলে।

চেঁচামেচি শুনে ওপর থেকে নেমে এলেন তাপসীর বাবা হারাধনবাবু। তিনিও দিন দিন বদরাগী হয়ে উঠছেন এককালে তিনি ছিলেন খুব ভালো লোক। তাঁর একটি পৈতৃক সম্পত্তি আছে —সেটা সাবানের কারখানা। অনেক অসহায় লোককে তিনি চাকরি দিয়েছিলেন। এখন সেইসব গুণ-টুন আর নেই। বরং আরো শ্রমিক ছাঁটাই করছেন। আসন্ন পুজোর বোনাস নিয়ে শ্রমিক আর মালিকের মধ্যে বেশ একটা রেষারেষি চলছে। তাতে কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে কিনা কে জানে! এজন্য আরো বেশী তিনি খিটখিটে হয়ে উঠাছন আজকাল। এককালে মদ আদৌ স্পর্শ করতেন না হারাধনবাবু। আজ কয়েক বছর যাবৎ তিনি সেই মদ্যপানে অনেক টাকা উড়িয়ে যাচ্ছেন। সেজন্য বিমলা দেবীর সাথে তাঁর মাঝে মাঝে কলহ বাঁধে।

হারাধনবাবু নীচে নেমে এসে বললেন, কী হয়েছে বিমলা?

বিমলা দেবী অমনি ঘুরে দাঁড়িয়ে তাঁর দুটি হাতের মুষ্টি একজড়ো করে সম্মুখের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বিকৃতস্বরে বললেন—কি হয়েছে! দেখো না তোমার আদুরে মেয়ের কাণ্ডটা! পড়াশোনার মাথা খেয়ে বসে বসে যত সব প্রেম-পিরিতের কবিতা লিখছে—

সেখানে দাঁড়িয়ে হারাধনবাবু গম্ভীরস্বরে বললেন, কি রে তাপসী, তাই করছিস নাকি?

তাপসী কোন উত্তর দিল না। টেবিলটার ওদিকে সে দু'হাতে মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে, আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

বিমলা দেবী এবার বলে উঠলেন, আহা-হা ন্যাকা! ঐ যে ঐ কোণের খাতাটা—খুলে দেখো না গিয়ে—

বলেই তিনি স্বামীকে আর কোনো অবকাশ না দিয়ে নিজেই ঐ ঘরের কোণ থেকে সেই খাতাটা তুলে আনলেন। তারপর ক্রুদ্ধ গর্জনে খাতার পাতাগুলো ওল্টাতে লাগলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ বৃথা পরিশ্রম করেও তিনি সেই কবিতাটা খাতা থেকে বার করতে পারলেন না—খাতার মধ্যে কোথায় হারিয়ে গেছে। তখন আবার আক্রোশে খাতাটা স্বামীর গায়ে ছুঁড়ে মেরে তিনি বললেন, দেখতে পাচ্ছো না এতগুলো পাতায় এইসব লেখা? তা দেখতে পাবে কেন! কানা তো—

তাপসীর বাবা অত্যন্ত রগচটা লোক। এবার তিনি তাপসীর কাছে এগিয়ে এসে ওর কানটা ধরলেন, তীব্রভাবে ধমকালেন—বল হারামজাদী, কি করছিলি? বলেই একটা ঠাস করে চড় কষিয়ে দিলেন তিনি ওর গালে।

তাপসী দু'হাতে মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে ছিল। সেজন্য চড়ের অর্ধেকটা ওর গালে আর বাকীটা ওর হাতের ওপর পড়েছে। চড় লাগতেই তাপসী একটু কেঁপে উঠলো। ভীষণ জোরে লেগেছে।

তাপসীর বাবার গায়ে ভীষণ শক্তি। এককালে ব্যায়ামের আখড়ায় গিয়ে তিনি ব্যায়াম করতেন রীতিমত। পড়াশোনা বেশী

দূর করেন নি – গোটা আষ্টেক ক্লাস পর্যন্ত পড়েছেন। মাথা তাঁর ভালো ছিল না। পিতার একমাত্র পুত্র বলে পৈতৃক সূত্রে সহজেই সাবানের কারখানাটা তাঁর হস্তগত হয়েছিল।

দাঁড়া তোকে দেখাচ্ছি! কয়েক ঘা বেত দিতে হবে—বলে তিনি দোতালায় উঠলেন বেত আনতে।

সরু লিকলিকে একখানি বেত থাকে হারাধনবাবুর কক্ষে। এই বেতটিও তাঁর পৈতিক সম্পত্তি। হারাধনবাবুর পিতা এটি ব্যবহার করতেন তাঁর চাকর-বাকরদের ওপর। এখন হারাধনবাবু স্বয়ং এটি নিজের বংশধরদের ওপর মাঝে মাঝে সদ্ব্যবহার করে নেন। ওপরে গিয়ে খোঁজাখুজি করেও তিনি বেতটি পেলেন না। তাপসীর সৎমায়ের ছেলেমেয়েরা ওটিকে কোথায় লুকিয়ে ফেলেছে। কারণ, ওরাও মাঝে মাঝে ঐ বেতের স্বাদ পেয়ে থাকে।

রক্তবর্ণ নয়নে তিনি এবার হাঁক দিলেন—বেনু, এদিকে আয় শীগগির! আমার বেত কোথায়? খুঁজে দে—

বেনু বিমলা দেবীর প্রথমা কন্যা। সেই বেনুর কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

নীচের তলা থেকে ওর বাবার কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। এই বেতের ঘা কি রকম, তা মাস দুয়েক আগে একবার সে ভালোভাবে টের পেয়ে গেছে। তখন বিমলা দেবীর সবে বাচ্চা হয়েছে নতুন। সেজন্য দরজা খোলা-বন্ধ করার ভার পড়েছে তাপসীর ওপর। আর, সেই রাত্রে তাপসী ঘুমিয়ে পড়েছিল। এদিকে তার বাবা মদ পান করে রাত একটার পর বাড়ী ফিরে কড়া নাড়া দিচ্ছেন। দরজা খোলার পর তাপসী স্বাদ পেল সেই পৈতৃক বেতের। তার পরেও তিন-চারদিন ধরে সেই ব্যথা ছিল তার গায়ে।

তাপসী ঝট্ করে চিন্তা করে ফেললো, সে এবার পালাবে এখান থেকে, নইলে ঐ বেতের ঘা আজ তাপসীর কপালে!

তাপসী ঐ ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছে, তখন

ওর সৎ মা আবার খেঁকিয়ে উঠলেন, যা মুখপুড়ী, তোর পিরিতের মামার বাড়ীতে গিয়ে থাক গে যা!

তাড়াতাড়ী করে তাপসী ঐ ঘর থেকে বেরিয়ে এল কোনোমতে। তখনও সে ওর বাবার তীব্র কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছে—বেনু আমার বেত কোথায়! আর সে দাঁড়ালো না, সদর দরজার দিকে এগিয়ে গেল। সদর দরজার কাছটায় বেশ ঘুটঘুটে অন্ধকার। এখানটায় অল্পক্ষণ দাঁড়ালো তাপসী। ফ্রক দিয়ে ওর চোখমুখ ভালো করে মুছে নিল। এখানে এত বেশী অন্ধকার যে কেউ তাপসীকে চট্ করে খুঁজে বের করতে পারবে না।

এদিককার একটা দরজার খিল খোলার শব্দ শুনতে পেয়ে তাপসী আর দেরী করল না, সেও সদর দরজা দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলো, এবং আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগলো।

সে এখন কোথায় যাবে? এখন একমাত্র মামার বাড়ীতেই সে যেতে পারে। তাছাড়া আর কোথায় বা যাবে! তার এই ষোল বছর বয়সেই কী জ্বালা! যদি সে জন্মের সময় মরে যেতো, তা হলে আজ কত ভাল হতো! উঃ, করে উঠল তাপসী—রাস্তার খোয়ার কানায় পা পড়েছে ওর। আজ ওকে এত তাড়াতাড়ি করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসতে হয়েছে যে চটি পর্যন্ত পায়ে গলিয়ে আসতে পারে নি। বাকী পথটা এইভাবে ওকে খালি পায়ে হেঁটে যেতে হবে। আজ পর্যন্ত কোনদিন সে খালি পায়ে হাঁটে নি।

রাস্তার ফুটপাতের ধারে গিয়ে দাঁড়ালো একটু তাপসী। এখান থেকে মামার বাড়ীতে পৌঁছোতে বেশীক্ষণ সময় লাগবে না। তাপসীর মামা ডাঃ বীরেশ গাঙ্গুলী থাকেন মহাত্মা গান্ধী রোডে। শিয়ালদার নিকটেই তাঁর ফ্ল্যাট।

তাপসী ঐ ফুটপাতের ধারে দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে ওর চোখ দুটো মুছে নিল, তারপর আঙ্গুল দিয়ে মাথার চুলগুলো সঠিক স্থানে সরিয়ে দিল। ইস্, ওর ভালো করে চুল আঁচড়ানো হয় নি! এত রাত্রে

সে মামার বাড়ীতে যাবে? কত দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। মামা মামীমা হয়তো শীগগির খেতে বসবেন—কী ভাববেন? অবশ্য এতে ওঁরা একটুও রাগ করবেন না, বরং খুশীই হবেন। কতদিন ওঁরা তাপসীকে ওঁদের কাছে থেকে পড়াশোনা করতে বলেছেন—কিন্তু তা হলেও, এইসময়ে ওখানে যাওয়াটা কেমন যেন অশোভন।

হ্যাঁ, সে যাবে। তাপসীর মামা-মামীর সাথে হারাধনবাবু আর বিমলা দেবীর তুলনা করা চলে না কোনোমতেই। মামা-মামী বলতে গেলে ওঁরা প্রায় দেব-দেবীতুল্য। ওঁদের ঘরে কোনো ছেলেমেয়ে নেই বলে ওঁদের ওখানে থাকতে তাপসীকে কত করে বলেন; কিন্তু তাপসী পিতৃ-সংসারে সাহায্য করার নিমিত্ত পিতৃগৃহে রয়ে গেছে। সে আর বাড়ী ফিরে যাবে না। মরে গেলেও না, কেউ ডাকতে এলেও না। যদি কেউ ডাকতে আসে, তাপসী তাকে বলবে, কেন, আমাকে তোমরাই তো মেরে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছো! এখন আবার ডাকতে এসেছো—লজ্জা করে না!

তাপসী সম্পূর্ণ ঠিক করে ফেলেছে—সে যাবে।

সে ফুটপাথে যেখানটায় দাঁড়িয়ে আছে, সেখান থেকে আর কয়েক হাত দূরে একটি কালো রঙের বড়ো মোটরগাড়ি দাঁড়িয়ে আছে অনেকক্ষণ ধরে। তাপসী সেই গাড়িটা দেখছে। গাড়ির পাল্লার কাঁচগুলো সব বন্ধ রয়েছে এবং ঐ কাঁচগুলো রঙিন। সেজন্য ভিতরে কি আছে একদম দেখা যাচ্ছে না। সামনের দিকে একটা পাল্লা অল্প খোলা।

ওদিক থেকে একটা লোক এসে ঐ পাল্লার ফাঁক দিয়ে ভিতরে মুখ গলিয়ে কাকে কি যেন একটা বললো। তারপর সে ঐ সামনের আসনে বসে পড়লো, কিন্তু দরজাটা বন্ধ করলো না।

ঐভাবে আস্তে আস্তে গাড়ীটা ব্যাক করে তাপসীর সামনে এসে থামলো, তাপসী ওখানে কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে রয়েছে। এবার ঐ মোটরটা ওখানে থামতেই সে সচেতন হয়ে উঠলো। গাড়ী থেকে

লোক-টোক নামবে ভেবে তাপসী মামার বাড়ীর দিকে পা বাড়াতে যাবে, এমন সময় সেই লোকটা ডাকলো ওকে, শোনো তুমি—

গাড়ির সামনের আসন থেকে ইতিমধ্যে দুটো লোক রাস্তার উপর নেমে পড়েছে। তাপসী ঘুরে দাঁড়ালো, এবং গাড়ির ভিতরে নজর পড়তেই সে দেখতে পেল, এই মোটরের ড্রাইভার একজন মহিলা। তাপসী আগেও দেখেছে মেয়েদের মোটর চালাতে।

এই মহিলাটি তাপসীর দিকে চোখের ইশারা করে বললো, শোনো—। তারপর সে তার হাতের পাতার ওপর ভর দিয়ে দরজার কাছ পর্যন্ত এসে আবার বললো, এদিকে ডাক্তার বীরেশ গাঙ্গুলীকে চেনো তুমি? আমরা তাঁকে খুঁজছি!

তাপসী অজ্ঞাতে অস্ফুটভাবে বলে ফেললো, আমার মামা—

মহিলার চোখদুটি খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বললো, তাই বুঝি? তাপসী আর ঐ মহিলা দু'জনেই প্রায় মুখোমুখি। মহিলার শাড়ী-ব্লাউজ দেখে ভদ্রঘরের বলে মনে হয়। সে আবার তাপসীকে বললো, আমরা তাঁকে আজ খুঁজে বেড়াচ্ছি অনেকক্ষণ ধরে—কিন্তু বাড়ীটা ঠিক খুঁজে পাচ্ছি না। একজন আবার বলে দিল—তিনি নাকি এদিকে কোথায় থাকেন। ডাক্তার গাঙ্গুলী যখন তোমার মামা হন—তুমি তো ভালো করে চেনো তাঁর বাড়ীটা! সেই বাড়ীটা কোথায়, আমাদের তা একটু দেখিয়ে দেবে?

তাপসী মামার বাড়ীর নম্বরটা মহিলাকে জানিয়ে দিল, এবং মোটরে এক্ষুণি পৌঁছে যাওয়া যাবে তাও বলে দিল। কিন্তু মহিলা বাড়ীর নম্বর জানতে পেরে অমনি গাড়ীতে স্টার্ট দিল না। পুরুষ দুটো একপাশে দাঁড়িয়ে তাপসীর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে আছে, তাপসী তা কিন্তু জানতে পারলো না।

মহিলা আবার বললো, তুমি বাড়ীটা আমাদের একটু দেখিয়ে দাও না! তাপসী চলে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছিল, তক্ষুণি তাকে ডেকে আবার সে বললো,-যেয়ো না বোন, আমাদের একটু না হয়

সাহায্য করলে! তুমি আমার ছোট বোনের মতো। এখন তোমার খুব বেশী দরকার না থাকলে আমাদের গাড়িটায় একটু বসে তোমার মামার বাড়ী অর্থাৎ ডাক্তারের বাড়ী পর্যন্ত দেখিয়ে দাও না—

তাপসী একটুও রাজী নয় ওদের মোটরে চড়ে মামার বাড়ীতে যেতে। যদিও সে ওখানেই যাবে—তবুও হেঁটে যাবে। তাই সে বললো, আপনি যান না, এবারে ঠিক পেয়ে যাবেন, আর ভয় নেই!

মহিলাটি তবুও নিরস্ত হলো না। তার চোখ দুটো ছলছল করে উঠলো, একফোঁটা করে অশ্রু জমা হলো। সে বললো, জানো না আমার বাবার কী ভীষণ অসুখ! একটু যদি সাহায্য করতে—

আর কতক্ষণ তাপসী 'না' করতে পারে! মহিলাটি এখনো ওর মুখপানে চেয়ে। তার ইচ্ছে হলো, এবার চট্ করে এখান থেকে সে সরে পড়ে। পুরুষ দুটো এতক্ষণ কোনো কথা বলেনি, এবার মহিলাটিকে উদ্দেশ্য করে বললো, চলুন তবে আমরাই যাই! মহিলাটি তবুও তাপসীর পানে চেয়ে।

তাপসী ভাবলো, সে এই মহিলাকে সাহায্য করবে? অবশ্য একই জায়গায় তো সেও যাবে। এর বাবার নাকি ভীষণ অসুখ! কাজেই একজন বিপন্নাকে সাহায্য করলে এমন কি বেশী ক্ষতি! শুধু তো বাড়ীটা দেখিয়ে দেওয়া, তাছাড়া ঐ বাড়ীতে তো সে যাচ্ছেই। কি যায় আসে একটুখানি সাহায্য করলে?

আচ্ছা, চলুন তবে! তাপসী ঐ মহিলাকে বললো।

পুরুষ দু'জন সামনের আসনে বসে পড়েছে। মহিলাটি ওকে বললো, পিছনের সীটে বসো। তাপসী ঢুকতেই মোটর ছেড়ে দিল।

তাপসী প্রথমে কিছুই বুঝতে পারে নি। গাড়ীতে ঢোকার সাথে সাথেই গাড়িটা ছেড়ে দিয়েছিল। আর গাড়ীর ভিতরে অন্ধকার। সেই অন্ধকারের ভিতর থেকে একজন তাপসীর হাত

ধরে এক হেঁচকা টানে দরজার কাছ থেকে একেবারে ভিতরে টেনে নিয়ে গেল। তারপর ওর মুখে একখানি রুমাল চেপে, মাথায় পিস্তলের নলটা ঠেকিয়ে সে কর্কশস্বরে বললো—চেঁচিয়েছিস তো এক গুলিতে মাথার খুলি উড়িয়ে দেবো। নয়তো হাত-পা বেঁধে একেবারে মাঝগঙ্গায় ছুঁড়ে দেবো।

এর পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। তাপসী গাড়ীর মধ্যে বসে রইলো। পাথরের মতন নিশ্চল হয়ে। সে রীতিমত বুঝতে পেরেছে, সে এখন দস্যুর কবলে।

চিকিৎসার অনুসন্ধান কোথায় মিলিয়ে গেল! পিতৃরোগের জন্য সহৃদয়া কন্যার ব্যাকুল কাতরতা কোথায় উঠে গেল! রক্তমাংসের একটা জলজ্যান্ত শিকার এখন সম্পূর্ণ ওদের হাতের মধ্যে! কলকাতার কোন্ পথ ধরে গাড়ী ছুটলো, তাপসী তা জানতেও পারে নি। সে শুধু দেখেছে তার চারিদিকে অন্ধকার। আর পাশে বসে-থাকা একজন পুরুষের উপস্থিতি সে সর্বক্ষণ টের পেয়েছে—কিন্তু তার মুখ দেখতে পায়নি। তাপসীর হাতে ভালো করে দড়ি বাঁধা।

মোটরের প্রথম আসন আর পিছনের আসনের মাঝে ঝুলছে একটা কালো রঙের মোটা পর্দা। পাল্লার কাঁচগুলো সব রঙিন এবং বন্ধ। সেই অন্ধকারের মাঝে তাপসী ভূতের মতো বসে।

ঐ মহিলাটি মোটরটা চালাচ্ছে কি না, একবার দেখবার ইচ্ছে হল তাপসীর। কিন্তু কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। হঠাৎ তাপসীর খুব রাগ হলো ঐ মহিলার ওপর। ইস্, ওর পায়ে যদি এই সময় একজোড়া চটি থাকতো, তা হলে এক্ষুনি ঐ মহিলার গায়ে মেরে সে বলতো—এই বুঝি তোমার বাবার অসুখ! বাপের মাংস রেঁধে খাও গে!

আবার একটু পরে তার মনে হলো, কেন সে এই মহিলাকে দোষ দিচ্ছে? তার নিজের সৎমা-ই বা কি এমন ভালো! তার

চিহ্ন তো একটু আগেই সে বাড়ীতে পেয়েছে। এ মহিলা না হয় তাকে মিথ্যে কথা বলে চুরি করে কোথাও নিয়ে যাচ্ছে—কিন্তু এ তো আর মার-ধোর করে নি! এরা যদি এবার তাপসীকে কোথাও নিয়ে গিয়ে খুব কষ্ট দেয়, কিংবা মেরে ফেলে! ফেলে ফেলবে—কি হবে আর বেঁচে থেকে! আর যে কেউ তাপসীর মৃত্যুতে খুশী হোক আর না-ই হোক, এই মৃত্যুসংবাদে ওর সংমাকে উৎফুল্ল করে তুলবেই। তারপর তার সংমা লাল টকটকে একখানি গরদের কাপড় পরে কপালে পূর্ণিমার চাঁদের মতো গো-ল করে একটা সিঁদুর-টিপ এঁকে ছেলেমেয়ের হাত ধরে কালীঘাটে ছুটবে মা-কালীব পূজো দিতে!

হঠাৎ মোটরটা আপাদমস্তক তীব্র ঝাঁকুনি দিয়ে পথের মাঝে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়লো। আর সেই মুহূর্তে একটা দৈত্যকায় ট্রাক ভীষণ গর্জন করতে করতে ছুটে গেল। এই ছন্নছাড়া ট্রাকটার জন্য এভাবে ব্রেক কষতে হয়েছে, নচেৎ ওদের মোটর গুঁড়ো হয়ে যেতো এতক্ষণে! তাপসীর মাথাটা আচমকা বেশ জোরে ঠুকে গেছে পাশের লোকটার মাথায়।

মোটর আবার ছুটছে। ইস্‌, হলো না কেন অ্যাক্সিডেন্ট! তা হলে সবগুলো একসঙ্গেই মরতো! আর সংবাদপত্রে কাল সচিত্র খবর বেরতো সেই সংবাদ পেয়ে বিমলা দেবী নাচতে নাচতে দেখতে আসবেন তাপসীকে! স্বচক্ষে না দেখলে কি বিশ্বাস হবে?

পর্দার একধারে একটখানি ফাঁক করে ওদিক থেকে কে যেন বললো—মাল ঠিক আছে তো রে?

তাপসীর পাসের লোকটা সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল, হ্যাঁ। কোন ভয় নেই!

রাত এগারোটা পর্যন্ত গাড়ি এপথে সেপথে ঘুরে বেড়ালো। ইতিমধ্যে একজায়গায় অল্পক্ষণ গাড়ি দাঁড় করিয়ে ওরা দু-প্যাকেট খাবার কিনে নিয়ে এল তাপসীর জন্য। রাত এগারোটায় মোটর

গঙ্গার ঘাটে এসে থামলো।

তাপসী কান পেতে রইলো। সামনের আসন থেকে ঐ দুটো লোক নেমে গেল, তাপসী তা টের পেল। কিন্তু মহিলাটি নামলো না বা তার কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না। তাহলে ঐ মহিলা কি এর আগে নেমে গেছে?

ঐ দু'জনের মধ্যে একজন অপরজনকে বললো, এই সুকুমার তুই যাস নে, দু'জনে গেলে সামনে কে থাকবে? আমি এক্ষুণি নৌকা ঠিক করে আসছি। তুই বরং সামনেটায় বস।

দু-পা গিয়ে লোকটা আবার ফিরে এসে বললো, এই, এই, এখানে না! এই আলো থেকে সরিয়ে ঐ-ঐ ছায়াটায় নিয়ে গিয়ে গাড়ি দাঁড় করা! আর আমি আসছি এক্ষুণি নৌকা ঠিক করে।

তাপসীও শুনতে পেল একথা। তারপর সুকুমার নামে লোকটি মোটরটিকে নিয়ে গেল যথাস্থানে।

অপরজনের নাম অজয়। সে গেল মাঝিদের আড্ডায়। তখন মাঝিদের মধ্যে অনেকে গোল হয়ে বসে জটলা পাকাচ্ছে, কেউ গাঁজা খাচ্ছে, কেউ মদ পান করছে, কেউ বা বেসুরো গলায় গান ধরেছে, আবার কেউ কেউ ঘুমিয়ে।

প্রথমে মহাদেব বলে একজন মাঝিকে ডেকে তুললো অজয়, কিন্তু সে আজকে এত রাতে আর কোথাও যেতে চায় না। মহাদেবকে কয়েকবার অনুরোধ করে অজয় ছেড়ে দিল। এতগুলো মাঝির মধ্যে মাত্র কয়জন মাঝি আছে—কেবল তাদের নৌকাই ভাড়া করে অজয়, অন্যদের নয়। সেই ক'জন মাঝি বিশ্বস্ত। এবার অজয়ের মনে পড়লো মাঝি জটাধরের কথা—সেও একজন বিশ্বস্ত। জটাধরও ঘুমিয়ে ছিল, তাকে ডেকে তুললো অজয়। কিন্তু সেও আজ এত রাতে কোথাও যেতে রাজী নয়।

জটাধর এদের দলের কেউ নয়, তবে নৌকা ভাড়া করে এরা। মাঝি অজয়কে বললো, আজ আমার শরীর বড়ো ক্লান্ত—

কোথাও যেতে আর ভালো লাগছে না। কাল সকাল হলে যেতে পারি। এবারে আবার কোথায় যেতে হবে? ডায়মণ্ড হারবার?

অজয় বললো, না, না, নৈহাটি –

জটাধর ভেবেছিল ওরা বুঝি এবারেও ডায়মণ্ড হারবারের দিকে যাবে। কিছুদিন আগেই এরা জনা পাঁচেক লোক নিয়ে জটাধরের নৌকা ভাড়া করেছিল এক রাত-দুপুরে। সে রাতে ডায়মণ্ড হারবারের দিকে পাড়ি দিল জটাধর; সেবারে বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে তাকে জলে জলে ঘুরতে হয়েছে। জাহাজ এলো বেশ কিছু দেরী করে, এবং আসতেই সেই চলন্ত জাহাজের ওপর থেকে কয়েকটা মেটে রঙের বড়ো বড়ো প্লাস্টিকের বোতলের মতো গঙ্গার জলে ছুঁড়ে দিয়ে জাহাজ অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর এদের লোকেরা সাঁতারে সেই ভাসন্ত রহস্যময় বস্তুগুলো নৌকার ওপরে তুলে দিল। অতঃপর জটাধরকে বড় সাবধানে নৌকা চালিয়ে শ্রীরামপুর পর্যন্ত এদেরকে পৌঁছে দিতে হয়েছে। অবশ্য ওরা জটাধরকে তার পারিশ্রমিকের জন্য চারশো টাকা দিয়েছিল।

কিন্তু সেজন্য জটাধরের মনে কোনো পাপবোধ নেই। যদিও সে মনে মনে ভালো করে বুঝেছে—ঐ মালগুলো সব নিশ্চয়ই অবৈধ। কিন্তু জটাধর তাতে কি করতে পারে? সে তো আর শিখিয়ে দেয় নি ওদের ওপথে যেতে! সাধু হোক, আর চোরই হোক, যারা তার নৌকায় উঠবে বা চড়বে, তাদের কাছ থেকে সে তার ভাড়া আদায় করবে। একদল চোরই যদি তার নৌকায় চড়ে কেবল চৌর্যবৃত্তি আলোচনা করতে থাকে, তাতে জটাধরের কি আসে যায়? আবার একদল ব্রাহ্মণ যদি তার নৌকায় চেপে সারাক্ষণ গীতার আলোচনা করে, তাতেই বা তার কি এসে যায়? কাজেই ওদের মালের বৈধতা সম্পর্কে জটাধরের কোনো দুশ্চিন্তা নেই। সে তো নিজে অবৈধ মালের ব্যবসায় নামে নি!

নাও, নাও—আর কিছু চিন্তা করতে হবে না, বলেই অজয় প্যাণ্টের পকেটে হাত চালিয়ে একটা দশ টাকার নোট বের করে জটাধরের হাতে গুঁজে দিল জোর করে। তারপর ওকে মাটি থেকে তুলে দাঁড় করিয়ে বললো, শীগগির শীগগির নৌকা বের করো—আর দেরী নয়। ভাড়া তোমার চাওয়ার চেয়েও বেশী দেবো—কোনো চিন্তা নেই!

অনিচ্ছা সত্ত্বেও জটাধর গা ঝাড়া দিয়ে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলো। অল্পদূর যেতেই অজয় আবার দেখতে পেল, গঙ্গার এধারটায়ও ক'জন মদের বোতল নিয়ে বসেছে। অজয় মাঝিকে বললো, ওহে, এক বোতল খাবে নাকি? বলেই সে একটা হাত প্যাণ্টের পকেটে ঢুকিয়ে দিয়েছে টাকা বার করবার জন্য।

জটাধর অল্পক্ষণ অজয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো, ভাবলো, এ লোকটা তাকে কি ভাবছে? তার সঙ্গীদের মধ্যে কেউ কেউ খাচ্ছে বলে সেও অমনি ঐ ছাইভস্ম গিলবে বুঝি?

কিন্তু সে মুখে বললো না।

অতঃপর সে নৌকার বাঁধন খুলে ঘাটে আনলো, এবং ওতে তাপসীকে বসান হলো। অজয় আর সুকুমার তাপসীর দু'পাশে বসেছে। নৌকা ছেড়ে দিল।

তাপসীকে একটা কালো বোরখা পরিয়ে দেওয়া হয়েছে, এবং সে নৌকায় চুপচাপ বসে।

অজয় আর সুকুমার মোটামুটি পাকা লোক। অবশ্য এদের ওপরেও আরো দুটো বড়ো দল রয়েছে। এরা তিন নম্বর দলের লোক। আর ঐ মহিলা—ড্রাইভার এবং যে লোকটা তাপসীকে নিয়ে পিছনের আসনে বসে ছিল—ওরা দু'জন চার নম্বর দলের। চার নম্বর দলের সবাই ট্রেনিং-এ আছে। ওদের ওপর মাঝে মাঝে বিশেষ ধরনের কাজ চাপানো হয়, এবং সেই কাজ নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করতে পারলে তবে ওদের প্রমোশন হয় এবং তিন নম্বর

দলে প্রবেশের অধিকার পায়। তিন বছর আগে এককালে এই অজয়-সুকুমারও ঐ চার নম্বর দলের লোক ছিল। এই দলটা তেমন খুব বিশ্বস্ত নয়—দলের নিরাপত্তার জন্য ওদের ওপর গুরুত্বপূর্ণ কাজ দেওয়া হয় না।

ঐ মহিলার ওপর শুধু ভার দেওয়া ছিল তাপসীকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে ঐ গাড়িতে তুলে দেওয়া। আর ঐ পিছনের আসনের লোকটার ওপর ভার ছিল তাপসীকে যেমন করে হোক গাড়ির মধ্যে আটকে রাখা। কেন, কিজন্য—এ সমস্ত প্রশ্নের কোনো উত্তর চার নম্বর দলের লোকদের জানানো হয় না। চার নম্বর কেন, দুই নম্বর ও তিন নম্বর দলের লোকেরাও এসব প্রশ্ন কখনো জানতে পারে না। যদি কিছু জানতে পারে তো এক নম্বর দলের লোকেরাই পাববে—ওরা সমস্ত দলের মধ্যে সবচেয়ে বিশ্বস্ত এজেণ্ট। সবাই টাকা পায়—তাই কাজ করে। কে যে দলের সর্বপ্রধান, কার অধীনে ওরা সবাই কাজ করে, কে ওদের মাইনে দিচ্ছে—এসব প্রশ্ন কারো জানার প্রয়োজন পড়ে না। মাইনে পাবার জন্য কাউকে লাইনও দিতে হয় না—নির্দিষ্ট সময়ে সবার হাতে টাকা পৌঁছে যায়।

এক নম্বর দলটি সুশিক্ষিত লোকদের নিয়ে গঠিত। ওদের দেশ-বিদেশে যেখানে পাঠানো হবে, সেখানেই যেতে হবে, ওদের মাইনেও বেশী। তা ছাড়া, এ দলের কেউ-ই এমনি লোক নয়—সবাই বিশ্বস্ত এজেণ্ট।

এক নম্বর দলে কাজ করে বঙ্কিম বলে একজন লোক, তার সঙ্গে অজয়ের খুব বন্ধুত্ব। সেই বঙ্কিমের কাছ থেকে অজয় কিছুদিন আগে তাপসীর সম্পর্কে কিছুটা জানতে পেরেছিল।

এই দলের সর্বময় কর্তা হলেন মিঃ গুপ্ত। তাঁর কাছ থেকে একটি রূপার বর্শা পুরস্কার হিসেবে পেয়েছে এই বঙ্কিম এক বছর আগে। তাকে বিদেশে এমন একটা কাজের জন্য পাঠানো হয়েছিল

—যে কাজ থেকে সে প্রথম চান্সেই তিরিশ হাজার টাকা ভারতীয় মুদ্রা লাভ করতে পেরেছিল। এর ফলেই সে উন্মুক্ত করে নিয়েছিল নিজ হাতে দুই নম্বর দল থেকে এক নম্বর দলে প্রবেশের ফটকটা। আর সর্বশ্রেষ্ঠ এজেন্টদের মতো সেও অর্জন করেছিল একটি রূপার বর্শা। মিঃ গুপ্ত নিজ হাতে অত্যন্ত খুশীমনে পুরস্কৃত করেছিলেন ওকে সেই বর্শাটা দিয়ে—সেটি প্রায় পাঁচ ইঞ্চি লম্বা, আর হাতলটা পেনসিলের মতো মোটা।

সবই হলো—কিন্তু মাঝখান থেকে বঙ্কিমের সুন্দরী শিক্ষিতা বউ পদ্মশ্রী চিরতরে স্বামীগৃহ ত্যাগ করে চলে গেল। উঁচু বংশের শিক্ষিতা মেয়ে পদ্মশ্রী। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী। তার চোখে ধুলো দিতে পারেনি বঙ্কিম। বিয়ের পর থেকেই সে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে শুরু করেছিল স্বামীর গতিবিধির ওপর, এবং এটুকু অন্ততঃ তার বুদ্ধিতে ধরা পড়েছিল যে, বঙ্কিম কোনো গুপ্ত বা বে-আইনী ধরনের কাজ করে। পদ্মশ্রী নিজে শান্তিনিকেতন থেকে ভালো রেজাল্ট নিয়ে পাশ করেছে ; সে কোন অপরাধ ক্ষমা করবে না—নিজের স্বামীকেও না। যে-মুহূর্তে ঐ রূপার বর্শাখানি স্বচক্ষে সে দেখেছে, সেই মুহূর্তে তার সকল ধৈর্য্যের সীমানা হারিয়ে ফেলেছে। পদ্মশ্রী অনেক দিন ধরে অনেক ব্যাপার লক্ষ্য করেছে, এবারে সে তীব্র ঘৃণায় বঙ্কিমের মুখের ওপর বলে উঠলো—ছিঃ ছিঃ ছিঃ—তুমি এতদূর নীচে নেমে গেছো, আমি—আমি জানতামই না। ইস্, তুমি শেষ পর্যন্ত চুরি-ডাকাতি, পকেট মারতে শুরু করলে ! হায় কপাল !—তোমার মতো একজন চোর-ডাকাতের বউ আমি—তার সাথে আজ ঘর করছি ! কেন, আমার বাবার কি কিছু ছিল না যে তোমার মতো একজন রাস্কেলের হাতে আমায় তুলে দিয়েছেন ?

বঙ্কিম বলেছিল, ছিঃ পদ্মা, তুমি আমায় বিশ্বাস করো।

বিশ্বাস করবো ! আমাকে খুকী পেয়েছো ? চাকরির কথা বলতেই প্রত্যেক বারেই তুমি এড়িয়ে গেছো, আমাকে সব মিথ্যে

কথা বলেছো—আর আজকে হাতে-নাতে ধরা পড়ে গিয়ে বিশ্বাস করাতে চাইছো! ন্যাকামি! এক্ষুণি থানায় গিয়ে সব বলতে পারি,—কিন্তু একটা রাস্কেলকে নিয়ে আর ঘাঁটতে চাই না। আমাদের সব সম্পর্ক আজ এখানেই শেষ হোক! বিয়ের আগে সব কথা খুলে বলতে পারো নি?

বঙ্কিম তবুও বলেছিল, পদ্মা, তোমাকে আর কি বলবো! যা তোমার ইচ্ছে হয় বলে যাও। কিন্তু রূপার বর্শাটা আমার চুরি-ডাকাতির জিনিষ নয়, ওটা আমি পুরস্কার পেয়েছি—আমাকে দান করে দিয়েছে—

পদ্মশ্রী তৎক্ষণাৎ শ্লেষ মিশ্রিত কণ্ঠে বলেছিল, হ্যাঁ—তুমি শ্রীরামকৃষ্ণদেব কিনা—তাই তোমার শিষ্যরা ওটা তোমায় প্রণামী দিয়েছে! আমি আজকেই বিদায় নিচ্ছি—তোমার ঐ শয়তানের মুখ আর এ জীবনে দেখতে চাই না।

বলেই সে তার হাত থেকে একজোড়া সোনার চুড়ি খুলে বঙ্কিমের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে চলে গিয়েছিল বাড়ী ছেড়ে হনহন করে। বঙ্কিমের কিনে দেওয়া কোনো গয়না পদ্মশ্রী অঙ্গে পরিধান করে নিয়ে যায় নি। কোনোদিন সে আর স্বামীগৃহে প্রত্যাবর্তনও করেনি।

আর ঐ চুড়ি ছুঁড়ে দেওয়ার ফলে একখানা চুড়ি বঙ্কিমের বুকের ওপর এসে পড়েছিল, অন্যটি ওর মাথার ওপর দিয়ে জানালার ফাঁক দিয়ে বাহিরের সিমেন্টের বারান্দার ওপর গিয়ে পড়েছিল খনখন শব্দে।

বঙ্কিম ইচ্ছে করলে তার বউকে আটকাতে পারতো, এবং ঐ বর্শাটা যে তার চুরি করে আনা নয়—তারও প্রমাণ দেখাতে পারতো। কিন্তু তবুও সে স্ত্রীকে যেতে দিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বঙ্কিমও একদিন সসম্মানে পাস করে বেরিয়েছিল। তারপর তার সুদীর্ঘ বেকার-জীবনে এই অভিজ্ঞতাটা বেশ ভালোভাবে বুঝেছে—এম. এ. পাশের মতো ডিগ্রিও আজকের

দিনে পথে-ঘাটে লুটোপুটি খাচ্ছে ছেঁড়া চটির মতো অহর্নিশ।

আর বঙ্কিম শেষবেলায় বউকে যেতেই দিল—আটকালো না—যদিও সে আটকাতে পারতো। এদেশে তো মেয়েদের অভাব নেই, কত মেয়ে রয়েছে! এদেশে এত মেয়ে রয়েছে যে, প্রত্যেক পুরুষ দুটো করে বিয়ে করলেও মেয়ে-ঘাটতি দেখা দেবে না কোনোদিন। কাজেই আর একটা বউ পেতে কতক্ষণ? চালকে ফোটালেই যেমন ভাত, মেয়েকে বিয়ে করলেই অমনি বউ! আবার ভাতকে যেমন চাল বলা যায় না, তেমনি বউকে ঠিক মেয়ে বলা চলে না।

বঙ্কিম ভালো করেই জানতো, পদ্মশ্রীর কথামতো চললে তাকে আটকে রাখা যাবে—কিন্তু তাতে চলে যাবে চাকরিটা। আর চাকরিতে ঠিকমতো চললে বউ চলে যাবে। দুটোকে দু'হাতে নিয়ে বঙ্কিমের পথ চলা সম্ভব নয়। যে-কোনো একটা চলে যাবেই।

বেকার জীবনের সুতীব্র জ্বালা কি তা বঙ্কিম বেশ কয়েক বছর ধরে অনুভব করেছে রক্তের প্রতিটি বিন্দু দিয়ে – আর না! অনেক রক্তে সে এই চাকরিটা সংগ্রহ করেছে। এটা হারালে সে অনাহারে মরে যাবে। মরে গেলে, মুখে রক্ত উঠে গেলেও সে আর এ জীবনে কোনো চাকরি পাবে না। তার চেয়ে এই চাকবিটা বঙ্কিমের হাতে থাক, আর বউ তার মাথায় থাক।

সৎ চাকরি!—হাঃ হাঃ হাঃ ········মহামান্য সরকার প্রত্যেককে একটা করে সৎ চাকরি যোগাড় করে দিক না! কে বারণ করছে সেই চাকরি নিতে?

আর লোকে কাদেরই বা সৎ বলে! এদের দলের সর্বময় কর্তা মিঃ গুপ্তই তো একজন মহারহস্য! তাঁর নাম সত্যিই গুপ্ত কি না একমাত্র ভগবানই জানেন! কানাঘুষোয় তো শুনতে পাওয়া যায়—তিনি নাকি লোকসভা না রাজ্যসভার একজন সদস্য—উচ্চ একজন রাজনৈতিক ব্যক্তি।

মিঃ গুপ্ত তো বিনা প্রয়োজনে কারো সাথে দেখাও করেন না,

কথাও বলেন না। যত কিছু কাজ, সবই তাঁর এসিস্ট্যাণ্টরা করে যায়। বঙ্কিম মিঃ গুপ্তকে তু'বার তু'রকম সাজে দেখে চমকে গেছে; শেষবারে তো তাকে দেখে সে একদম চিনতেই পারে নি।

চিঠির নির্দেশানুযায়ী কলকাতার এক নামকরা নির্দিষ্ট কেবিনে বসে ছিল বঙ্কিম। কিছুক্ষণ পরে ঐ কেবিনের পর্দা ঠেলে প্রবেশ করলেন এক বৃদ্ধ, তার মাথায় বড়ো বড়ো পাকা চুল, পিঠের মেরুদণ্ডটি ঈষৎ ন্যুব্জ। সরাসরি বঙ্কিমের মুখের দিকে চেয়ে বলেছিলেন, আপনার নম্বরটি এক্স সেভেণ্টি তো? বঙ্কিম 'হ্যাঁ' বলে পকেট থেকে পিতলের চাকতিটা দেখাতেই বৃদ্ধ মৃতুভাবে মাথা নেড়ে বঙ্কিমের বিপরীত দিকে বসে পড়েছিলেন। তারপর অন্ততঃ আধ ঘণ্টা একটাও কথা না বলে অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে কতকগুলো কাগজ দেখছিলেন।

তখন স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি বঙ্কিম যে, সে মিঃ গুপ্তের সামনে উপবিষ্ট। সে বৃদ্ধকে ভেবেছিল কোনো একজন এ্যাসিস্ট্যাণ্ট। কিন্তু যখন সে জানতে পারলো, এবং ঐ রূপার বর্শাটা পুরস্কার হিসেবে পেল, তখন তার বিস্ময়ের অবধি ছিল না। এই বৃদ্ধকে বঙ্কিম মাত্র তু'বছর আগে আর একবার দেখেছিল, তখন তাঁর বীর সেনাপতির মতো সে কী চেহারা! মুখে একটা বড়ো ক্ষতদাগ। সেই পুরুষ-সিংহ আজ একজন বৃদ্ধ! কি করেই বা আজ মিঃ গুপ্তকে চিনতে পারবে বঙ্কিম? এর পরের বারে দেখা-সাক্ষাতের সময় তিনি হয়তো আবার যৌবনে ফিরে যাবেন।

এই সমস্ত কথা অজয় বঙ্কিমের কাছ থেকে শুনেছে। অজয়ের বড়ো ভয় হয়—তার সন্ত-বিয়ে-করা বউটি যদি স্বামীর সব খবর জানতে পেরে কোনোদিন চলে যায় পদ্মশ্রীর মতো গটগট করে।

এই বঙ্কিমের কাছ থেকে অজয় একটা গুপ্ত ব্যাপার জানতে পেরেছে। কোথাকার এক ধনী লাখপতির কন্যা নাকি নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে বছর কয়েক আগে। ঐ লাখপতি এখন বিপত্নীক ও

বৃদ্ধ। তাঁর আর কোনো সন্তান নেই। গোপনে অনুসন্ধান করে একমাত্র তিনিই জানতে পেরেছেন যে, তাঁর সেই কন্যা মারা গেছে। তাঁর ভাইয়েরা এখন থেকে সম্পত্তি পাবার জন্য ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রের মতো বসে রয়েছে। কিন্তু তিনি কাউকে এক পয়সাও দেবেন না। তাঁর মেয়ে বেঁচে থাকলে আজ ষোলো-সতের বছরের হতো। অনেক ভেবে-চিন্তে শেষে তিনি মিঃ গুপ্তর কাছে এলেন মেয়ের একটি ফটো নিয়ে, এবং তাঁকে অনুরোধ করলেন, ঐ রকম অবিকল দেখতে এবং ঐ বয়সী কোনো মেয়েকে যোগাড় করে দিলে তিনি পাঁচ হাজার টাকা দিতে রাজী।

মিঃ গুপ্ত এই প্রস্তাব একেবারে লুফে নিলেন। এ ধরনের কাজ এর আগে কয়েকবার করে তাঁর প্রচুর লাভ হয়েছে। মিঃ গুপ্ত অজয়ের হাতে ঐ ফটোখানা দিয়ে কলকাতার সমস্ত মেয়ে-স্কুলের প্রতি নজর রাখতে নির্দেশ দিলেন। অজয় এ কাজে খুব অভিজ্ঞ। এর পর থেকে অজয় তিন মাস ধরে কলকাতার সমস্ত মেয়ে-স্কুলগুলোর সামনে স্কুল বসার আগে এবং ছুটি হবার সময় ধরনা দিয়ে বেড়িয়েছে।

তিনটে মাস যেতে না যেতে লাখপতি আবার এলেন মিঃ গুপ্তর কাছে—পৃথিবীতে তাঁর মেয়াদ নাকি ফুরিয়ে আসছে। কি একটা মারাত্মক ধরনের অসুখে নাকি তাঁকে পেয়ে বসেছে। তাই তিনি টাকার অঙ্ক বাড়িয়ে পাঁচ হাজার থেকে সাত হাজার করে দিলেন। যত শীগগির সম্ভব সম্পত্তির একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে যাবেন। আপন ভাইদের একটা কানাকড়িও দেবেন না। অপরের মেয়ে প্রথমে তো একেবারে রেগে আগুন হয়ে থাকবে—তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে শান্ত করে তবে সম্পত্তি সব ওর নামে লিখে দিতে হবে। এদিকে যে যমরাজ লাখপতির সমস্ত টাকার গরমের ওপর ঠাণ্ডা বরফ-জল ঢেলে দিয়ে নিষ্ঠুর পদে এগিয়ে আসছে গটগট করে।

বঙ্কিম আরো বলেছিল অজয়কে, দেখো না, আবার কিছুদিনের

মধ্যে টাকার অঙ্ক ন'হাজারে ওঠে কি না!

সত্যিই গত মাসে ন'হাজারে উঠে গেছে।

পরে মিঃ গুপ্ত সুকুমারকেও নিযুক্ত করেছিলেন, অজয়ের সঙ্গে তাড়াতাড়ি কাজ সম্পন্ন করার জন্য। সুকুমারও এ লাইনে অভিজ্ঞ। কিন্তু সুকুমার কিছুই করতে পারে নি, প্রকৃতপক্ষে তাপসীকে আবিষ্কার করেছে অজয়-ই।

প্রায় নিরাশ হয়ে পড়েছিল অজয়। ভেবেছিল—ঐ ফটোখানার মতো দেখতে, আর কোনো মেয়ে সে এই কলকাতা থেকে খুঁজে বার করতে পারবে না কিছুতেই। যদিও এ ধরণের কাজ হাঁসিল করে এরা বেশী টাকা অতিরিক্ত হিসেবে পায় না, কিন্তু প্রমোশনের পথটা প্রশস্ত হয়ে থাকে।

প্রতিদিন দু'বেলা একটা অজ্ঞাত কিশোরীর ছবি দেখতে দেখতে অজয়ের কল্পনালোকে যেন একটা রক্তমাংসের কিশোরী গাঁথা হয়ে গিয়েছিল। যেন প্রতিদিনই কতবার না ঐ মেয়েটা তার চোখে পড়ে! এমনকি মধ্যরাত্রে বিচিত্র স্বপ্ন দেখে অজয় বিছানায় চমকে লাফিয়ে উঠতো। ট্রামে বা বাসে করে যাচ্ছে অজয়, হঠাৎ এক জায়গায় একদল স্কুলের মেয়ে হুড়মুড় করে উঠে পড়লো ঐ ট্রামে বা বাসে। ওদের মধ্যে একটা মেয়ের সাথে ঐ ছবিটা মিলে গেল অবিকলভাবে! ঐ মেয়েটা বসবার জায়গা পায় নি—অজয়ের প্রায় গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। ওর বুকে বই-খাতা ধরা। আর তখন অজয়ের বুকে সে কী ভীষণ তোলপাড়......

চায়ের দোকানের সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে মাটির ভাঁড়ে করে চা খাচ্ছিল অজয়। মাত্র দুটো আঙুল দিয়ে ভাঁড়ের কানা ধরা ছিল। সবে মাত্র একটা চুমুক দিয়েছে—এমন সময় একটা মেয়েকে যেতে দেখলো বই-খাতা নিয়ে। মেয়েটার মুখের দিকে নজর পড়তেই অজয় এমন চমকে উঠেছিল যে তৎক্ষণাৎ তার হাত থেকে সেই প্রায় ভর্তি চায়ের ভাঁড়টা স্খলিত হয়ে পড়ে গিয়েছিল

পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের ওপর। গরম চা পায়ের ওপর পড়ে যাওয়া সত্ত্বেও সে দিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা না করে পয়সা কয়টা দোকানদারের দিকে প্রায় ছুঁড়ে দিয়ে অজয় অমনি সেই মেয়েটার পিছু নিয়েছিল।

সেই মেয়েটাই তাপসী। তাপসীর মুখের সাথে সেদিন ফটোটা হুবহু মিলে গিয়েছিল আশ্চর্যজনক ভাবে। অজয়ের মনে হয়েছিল —আকাশের চাঁদ বুঝি তার হাতের কাছে এসে গেল! তারপর দীর্ঘদিন ধরে অজয় আর সুকুমার ছায়ার মতো ঘুরে বেড়িয়েছে তাপসীর পিছু পিছু। ও কোথায় থাকে, কোন্ স্কুলে পড়ে, কোথায় যায়—এমনকি তাপসী যে মামার বাড়ীতে যায়, তাও অনুসরণ করে ওরা জানতে পেরেছে।

এর পর চলেছে প্রতীক্ষার পালা। যদিও বহু কষ্টে একটা মেয়ে খুঁজে পাওয়া গেল, তাকে তো দিন-দুপুরে রাস্তার মাঝ থেকে শত শত লোক-চক্ষুতে ধূলো দিয়ে গাড়িতে তুলে নেয়া যায় না! —কাজেই রীতিমতো হন্যে হতে হয়েছে অজয় আর সুকুমারকে।

আজ নৌকার ওপরে তাপসীর পাশে বসে হঠাৎ অজয়ের মনে পড়ে গেল সেই প্রথম দিনের কথা—তাপসীকে দেখতে পেয়েই অজয়ের পায়ের পাতার ওপর গরম চা পড়ে যেতে কি রকম জ্বলে উঠেছিল—তবুও মুখে কোনো বিরক্তির রেখা ফুটে ওঠে নি, বরং একটা পুলকের ঢেউ খেলে গিয়েছিল তার বুকের ভিতর দিয়ে।

তাপসী বোরখা পরে জড়োসড়ো হয়ে নৌকার ওপরে বসে আছে চুপচাপ। ওর একটু যেন শীত করছে, কিন্তু সে বুঝতে পারছে না কিসের জন্য, ভয়ে না নদীর ঠাণ্ডা হাওয়ায়।

তাপসী আর বাঁচতে চায় না—একদম না। এরা যদি কোথাও ওকে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলে—সেটাই তার পক্ষে মঙ্গলের।

সে জানে, তার চেয়ে আরো কষ্ট পেয়ে এ পৃথিবীতে অনেকে বেঁচে আছে—তারা বেঁচে থাকবার জন্য, এ পৃথিবীতে টিকে থাকবার জন্য কত রকম অস্ত্র তৈরী করেছে। কিন্তু তাপসী কোনো অস্ত্র

তৈরী করবে না। সে একবার মামীমার সঙ্গে গ্রামের দিকে বেড়াতে গিয়ে দেখেছে, ভোরবেলা সেই ভীষণ শীতের মধ্যে চাষীদের মেয়েরা এক কোমর কাদাজলে নেমে শাক তুলছে, আরও কত রকম কাজ করছে। কোমর বেঁকিয়ে কাজ করার সময় ওদের শরীরগুলো 'U' অক্ষরের মতন হয়ে যায়। আর কলকাতার স্বল্প বৃষ্টিতে ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহাশয়দের মুখখানা হয়ে থাকে যেন বাংলা '৫'-এর মতো। তাপসী বর্ষাকালেও গ্রামাঞ্চলের দিকে গেছে, তখন লক্ষ্য করেছে, সেদিককার পথ-ঘাটের মাঝে মাঝে এমন অবস্থা হয় যে গরুর গাড়ীর আস্ত চাকাও ডুবে যায়!

ঠিক সেই সময় অজয় তাপসীর পাশে বসে ভাবছে, এই মেয়েটা আর কিছুদিন বাদে লাখপতি হতে চলেছে! বুড়োকে যদি বুদ্ধি করে এ একটু সেবা-ভক্তি করে আর একটু মেনে চলে—তা হলে বুড়ো তো এর ওপরে একেবারে গলে পড়বে! ইস্, বিনা আয়াসে এই মেয়েটা মুহূর্তের মধ্যে লক্ষ লক্ষ লোককে ডিঙিয়ে যাবে! শীগগির এর মাথায় কামড়ে বসবে লাখ টাকার মুকুট!

উঃ কি কষ্ট দিয়েছে এই মেয়েটা ওদেরকে! কত দিনের পর আজ কত কষ্টে একে ধরা হয়েছে! বড়ো বড়ো রুই-কাতলা ইচ্ছে করলে অনেক ধরা যায়। কত দিন তো এরা তাপসীর পিছু পিছু হেঁটেছে, ওর স্কুল পর্যন্ত গেছে, এসেছে। কখনো তাপসী এ ফুটপাথে, আর ওরা অপর ফুটপাথে, কখনো একই ফুটপাথে তাপসীর থেকে তিন হাত ছাড় দিয়ে ওরা ছায়ার মতো পিছু পিছু অনুসরণ করে গেছে। তাপসীর এত কাছে থেকেছে যে ওরা ইচ্ছা করলেই বাঁকানো ছাতার হাতলটা দিয়ে তাপসীর ঘাড়ে পিছন থেকে লাগিয়ে হিড়হিড় করে টেনে নিতে পারতো।

একবার তো সুকুমার তাপসীর হাওয়াই চটির ফিতেটা ছিঁড়েই দিল। অবশ্য ইচ্ছে করে সে ছেঁড়ে নি। তাপসী একজনকে পাশ দেবার জন্য একটুখানি পথের মাঝে দাঁড়িয়েছিল, আর সুকুমারটা

পিছন পিছন এত জোরে আসছিল যে, তার জুতো তাপসীর ডান পায়ের চটিটাকে চেপে দিয়েছিল।

সুকুমার অজয়কে বলছে, অজয়, এবার তুই আর আমি একসঙ্গে হু'নম্বরে উঠবো! ওঃ, কম জ্বালা দিয়েছে এই মেয়েটা আমাদের! তা যাই হোক, এই জ্বালাগুলো আমাদের সৌভাগ্য বলতে হবে। অজয়, তুই তো শালা এর মধ্যেই বিয়ে করে ফেলেছিস! এবার ছাখ না, হু'নম্বরে উঠলে আমিও তোর মতো একটাকে—

সুকুমার নৌকায় ওঠার পর থেকেই বকে যাচ্ছে এরকম। খুব আনন্দের সময় তার খেয়ালই থাকে না, যাকে সে বলছে, সে শুনছে কি না। আনন্দে বিগলিত হয়ে সুকুমার অনেক উচ্ছ্বাসে, অনেক কথা বলে যাচ্ছে অজয়কে একনাগাড়ে, কিন্তু অজয় তার নিজের জগতে নৌকায় ওঠার পর থেকেই বিভোর হয়ে পড়েছে—সুকুমারের কথায় তার একটুও কান নেই। যেন কেউ পিচ দিয়ে অজয়ের কান হুটো বন্ধ করে দিয়েছে।

বোরখার জাল দিয়ে তাপসী বিশেষ কিছু দেখতে পাচ্ছে না। চারিদিক শুধু অন্ধকারে অন্ধকার, আর দাঁড় টানার শব্দ শোনা যাচ্ছে। মধ্যগঙ্গার নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে চতুর্দিকে, আর তাপসীর হু'পাশে হু'জন দস্যু! এপাশের লোকটার নাম অজয়। সুকুমারের কথা থেকে তাপসী বুঝতে পেরেছে। একবার তার মনে হলো, সে কি মা-গঙ্গার কোলে ঝাঁপ দিয়ে মরবে? নাঃ, সে ঝাঁপ দেবে না। সে শুনেছে—গঙ্গা নাকি মহাদেবের জটা থেকে নেমে এসেছে। কিন্তু একথা তাপসী আদৌ বিশ্বাস করে না, সে জানে, অন্য নদীর যেভাবে জন্ম হয়—সেই রকম স্বাভাবিক ভাবেই গঙ্গারও জন্ম হয়েছে। কোন দেবতার জটা-ফটা থেকে গঙ্গা নেমে আসে নি।

মাঝি জটাধর কান খাড়া রেখে সুকুমারের কথাগুলো সব শুনছে, এবং তাপসীকে জোর করে কোথাও নিয়ে যাচ্ছে—জটাধর তা বুঝতে পারছে স্পষ্টই।

অজয় ভাবছে এই মেয়েটা যেদিন লাখপতির আসনে গিয়ে বসবে, সেদিন কি অজয়কে সে মনে মনে ধন্যবাদ জানাবে না? কেন জানাবে না? অজয়ের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করাই তো উচিত! কারন, এদের জন্যই তো সে লাখ টাকার সম্পত্তির মালিক হতে পেরেছে। তা না হলে সম্পত্তি দূরের কথা, একটা চাকরিও জুটতো না এ জীবনে ওর! হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানাবে বৈকি, নিশ্চই জানবে! গদি-চেয়ারে বসে মাঝে মঝে স্বপ্নের মতো ওর মনে হবে—ভাগ্যিস ঐ দস্যুগুলো ওর জীবনে এসেছিল, সেইজন্যই তো সে আজ—! সেই এক রাতে ক'জন দস্যু আর একটা কালো রঙের মোটর গাড়ী—

সুকুমার অজয়ের উরুর ওপর পাঞ্জা দিয়ে ঘষে ডাকছে, অজয়, এই অজয়! শোন না—

কিছুক্ষণ পরে অজয় সাড়া দিল, উঁ, কি হয়েছে! সুকুমার এবার যেন একটু রেগে উঠে বলে, কতক্ষণ ধরে ডাকছি—আর তুই শুনতে পাচ্ছিস না? ঐ যে খাবারগুলো কেনা হলো, সেগুলো মেয়েটাকে দিয়ে দেবো? এখন না খেলে হয়তো আজকের রাতের মধ্যে আর কোন খাওয়া হবে না।

অজয় আস্তে বললো, হ্যাঁ, দে।

দু'প্যাকেট খাবার কেনা হয়েছিল তাপসীর জন্য। সুকুমার সেই দুটো প্যাকেট এনে তাপসীর কোলের ওপরে দিয়ে বললো, এই মেয়ে, এগুলো খেয়ে নে শীগ্‌গির! না খেলে শুধু এই গঙ্গাজল খেয়ে থাকবি—আমার কী!

তাপসী মুখে কিছু বললো না, প্যাকেট দুটো ছুঁড়ে দিল কোলের ওপর থেকে। আর সেগুলো নৌকার কানায় পড়লো।

সুকুমার বেশ একটু আশ্চর্য হয়ে গেছে, এতক্ষণ তাপসীকে ভেবেছিল বরফের মতো একটা ঠাণ্ডা মেয়ে—ধমক দিলে হয়তো কেঁদেও ফেলবে। প্যাকেট দুটো কুড়িয়ে নিয়ে সুকুমার আবার ওকে বললো, এঃ, খুব খাবার ফেলে দেওয়া হচ্ছে? চল আগে

আখড়ায়—তারপর রস বেরোবে।

তাপসীর খাবার ফেলে দেওয়া দেখে অজয়ের চোখের সামনে আস্তে আস্তে ফুটে উঠলো একটা নারীমুখ—এককথায় সুন্দরী তার ডানদিকের ঠোঁটের নীচে বড় আকারের কালো তিল জ্বলজ্বল করছে। কপালেও বড়ো আকারের একটা লাল টুকটুকে সিঁদুরের টিপ। এই নারীটি অন্য কেউ নয়, প্রাণাধিক পত্নী শীলা।

নারীমূর্তির ঠোঁট দুটো যেন আস্তে আস্তে খুলে গেল। তার মুখের প্রতিটি রেখা থেকে ঘৃণা ফেটে পড়ছে। অজয়কে যেন সে বলছে, ইস্, তোমাকে কত ভাল বলে জানতাম! আজ তুমি একজন চোর, নারী-অপহরণকারী—ছিঃ ছিঃ ছিঃ! তুমি বলেছিলে, কোন্ এক কোম্পানীতে এজেন্টের কাজ করো—এই কি সেই কাজ করা? ইস্, আমার এ অঙ্গে তোমার দেওয়া শাড়ী-গয়না আমি পরেছি! আজকে এক্ষুণি আমার অঙ্গ জ্বলে-পুড়ে ভস্ম হয়ে যাক! ভস্ম হয়ে যাক!

অজয় তার স্ত্রীর সম্পর্কে ভীষণ দুর্বল। মাত্র ছ'মাস আগে শীলাকে বিয়ে করেছে। পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে শীলাকে বিয়ে করার পর অজয়ের কাছে একটা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ও নতুন জগৎ খুলে গেছে। এতদিন তার জীবনটা ছিল নিষ্প্রেম নীরস। সুদীর্ঘ কুড়িটি বছর সম্পূর্ণ মরুভূমির মাঝখানে কেটে গেছে। অদূরে যে একটা মরুদ্যান আছে, সেখানে যে গাছপালা, ছায়া জল, অনেক কিছুই আছে—তার সন্ধান পায় নি। এতকাল পরে অজয় আজ সেই মরূদ্যানের সন্ধান পেয়েছে; সেই জন্য শীলা আজ অজয়ের রক্তে মিশে গেছে। শীলাকে ছাড়া আর অজয় বাঁচতেই পারবে না একদম।

সেই নারীমুর্তি আবার বলছে, ছিঃ ছিঃ, মা-গঙ্গার বুকের ওপর এ কি মহাপাপ করছো! আমি আর এই মেয়েটার মধ্যে কি তফাৎ? নারী-হরণ যে মহাপাপ! ইস্, একজন নারী অপহরণকারী

তার নোংরা মুখ দিয়ে আমার মুখে চুমু খেয়েছে! খসে যাক, খসে যাক এক্ষুণি আমার এ মুখ!

অজয় মনে মনে ওর সাথে কথা বললো, শীলা, তুমি ভুল বুঝছো, তুমি বুঝতে পারবে না, কত কষ্টে এটুকু যে যোগাড় করেছি। তা ছাড়া তোমার জন্য—

নারীমূর্তি বলছে, হ্যাঁ, আমার জন্যই। বিয়ের আগে বুঝি এরকম পাপ কাজ করতে না? এক্ষুণি এই মেয়েটাকে মুক্তি দাও।

শীলার মূর্তি চোখের সামনে ভেসে ওঠার পর থেকেই অজয় ভীষণভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে। এবং ক্রমশঃ আরও দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত তার মনের খুঁটিগুলি বেশ শক্ত-সমর্থ ছিল। প্রবল ঝড়ের দাপটে মাঝসমুদ্রে জাহাজের মাস্তলগুলো যেমন একে একে হেলে পড়ে,—অজয়ের মনের অবস্থা এখন সেইরূপ। নৌকাডুবির সময় মানুষ যেমন জলকেই আঁকড়ে ধরতে যায়, অজয় তেমনি শূন্যকেই আঁকড়ে ধরতে চাইছে। তার চোখের সামনে এখন সব অন্ধকার, সব ফাঁকা! অজয়ের কাছে শীলাকে হারানো মানেই সর্বস্ব হারিয়ে ফেলা!

অজয় শীলাকে এত ভালোবাসে যে, শীলার জন্য সে অনায়াসে নিঃস্ব হয়ে যেতে পারে, শীলাকে পূজোও করতে পারে। কিন্তু তাকে সে কিছুতেই হারাতে দেবে না। বঙ্কিম চাকরির জন্য বউকে আটকায় নি। প্রজাপালনের জন্য ও রাজধর্মের জন্য রামচন্দ্র সীতা-দেবীকে তপোবনে বিসর্জন দিয়েছিলেন। কিন্তু অজয় তা কিছুতেই পারবে না—বরং সে বউয়ের জন্য এ চাকরি ছেড়ে দিয়ে রিক্সা কিংবা ঠেলা টানতে পারবে, কিংবা কুলিগিরি করবে—সে তবুও ভালো।

নিজেকে ভীষণ অপরাধী বলে মনে হচ্ছে অজয়ের।

সেই নারীমূর্তি আবার বলছে, অবিলম্বে এই মেয়েটার কাছে হাঁটু গেড়ে বসে ওর পা ধরে ক্ষমা চেয়ে ওকে মুক্তি দাও! যদি না

দাও, কাল সকালের মধ্যেই আমি গলায় দড়ি দিয়ে হোক আর যেভাবেই হোক, মরবোই।

সঙ্গে সঙ্গে অজয় আর্তনাদ করে উঠলো—শীলা! শীলা!

সুকুমার ঘরের মধ্যে বসেছিল। ঘরে আগুন লাগলে লোকে যেমন ব্যস্ত হয়ে ওঠে, চীৎকার শোনামাত্র সুকুমার সেই রকম ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, কি হয়েছে, কি হয়েছে? অন্য নৌকা আমাদের ফলো করেছে?

বলেই সে ক্ষিপ্রহস্তে ব্যাগ থেকে একটা দূরবীণ বের করে পিছনদিকে দেখতে লাগলো। গুলিভর্তি পিস্তলটাও ঠিক আছে কিনা দেখে নিল।

মুখ থেকে শব্দ তুটো বেরিয়ে যেতেই অজয় একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল। সেটাকে চাপা দেবার জন্য সে তাড়াতাড়ি বলে, না রে, কেউ পিছনে ফলো করছে না। ছাখ সুকুমার, মিঃ গুপ্ত কি রকম আমাদের ঠকাচ্ছে! নিজে ন'হাজার টাকা নিয়ে মাত্র একশো তোকে আর একশো আমাকে দেবে! বল, অন্ততঃ তোকে এক হাজার আর আমাকে এক হাজাব টাকা দেওয়া কি উচিত ছিল না?

সত্যি? ঠিক বলছিস?

হ্যাঁ রে। আমি এক জায়গা থেকে শুনেছি।

ওঃ, প্রভু আমাদের জন্য নয় হাজার টাকা পাবে—আর আমাদের বেলায় ভিক্ষার মতো একশো টাকা করে—

তাপসীকে কেন আখড়ায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, এ কাজের জন্য কত টাকা চুক্তি—এসব কথা অজয়ই একমাত্র জানতে পেরেছিল বঙ্কিমের কাছ থেকে। সুকুমার বা অন্য কেউ তা জানে না। মোটরে আরো তু'জন ছিল, ওরাও এ ব্যাপার জানে না, ওরা এদের শিষ্য-শিষ্যা। চার নম্বর দলের ওপর মাস্টারি করে তিন নম্বর, তু'নম্বর ও এক নম্বর দল। আবার তিন নম্বর দলের ওপর মাস্টারি করে পূর্বের

দলগুলো।

জটাধর মনে মনে বললো, সে কি এই মেয়েটাকে বাঁচাবে এই দস্যুগুলোর হাত থেকে? চেষ্টা করলে হয়তো বাঁচানো যেতে পারে—অবশ্য সেজন্য অনেক টাকা ছাড়তে হবেই। তবু যদি একটা মেয়ে বাঁচে—তাছাড়া, এরকম ক্ষেত্রে অনেক সময় মেয়ের বাবা-মার কাছ থেকেও পরে পুরস্কার পাওয়া যায়।

সে বললো, শোনো অজয়, এই মেয়েটাকে অন্য কারো হাতে তুলে না দিয়ে আমার হাতে দাও না! আমার সব কাজ-টাজ করে দেবার জন্য একজন লোকের দরকার। না হয় একেই পুষবো—যদি পোষ মেনে চলে! কি অজয়, দেবে?

অজয় কিছু বলবার আগেই সুকুমার বললো, তুমি নেবে? কিন্তু টাকাকড়ির ব্যাপার কি হবে?

মাঝি বললো, সেকথাই তো বলতে যাচ্ছিলাম! আমি মোট তিনশো টাকা দিচ্ছি তোমাদের—রাজী তো?

সুকুমারের চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে জ্বলে উঠলো। এমনিতে সে একটু অর্থলোভী। তিনশো টাকা মোট পেলে তার প্রাপ্য দাঁড়াবে দেড়শো টাকা! এতগুলো টাকা এর আগে সে কখনোই পুরস্কার হিসেবে পায়নি। এবারে দেড়শো টাকা হাতে পেলে সুকুমার একটা ট্রানজিষ্টর কিনবে, অনেকদিন ধরে তার একটা রেডিও কেনা হচ্ছে না।

সুকুমার মনে মনে খুশী হয়ে উঠে অজয়কে বললো, সেই ভালো রে! মাঝির কাছেই দেওয়া হোক—তা হলে আমাদের পাওনাটা মোটা হবে। কি হবে আর গুপ্তমশাইকে সাহায্য করে? আমাদের যেরকম ঠকাচ্ছে, এবার তার নিজেরও সেরকম ঠকা উচিত। সবাই যখন নিজের পাওনাটা বেশী দেখে, তবে আমরাই বা দেখবো না কেন? আমরা এত পরিশ্রম করবো—

অজয় আর কি বলবে। তার সামনে নেমে এসেছে সর্বস্ব

হারানোর বিষাদের ছায়া। হয়তো সে বাড়ী ফিরে সত্যিই দেখবে শীলার মৃত্যু! অস্ফুটকণ্ঠে অজয় বললো, তবে তাই হোক।

সুকুমার সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে জটাধরকে বললো, ওহে মাঝি, শোনো টাকা ফেলার সাথে সাথেই মেয়ে তোমার হয়ে যাবে, আর কোন দায়-দায়িত্ব আমাদের থাকবে না। সমস্ত ঝুঁকি এবার তোমার। পুলিশে ধরলেও আমরা আর কিছু জানি না,—যদি আমাদের নাম বলে দাও, তা হলে এই গঙ্গায় তোমাকে নৌকাসুদ্ধ ডুবিয়ে মারবো। অথবা আমাদের গ্যাং এসে তোমার মুণ্ডু ছিঁড়ে নিয়ে যাবে।

জটাধর ঘাড়ের ওপর একবার হাত বুলিয়ে ওদেরকে জানালো, যে, ওরা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকতে পাবে। তারপর ওদের হাতে টাকা দিয়ে, গঙ্গার পাড়ে নামিয়ে দিয়ে জটাধর আবার দাঁড় টানতে শুরু করলো।

॥ দুই ॥

পনেরোই আগস্টের দিন স্টীমারটা কাকদ্বীপে এসে পৌঁছল।

স্টীমারটা রিজার্ভ করা। ওরা সব সমেত পঁচিশ জন। তার মধ্যে মেয়েরা আছে মোট দশজন। ষোল বছর থেকে আরম্ভ করে পঁয়ত্রিশ বছর বয়েসের মধ্যে সব লোকই আছে।

সুবীরও এসেছে ওদের সাথে—ইন্দিরা দেবীর কথা ফেলতে পারে নি।

আজকে আকাশটা বেশ ঝরঝরে—সোনালী রৌদ্র চতুর্দিকে

ফেটে পড়ছে। গঙ্গার অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, কিন্তু এখানকার গঙ্গা এত বেশী চওড়া যে, তার অপর পাড় দেখাই যায় না।

নদীর বুকের ওপর দিয়ে মাঝে মাঝে নৌকা ভেসে যাচ্ছে। আকাশে চিলেরা চক্কর মারতে ব্যস্ত। কোথায় কারা ছুটির দিনে স্ফূর্তি করতে কিংবা বনভোজনে এলো, এ নিয়ে ওদের কোনো ঔৎসুক্য নেই। জলের ওপর থেকে দু-একটা করে মৎস্য-নামক প্রাণীকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যেতে পারলে আজকের মতো খাবারের চিন্তা থেকে ওরা আব্যাহতি পাবে।

দুপুর-রৌদ্রে কোমর-জলে দাঁড়িয়ে ওরা জন বারো ফুটবল খেলছে। ঠিক খেলা বলা যায় না—বল নিয়ে ছোঁড়াছুঁড়ি। তীরে অল্প জল, তার ওপর দিয়ে একটা কাল্পনিক রেখা টেনে ওরা দুই দলে খেলছে মুখোমুখি। এক দলে ছ'জন ছেলে, অপর দলে ছ'জন মেয়ে।

ছেলেরা চাইছে বলটাকে ছুঁড়ে মেয়েদের সীমানার মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে, আর মেয়েরাও চাইছে ফের ঐ বলটাকে ছুঁড়ে ছেলেদের সীমানায় পাঠিয়ে দিতে—এনিয়ে অল্প জলে বেশ একটা হুটোপুটি চলছে। যেন একটা বনে একসাথে দুটো সিংহ মুখোমুখী দাঁড়িয়ে গর্জিয়ে বলছে—আমিই এই বনের পশুরাজা!

এখানে পায়ের জোরের একদম দরকার নেই। পদাঘাতে বা পদশক্তিতে কোনো অসাধ্য কিছু সাধন করে থাকলেও, সেই মহানকে দিয়ে এই খেলায় মোটেই জয়লাভ করা যাবে না। এদের খেলার প্রধান সম্বল হলো হাতের জোর আর তীব্রগতিতে সাঁতরে যাবার ক্ষমতা।

ছুঁড়তে ছুঁড়তে বল কখনো একটু দূরে চলে যাচ্ছে, আবার কেউ সাঁতারে গিয়ে তা নিয়ে আসছে। সুবীরও এই খেলায় নেমেছে।

আর জনা-তিনেক ডাঙায় দাঁড়িয়ে ওদের খেলায় উৎসাহ যোগাচ্ছে আর খেলা উপভোগ করছে।

বাকী দশ জন স্টীমারটা নিয়ে মাঝ গঙ্গার দিকে গেছে—খানিক পরেই ফিরবে। ওরা তুটো ট্রানজিস্টার বেশ জোরে খুলে দিয়েছে—জলের ওপর থেকে যান্ত্রিক সুর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে।

সুবীরের বাঁ চোখে কি একটা পড়ায় সে অল্পক্ষণের জন্য খেলা থেকে বিরতি নিয়ে তীরে দাঁড়িয়ে চোখ ঘষছে। এমন সময় খেলোয়াড়রা হৈ হৈ করে উঠলো। বেশ একটা চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে ওদের মধ্যে, নারীকণ্ঠে তীব্র আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে—ওরে বাবারে, কুমীরে খেয়ে ফেললো! যে যেদিক পারছে, পালাতে শুরু করছে আপন আপন প্রাণ নিয়ে—খেলা ভেঙে গিয়ে সে কি ভীষণ হুলুস্থুল কাণ্ড!

সুবীর ইতিমধ্যে চোখ-ঘষা থামিয়ে আচমকা ঐ দৃশ্য দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। পালাবে কি পালাবে না, ঠিক করতে পারছে না—এমন সময় দীপালী নামে একটি মেয়ে ভয়ে দিশেহারা হয়ে জল ছেড়ে ডাঙার দিকে ছুটে আসতে গিয়ে সুবীরের সঙ্গে ধাক্কা লেগে মাটিতে পড়ে গেল।

দীপালীকে এরকম অবস্থায় একা ফেলে রেখে সুবীর নিজের প্রাণ বাঁচাতে কক্ষনো পালিয়ে যাবে না। কারণ, এটা ওর স্বভাবের মধ্যেই নয়—যতক্ষণ সুবীরের প্রাণ আছে, ততক্ষণ দীপালীকে বাঁচাবেই। এর জন্য সে অনেকবার লাঞ্ছিতও হয়েছে। দীপালী মাটিতে পড়ে গিয়ে আর উঠতে পারছে না—কনুইতে ওর আচমকা লেগেছে। সুবীর জিজ্ঞেস করলো, কি হয়েছে দীপালী? দীপালীর চোখে-মুখে ভীষণ ভয়ের চিহ্ন, বললো, কুমীর! কুমীর! সুবীরদা, আমায় একটু তুলে দাও।

এতক্ষণে সত্যিকারের একটা কুমীর দেখতে পেল সুবীর। বেশ লম্বা, মোটাসোটা। গুটি গুটি পায়ে ওটা এগিয়ে আসছে দীপালীর দিকে। অল্প জলে ওর দেহটা বেশ ভালো দেখা যাচ্ছে। পুরুষ যেমন জীবনে প্রথম কাম্য নারীর সম্মুখে দাঁড়িয়ে একটু কাঁপে, এই

কুমীরটাও হয়তো ওর জীবনে এই প্রথম নারী-মাংসের স্বাদ পেতে চলেছে – তাই বুঝি ওর এই কম্পমান ধীরগতি।

পৃথিবীতে এত কোটি নারী থাকতে পুরুষের আকাঙ্খিত বিশেষ নারীকে পাওয়া যেমন তুর্লভ, তেমনি সারা তুনিয়ায় কয়েক শত কোটি মানুষ থাকা সত্ত্বেও কুমীরের পক্ষে একটা মানুষকে নাগালের মধ্যে পাওয়াও মহা তুর্লভ। কবে একটা জাহাজডুবি হবে, কিংবা অনুরূপ কিছু একটা ঘটবে, যা ওদের শিকারকে ওদের নাগালের মধ্যে পৌঁছে দেবে—না', সে বড়ো সুদীর্ঘ প্রতীক্ষা—সকলের পক্ষে নব-মাংস চেখে নেওয়া সম্ভব হয় না। অতুল গুপ্তধনের সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকলে মানুষের বুকের মধ্যে যেমন ওলট-পালট চলে, সেইরকম কোনো দশা এই কুমীরটার বুকের মধ্যে হচ্ছে কিনা কে জানে!

কুমীরকে দেখে ক্ষণমাত্র কাল বিলম্ব না করে সুবীর দীপালীকে তু'বাহুর ওপর তুলে নিয়ে সোজা দৌড় দিয়েছে। পরিষ্কারভাবেই সে কুমীরকে দেখতে পেয়েছিল। দীপালীকে নিয়ে মাটির ওপর দিয়ে সে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়োচ্ছে। তার ভয় হচ্ছে—কুমীরটা বুঝি তার পিছন পিছন তেড়ে আসছে বাঘের মতো।

দেখতে দেখতে ঐ স্থান শূন্য হয়ে গেল। একটু আগেই এখানে ওখানে প্রাণ-প্রাচুর্যের যে হিল্লোল বয়ে যাচ্ছিল—কিন্তু এখন জন-প্রাণীহীন! কার বিষদৃষ্টিতে এখন ঐ স্থান অভিশপ্ত!

বলা বাহুল্য যে, যারা জলে নেমে খেলা করছিল, তারা প্রত্যেকেই ভালো সাঁতার জানে। ঘরে আগুন লাগলে যেরকম চীৎকার-ধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়, সেইরকম ধ্বনি প্রথম প্রথম খুব শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল, কিন্তু এখন নীরব। থমথমে। এখন যদি কারো হাতে এক লক্ষ টাকা দিয়ে ঐ জলে নামতে বলা হয়—নিঃস্ব ভিখারী পর্যন্তও নামতে রাজী হবে না! প্রাণের চেয়ে টাকা বড়ো নয়। একটা কুমীর না, কয়েকটি কুমীর বিনা নোটিসে চুপি চুপি

ওদের এলাকায় ঢুকে পড়ে খেলা ভঙ্গ করে দিয়েছে।

যারা ডাঙার দিকে ছুটে পালিয়েছিল, তারাই প্রাণে বেঁচেছে। আর যারা সাঁতারে গঙ্গার দিকে গিয়েছিল, তারা ভেবেছিল—সাঁতারশক্তিতে বুঝি তারা কুমীরের নাগালের বাইরে চলে যাবে। কিন্তু হায়! ওরা কী ভুল করেছিল! ওরা প্রত্যেকেই কুমীরের পাকস্থলীতে হয়ে গেছে চালান। ওরা জানতো না, কুমীররা যে ওদের চেয়ে আরও কত বেশী সাঁতারে পটু! যাদের সারাটা জীবন জলে জলেই কেটে যায়, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জলেই সাঁতার কাটে যারা, যাদের দৈনন্দিন খাদ্য সংগ্রহ করতে হয় সাঁতার কেটে—তাদের তুলনায় মানুষ তো শখ করে একটু জলে নামে। কাজেই ওদের সাথে কে আর কতক্ষণ সাঁতারে পারবে?

কিছুদূর আসার পর একটা গাছে দীপালীকে চড়িয়ে দিয়ে সুবীর ঐ গাছে চড়ে বসলো। তার এখনও ভয়, কুমীরটা ওদের পিছন পিছন বুঝি ছুটে আসছে। তাই সুবীর গাছের শীর্ষে উঠে তীক্ষ্ণ চোখে চারিদিকে দেখতে লাগলো।

হায়রে বন্ধুত্ব! প্রাণ-সংকটের সময় বন্ধুত্ব-ভ্রাতৃত্ব বুদ্‌বুদের মতো কোথায় মিলিয়ে যায়! সুনীল আর শ্যামলের মধ্যে কী বন্ধুত্ব না ছিল—কিন্তু কুমীরের উপস্থিতিতে একজন জল ছেড়ে ডাঙায় উঠলো, আর অপর জন সাঁতার লাগালো। কানাই আর বলাই, দুই ভাই—ওদের ভ্রাতৃত্ব রাম-লক্ষ্মণের মত—কিন্তু এখানকার এই ভীষণ মুহূর্তে পরস্পর পরস্পরকে ছেড়ে আপন প্রাণ নিয়ে দুইদিকে পালালো।

কে-ই বা জানতো, ওদের খেলা ভঙ্গ করতে আসবে কতকগুলো মুখপোড়া কুমীর! তা হলে ওরা কি খেলতে নামতো? জলে পা-ই ছোঁয়াতো না।

প্রথম কিছুক্ষণের মধ্যে আর কাউকে দেখা গেল না। খানিক পরে স্টীমারটা ফিরে এলো। স্টীমারের মধ্যে দশ জন ছিল, ওরা

নির্ভয়ে উঠে এলো ডাঙায়।

প্রথমে ওরা কাউকে কাছাকাছি দেখতে না পেয়ে ভাবলো যে, সঙ্গীদের খেলা বোধ হয় শেষ হয়ে গেছে—তাই কাছাকাছি নিশ্চয়ই কোথাও আছে। স্টীমার ফেলে রেখে দূরে কোথায় বা যাবে!

নদীতীরে এদিক ওদিক খুঁজেও যখন এরা কাউকে দেখতে পেল না, তখন বন্ধু-বান্ধবীদের নাম ধরে চীৎকার করে ডাকতে লাগলো।

ডাক শুনে ওরা আশ্বস্ত হলো বটে—কিন্তু কেউ এগিয়ে আসতে সাহস পেল না। সবার বুকে একই ভয়, পাছে কুমীরে ওদের ধরে।

অনেক ডাকাডাকির পর ওরা বেরিয়ে এলো ভয়ে ভয়ে, পা টিপে টিপে। পাখীর মতো ওদের চোখ তীক্ষ্ণ। ওদের কাছ থেকে ঐ দশ জন সব ব্যাপারটা জানতে পারলো। মজাদার স্থানে চলচ্চিত্র থেমে গেলে দর্শকদের যে-রকম অবস্থা হয়, সে-রকম অবস্থা হলো ঐ দশ জনের। এতক্ষণ যে আনন্দ ওদের প্রাণে বিরাজ করছিল—তার আর লেশমাত্র নেই।

একজন তো নদীর তীরে শুয়েই পড়লো—তার ছোটো ভাইকে কুমীরে নিয়ে গেছে। আর একজন মেয়ে সিল্কের শাড়ী পরে জলে-ভেজা কাদা-মাটির ওপর বসেই পড়লো কাঁদতে কাঁদতে। তার দিদি চলে গেছে—আর এ জীবনে ফিরে আসবে না—'রীতু' বলে ডাকবে না ওকে।

সবাইকে গুণে দেখা গেল ওদের মধ্যে আট জন কম—ঐ আট জন কুমীরের হাতে শিকার হয়েছে বলে ওরা ভেবে নিল।

সবাই এখন একসঙ্গে স্টীমারে উঠতে পারলে বাঁচে, কেউ আর ডাঙায় দাঁড়িয়ে থাকতে রাজী নয়। স্টীমারে সবাই ওঠার পর জন চারেক সাহসী পুরুষ ঠিক করলো, তারা নেমে এদিকে-ওদিকে আর একটু খুঁজে দেখবে—যদি আর কাউকে দেখতে পায়। তাই ওরা লাঠি হাতে নিয়ে তীরে নেমে পড়ে এদিক ওদিক আর একটু

খুঁজতে লাগলো।

এটা কুমীরদের এলাকা—তাই ওদের রাজত্ব, সুতরাং ওরা মানুষের পদক্ষেপ সহ্য করবে কেন? বাগানে ঢুকলে মালী যেমন তেড়ে আসে—অথচ সে নিজে ঐ জমির সত্যিকারের মালিক নয়—তেমনি ঐ কুমীরগুলো যদি মালীদের অনুকরণ করে থাকে, তা হলে এমন কি বেশী দোষের! আর কুমীররা তো মানুষ নয় যে, ওদের কয়েক বছর সশ্রম কারাদণ্ড দিলে ওরা অমনি ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, ওদের চরিত্র সৎ হয়ে উঠবে। হাত-পা ছেদন করে শাস্তি দিলে মানুষেব যে-রকম শিক্ষা হয়, কুমীরদের বংশ নির্মূল করে ফেললেও সেরকম কোনো শিক্ষাই হবে না ওদের!

সুবীর আর দীপালী যেখানে ছিল, সেখানে ওদের ডাক গিয়ে পৌছালো না। ওবা তীর ছেড়ে একটু বেশী দূরে আশ্রয় নিয়েছিল। তাই ওবা আব কিছুই জানতে পারলো না।

শেষে ঐ চার জন খানিকটা হাঁক ডাক করে ফিরে এলো আবার ষ্টীমারে। সবাই এখনই রওনা হয়ে যেতে চায়—যে গেছে সে তো আর ফিরে আসবে না—অথবা বিলম্ব করে আর কি লাভ! ষ্টীমার তাই ছেড়ে দিল। আর কয়জন শোকে কেঁদে ভাষাচ্ছে।

যারা কুমীরের নাগালের বাইরে এসে প্রাণ বাঁচাতে পেরেছে, তারা ভাবতে লাগলো --আর এ জীবনে কক্ষনো এ-মুখো হবে না।

দেখতে দেখতে ষ্টীমার দিগন্তে মিলিয়ে গেল।

॥ তিন ॥

বিকেল হয়ে গেছে। দিবাকর এখন পশ্চিম দিগন্তে।

সুবীর আর দীপালী এখনো গাছের ডালে পা ঝুলিয়ে বসে আছে। ওরা এখনো গাছ থেকে নামবার উদ্যোগ করে নি।

সুবীর বললো, কতক্ষণ আর এভাবে বসে থাকবো· চলো দীপালী, এবার আমরা নেমে পড়ি।

দীপালী বললো, না, নেমে-টেমে এখন আর কাজ নেই। যদি আবার কুমীর আসে—

বাঃ তা বলে সারা দিনরাত গাছে উঠে বসে থাকবো নাকি? নামতে তো হবেই! কতদিন আর বাঁদরের মতো গাছে চড়ে বসে থাকা যায়?

ঠিক আছে, তবে কাল সকালে নামা হবে।

কাল সকালে! তা হলে আজকে একফোঁটা জলও খেতে পাবে না, এমন কি কালকেও খাবারের অনিশ্চিত। এখনো এখানে দিনের আলো রয়েছে—চলো বরং নেমে পড়ি।

দীপালীর চোখে-মুখে ভয় ছড়িয়ে পড়লো। তার মনে হলো, স্টীমারটা যদি চলে গিয়ে থাকে—। দীপালীর চোখ দুটো খুব টানাটানা, এবং কালো। ভয় পেলে ওকে খুব সুন্দর দেখায়। এমনিতে তো সে সুন্দরী। ঘাড় পর্যন্ত কেশরাশি। সুবীরকে সে এবার বললো, আমাদের স্টীমারটাকে যদি আমরা না পাই!

সুবীর দীপালীর মুখের দিকে আর তাকাতেই পারলো না। একথা সে অনেক আগেই জেনে গেছে। কিন্তু তবুও দীপালীকে সে বলতে পারে নি। কারণ, বললে দীপালীর ভয়ই শুধু· বৃদ্ধি পেতো, আর কোনো লাভ হতো না। সুবীর আর ওর ভয় বাড়িয়ে

দিতে চায় না। সেজন্য একথাটা সে একবারও বলে নি। অনেক আগেই গাছ থেকে নেমে পড়ে স্টীমারের খোঁজ করা উচিত ছিল ওদের। কিন্তু দীপালী এমন ভয় পেয়ে গাছের ওপর জড়োসড়ো হয়ে বসে ছিল যে, ওকে আর বলা-ই যায় নি নামার কথা। চট্ করে একটা কথা মনে আসতেই সুবীর বললো, তুমি যদি না নামো, তবে এখানে বসে থাকো একটু, আমি ওদিককার অবস্থাটা দেখে আসছি।

সুবীর নামবার উদ্যোগ করবার আগেই দীপালী ওর হাতটা ধরে ফেলে বললো, না সুবীরদা, তুমি নামবে না, কিছুতেই তোমার একা যাওয়া হবে না!

তা হলে আমি কি করবো? এই ডালের ওপর তোমার কাছেই বসে থাকি। শীগ্‌গিরই ফিরে আসতুম কিন্তু! তুমি অত বাঘ-ভাল্লুকের ভয় পাচ্ছ কেন?

তেমনিভাবে সুবীরের হাত ধরে থেকে দীপালী বললো, না, তুমি একা নামবে না। যেখানে যাবো আমরা দু'জনে একসাথেই যাবো—একা একা নয়।

দীপালীকে প্রাণে বাঁচিয়েছে সুবীর। সেইজন্য সুবীরের প্রতি কৃতজ্ঞতায় দীপালীর অন্তর ভরে আছে। সুবীর না বাঁচালে সে তো কুমীরের পেটেই চলে যেতো; এতক্ষণে অর্ধেক হজমও হয়ে যেতো! দীপালী কুমীরের পেটে গেলে কার আর কী ক্ষতি হতো! এই জগতের লোকে কি ওর মূর্তি গড়িয়ে পূজো করবে? সুবীরই তো আজ ওর প্রাণদাতা, এই চরম অপঘাতে মৃত্যুর হাত থেকে সুবীরই ওকে বাঁচিয়েছে। এখন সুবীর দীপালীকে আজীবন সন্ন্যাসিনী থাকতে বললেও, দীপালী তাতে রাজী।

সুবীর হতাশ হয়ে গাছের ডালে পা ঝুলিয়ে আবার বসে পড়লো।

দীপালী বললো, এই, আমাদের স্টীমার যদি সত্যিই চলে গিয়ে

থাকে—তা হলে আমাদের কি হবে?

দীপালীকে সাহস দেবার জন্য সুবীর বললো, কি আর হবে! এখানেই থেকে যাবো। তারপর এদিকে কোথায় একটা কুঁড়েঘর-টর বানিয়ে নেবো; শুকনো কাঠ, গাছের পাতা-টাতা আমি কুড়িয়ে এনে দেবো তোমার কাছে—আর তুমি রান্না করে আমায় খাওয়াবে! বেশ মজা হবে না? এই, তুমি আমায় ভালোবাসবে তো?

যা! তা হয় নাকি!

দীপালী বেশ বড়লোকের ঘরের মেয়ে। বাড়ীতে দু'খানা গাড়ি আছে। অভাব বা ভয়ের সঙ্গে সে পরিচিত নয়, ওগুলোর সম্মুখে কোনোদিন সম্মুখীন হয় নি। ভাগ্যবিড়ম্বনায় আজ তার বুক এই প্রথম কাঁপছে।

সুবীর যে বাড়ীতে থাকে, সেখান থেকে দীপালীদের বাড়ী খুব বেশী দূরে নয়। সুবীর থাকে মহাত্মা গান্ধী রোডে ইন্দিরা দেবীর কাছে। আর ওরাও থাকে একই রাস্তায়। ইন্দিরা দেবীর মেয়ে শুভ্রা দীপালীদের বাড়ীতে খেলতে যায়—ওখানে শুভ্রার সমবয়সী অনেকগুলো সাথী আছে। রাস্তা-ঘাটে অনেক গাড়ীঘোড়া—তাই সুবীরকে প্রায়ই যেতে হয় ওদের বাড়ী থেকে শুভ্রাকে আনতে। দীপালীর মায়ের সঙ্গে ইন্দিরা দেবীর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব, সেই জন্য উভয় পরিবারের মধ্যে যাওয়া-আসা আছে খুব। দীপালীও বহুবার এসেছে ইন্দিরা দেবীর বাড়ীতে। আর দীপালীর মা এত ভালো যে শুভ্রাকে আনতে সুবীর ওদের বাড়ীতে গেলে তিনি সুবীরকে কিছু না কিছু খাওয়াবেনই। শুধু সুবীরকে নয়, যারা বাড়ীতে আসে, তাদের সবাইকে কিছু না কিছু খাওয়াবেনই—শুকনো মুখে কাউকে ফেরান না।

দীপালী যে ক্লাসে পড়ে, সেই ক্লাসে তাপসীও পড়ে। কিন্তু কি একটা মেয়েলি কারণে ওদের দু'জনের মধ্যে বহুদিন যাবৎ

কথাবার্তা হয়নি।

সুবীর বললো, দুব—তোমার খালি ভয়! নেমে পড়ো তো শীগগির! সূর্য অস্ত যেতে এখনও তো দেরী আছে। বলেই সে তরতর করে গাছ বেয়ে নেমে পড়লো। বললো, কই, নামলে না? তোমাকে অক্ষত অবস্থায় তোমার ঘরে পৌঁছে দিলে আমার একটা বেশ বড়ো কিছু পুরস্কার মিলবে! এখানকার সংবাদ পেলেই তো তোমার মা অজ্ঞান হয়ে যাবেন। তারপর পাগল-টাগলও হয়ে যেতে পারেন! আর তুমি এখানে মজা করে গাছের ডালে বসে—বাঃ বেশ মেয়ে তুমি! নেমে পড়ো তো একবার লক্ষ্মীমেয়ের মতো।

সুবীর আসল জায়গায় আঘাত দিয়েছে। গাঁয়ের ছেলে হলেও সুবীর নির্বোধ নয়। সুবীবেব চেয়ে কিছু ছোট দীপালী; তার কিশোরী-মনে আঘাত হেনেছে ওর কথাগুলো। অ্যাঁ, সে তার মায়ের আঁচল-ধরা নাকি? মোটেই না! হঠাৎ কোথা থেকে সাহস এসে ভর করলো দীপালীর বুকে। বললো, কেন, আমি কি নামতে ভয় পাচ্ছি নাকি? এই তো নামছি—

দীপালী নামছে, তাকে নেমে আসতে সাহায্য করলো সুবীর।

সাহস দেখাবার জন্য নামলেও দীপালীর বুকের মধ্যে যে ভয় করছে না, তা নয়।

সুবীরের হাতটা চেপে ধরে হাঁটছে সে।

সুবীর বললো, ভাগ্যিস কুমীর তাড়া করেছিল—তাই সবার রুটিনটা চেঞ্জ হলো! তা না হলে কি চেঞ্জ হতো?

হাঁটতে হাঁটতে দীপালী বললো, এখন যদি আবার বাঘে তাড়া করে—

হাসতে হাসতে সুবীর উত্তর দিল, বাঘে তাড়া করলে আবার আমাদের রুটিনটা চেঞ্জ হবে।

তীরে পৌঁছে ওরা দেখলো সত্যি সত্যিই স্টীমার চলে গেছে।

আর অন্য কোথাও স্টীমার নেই—যাতে চেপে বাড়ী ফিরতে পারবে।

দীপালী ভয়ে ভয়ে বললো, এবার কি হবে!

সুবীর তো জানতোই একথা, স্টীমার ওদের অপেক্ষায় বসে থাকবে না। তবুও স্বচক্ষে একবার দেখে নিতে হয়—সেইজন্যই আসা।

দুপুরবেলায় ওরা অবশ্য আর একটা স্টীমার দেখেছিল, সেটা যদি পাওয়া যায়—সেই আশায় সুবীর বললো, চলো আমরা তীর ধরে এগিয়ে যাই। দুপুরে যে স্টীমারটা দেখেছিলাম, সেটা যদি পেয়ে যাই, তা হলে আমাদের আর বাড়ী ফিরতে কি কষ্ট! বরং রীতিমত এটা এ্যাড্‌ভেঞ্চার হয়ে দাঁড়াবে!

যেদিকে সেই স্টীমারটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল, সেইদিকে ওরা হাঁটতে লাগলো। কিন্তু কোথাও তার পাত্তা পাওয়া গেল না।

দীপালী বললো, এদিকে কোথাও কি গ্রাম নেই?

আছে তো! কিন্তু কোথায় এবং কতদূরে—তা তো কিছুই জানি না। সকালে খুঁজে বার করা যেতে পারে। সামনে রাত্রি আসছে, এখন আর কী করা যাবে! চলো বরং আমরা এই তীর ধরে সামনে হাঁটতে থাকি—এমনি করে সুদূর হিমালয়ে পৌঁছে যাবো!

দীপালী উৎসাহিত হয়ে উঠে বললো, হ্যাঁ হ্যাঁ, তবে তাই চলো!

—আহা-হা! পারবে? এক মাইল হাঁটার পর বলবে—বাঁ পা-টায় এত ব্যথা করছে আর বেশী জোরে চলতে পারছি না! আরও এক মাইল গেলে বলবে, উঃ, এবার আমার ডান পা-টা ছিঁড়ে যাচ্ছে! কি, বলবে না?

ওরা হাঁটছে। হঠাৎ দূরে একটা ছোট্ট কুঁড়েঘর দেখতে পেল সুবীর। কিন্তু দেখামাত্র সে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলো না। কোনো বিষয়ে সে উচ্ছ্বাস বা হতাশ প্রকাশ করতে শেখে নি। পথ চলতে চলতে হঠাৎ যদি পথিপার্শ্বে এক ঘড়া মোহর দেখতে পায়—সেটাও তার কাছে স্বাভাবিক যেন।

কুঁড়েঘর থেকে খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে সুবীর দীপালীকে বললো, দেখো, ঐ যে একটা কুঁড়েঘর দেখা যাচ্ছে। ওটা যদি এখন খালি পাওয়া যায়, তা হলে ওখানে আজকের রাতটা কাটানো যেতে পারে। কী বলো? তারপর কাল ভোরবেলায় আমরা আবার হাঁটাপথে গ্রামে গিয়ে পৌঁছাবো। সেখান থেকে একবার ডায়মণ্ড-হারবারে গিয়ে পৌঁছোতে পারলে আর ভয় নেই!

বলতে বলতে সে পিছনের পকেটে হাত ঢুকিয়ে কতকগুলো আধুলি বের করলো। গুণে বললো, সব সুদ্ধ আটটা আছে, মানে চার টাকা। এখান থেকে ডায়মণ্ডহারবার পর্যন্ত আমাদের দু'জনের পৌঁছানো গেলেই ব্যস! আর ভয় কী?

দীপালী বললো, তারপর কি হবে?

—তারপর আর কী! ঐ ডায়মণ্ড হারবার স্টেশনের কাছেই আমাদের গ্রামের দুর্গাবাবু বলে একজন লোক থাকে, তার ওখানে একটা বড়ো মিষ্টির দোকান আছে। ওর কাছ থেকে কয়েকটা টাকা ধার চেয়ে নেবো। আমাকে খুব চেনে,—দেবেই। দীপালী, এখন ঐ কুটীরটার দিকে চলো। দেখা যাক, ওখানে কি আছে; যদি থাকার সুযোগ হয়।

দীপালী বললো, আমি তো কিছু ভালো দেখতে পাচ্ছি না। কি করে হাঁটবো?

—ঠিক আছে, তুমি আমার হাতটা ধরো। বলে দীপালীর হাতটা সুবীর মুঠির মধ্যে নিয়ে সন্তর্পণে ঐ কুটীরের দিকে হাঁটতে লাগলো।

সত্যিই কিছু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। সূর্য অস্ত গেছে—তাই চারিদিকে এখন আবছা অন্ধকার। কুটীরটার কাছে এসে পৌঁছাল ওরা। ভিতরে লোক আছে কি না, মোটেই তা বোঝা যাচ্ছে না। কুটীরটাকে দু'বার পরিক্রমা করলো ওরা। ক্ষুদ্র জানালাপথে উঁকি মারল, কিন্তু কিছুই দেখা গেল না অন্ধকারের জন্য। তা না হলে আঁতকে উঠতো যে কেউ।

যাই হোক। দীপালীকে একধারে দাঁড় করিয়ে রেখে সুবীর বললো, দীপালী, তুমি এখানে একা একটুখানি দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে? আমি এই ঘরের মধ্যে ঢুকে এক্ষুণি দেখে আসছি। তোমার ভয় করবে না তো?

দীপালী সম্মতি জানাতে সুবীর এগিয়ে গেল কুটীরের দরজার দিকে। দুটো পাল্লা-ই খোলা—হাঁ হাঁ করছে। সাহস নিয়ে সুবীর ঢুকে পড়লো ভিতরে।

অন্ধকারে সে কিছুই ভালোমতো দেখতে পাচ্ছে না। তার গা-টা বেশ ছমছম করছে এখন। সুবীরের এবার মনে হলো—হঠাৎ যদি এখন এই কুটীরবাসী ফিয়ে আসে, আর এই অবস্থায় তাকে দেখে, তাহলে সুবীরকে নিশ্চয়ই চোর ভাববে! তারপর দিতে শুরু করবে উত্তম-মধ্যম। আর যদি তাকে চোর ভেবে তাড়া করে, তা হলে অবশ্য সে দৌড়ে পালাতে পারবে—হ্যাঁ, দৌড়ে সুবীরের সাথে কেউ-ই পারবে না,—কিন্তু দীপালীর কী হবে? দীপালী তো সুবীরের সঙ্গে ছুটতে পারবে না সমান তালে! তাছাড়া এই অচেনা জায়গায় এই অন্ধকারের মধ্যে কোথায় আর ছুটে পালানো যাবে! ওরা যদি দলে ভারী হয় তো এদেরকে সহজে বেকায়দায় ফেলে, তারপর মেরে খুন করে এখানকার গাঙ্গে ফেলে দেবে—কে আর দেখতে আসছে?

আরে, এই তো এখানে একটা মানুষ! ঘুমোচ্ছে বোধহয়। ওকে ডাকবে কি সুবীর?

—ওহে, শুনছো—সুবীর ডাকলো।

লোকটি নড়াচড়া কিছুই করলো না। যেমনি ছিল, তেমনিই রইল। এ কী বিচিত্রভাবে ঘুমান! আবছা অন্ধকারের মধ্যে তবু সুবীর বুঝতে পারল, লোকটি পুরুষ-মানুষ। চিত হয়ে খাটের ওপর পড়ে আছে। সমস্ত দেহটা অবশ্য খাটের ওপর নেই, নাভির কাছ থেকে মাথা পর্যন্ত এই অংশটাই শুধু খাটের ওপর, আর বাকী

অর্ধাংশ মাটির ওপরে। ওর একটা হাত বিছানায়, অপর হাতটি ঝুলছে। লোকটির গায়ে আধ-ময়লা ধুতি-পাঞ্জাবি।

আপাতদৃষ্টিতে দেখলে মনে হবে, হঠাৎ বুঝি কোন কারণে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে ঐ লোকটা।

সুবীর আবার জোরে ডাকলো, ওহে, শুনছো নাকি?

লোকটি তবুও অনড়। বেশ কয়েকবার ডাকার পর সে এবার বিছানার ধারে এলো। নীচু এবং অনেকদিনের জীর্ণ খাট। বিছানার সাদা চাদরের দিকে নজর পড়তেই সুবীর এতক্ষণে রীতিমত চমকে উঠলো। এ কী রক্ত! এই নির্জন প্রান্তরের মধ্যে একেবারে খুন!

সত্যিই বিছানার সাদা চাদরটা ভর্তি রক্তের লাল লাল ছাপ। বেশ কিছুক্ষণ আগেই এর ভবলীলা সাঙ্গ হয়েছে। বন্দুকের গুলি এসে বিঁধেছে এর কপালে।

অল্পক্ষণ পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকার পর সুবীরের বুক হঠাৎ এক অজানিত ভয়ে দারুণ কেঁপে উঠলো। এই অবস্থায় যদি তাকে দেখে ফেলে—নিশ্চয়ই ওকে খুনী ভাববে। তারপর বাকী জীবনটা জেলে পচে পচে মরতে হবে।

সুবীর এখন এই কুটীরের ত্রিসীমানার বাইরে চলে যেতে পারলে বাঁচে। তাড়াতাড়ি করে বেরিয়ে যেতে গিয়ে মেঝের ওপর পড়ে-থাকা শক্তমতো কি একটা জিনিস সুবীরের পায়ে ঠেকলো। তুলে দেখলো একটা বন্দুক। বুঝতে তার দেরি হলো না যে, হতভাগ্য লোকটি প্রাণ হারিয়েছে। একবার তার মনে হলো, বন্দুকটা নিয়ে যাবে?—তাদের আত্মরক্ষায় লাগবে।

মানে হতেই বন্দুকটা কাঁধের ওপর তুলে নিল সে। কিন্তু গুলি ছাড়া বন্দুক কি কাজেই বা লাগবে? বন্দুকটাকে ওরা কি লাঠির মতো ব্যবহার করবে আত্মরক্ষার কাজে? দূর—মূর্খ লোকেই তা করে! গুলি ছাড়া বন্দুক নিয়ে ঘুরে বেড়ানোই বৃথা।

কিন্তু গুলির ব্যাগটা পেতে বেশী দেরী হলো না। ঐ ঘরে অদূরে পড়ে ছিল। সুবীর গুলির ব্যাগ ও বন্দুক নিয়ে দ্রুত বাইরে এলো।

দীপালীকে যে-জায়গায় দাঁড় করিয়ে রেখে গিয়েছিল, ঠিক সেই জায়গায় সুবীর ওকে দেখতে পেল। দেখামাত্রই ওর হাতটা চেপে ধরে সুবীর বললো—দীপালী, আর এখানে একদম না! ভিতরে ভীষণ বিপদ—চলো, আমরা যত দূর পারি দূরে পালিয়ে যাই!

দীপালী এমনিতেই ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে ছিল। এরকম কাদা-মাটির দেশে এসে তাকে কখনোই বিব্রত হতে হয় নি। বড়লোকের কন্যা বলে আপন সাজ-সজ্জার দিকে তার নজর সর্বদাই তীক্ষ্ণ। এরকম ভাবে কোনো সন্ধ্যে তার আজ পর্যন্ত কাটে নি। সন্ধ্যালগ্নে দীপালী নতুন নতুন সাজ-পোশাকে রূপ-রঙের লহরী তোলে। সেই সাজ-সজ্জা এমনই জমকালো—যা চোখ না জুড়িয়ে পারে না। আজ সেই দীপালী একান্ত ভাগ্যবিড়ম্বনায় কুমীর-তাড়িত হয়ে দিশেহারার মতো ঘুরতে ঘুরতে কার কুটীর-আঙিনায় দণ্ডায়মান!

সুবীরের কথা শোনামাত্র দীপালী ওর হাত ধরে প্রায় ছুটতে শুরু করে দিল। সুবীর বললো, আস্তে দীপালী—আমাদের কেউ ছুটে পালাতে দেখলে আর রক্ষে থাকবে না!

না ছুটে যত তাড়াতাড়ি হাঁটা যায়, ওরা ওখান থেকে গঙ্গার কূলে পুনবায় ফিরে এলো। হাঁফ ছেড়ে দীপালী বললো, ভিতরে কি দেখলে?

একটুখানি চিন্তা করে নিয়ে সুবীর বললো, একজনকে কারা মেরে রেখে গেছে—আর প্রাণ ফিরে পাবে কি না সন্দেহ।

কেন যে মিথ্যে করে মৃতদেহের ওপর ক্ষীণ প্রাণারোপ করলো সুবীর, তা সে-ই জানে। হয়তো মৃতদেহের কথা সে আদৌ শোনাতে চায় না দীপালীকে।

ওরা নদীতীরে বসে পড়লো। চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। অদূরে বিশাল জলরাশি। অন্ধকারের জন্য এতক্ষণে ওটা নজরে পড়েনি দীপালীর; হঠাৎ সুবীরের কাঁধের দিকে নজর পড়তে আশ্চর্য হয়ে দীপালী বললো, এ কি! এই বন্দুকটা কোথা থেকে যোগাড় করলে! ঐ মাটির ঘর থেকে চুরি করে আনলে বুঝি?

—কতকটা তাই, সুবীর উত্তর করলো, আমাদের এখন আত্মরক্ষা করার বেশী প্রয়োজন, আর হাতের কাছে এটা পেয়ে গেলাম, তাই তুলে নিয়ে এলাম—তা না হলে বন্দুকের প্রতি আমার একটুও লোভ নেই।

—কিন্তু গুলি না থাকলে এ বন্দুক দিয়ে কি করবে?

সুবীর এবার হেসে উঠলো, বললো, আমাকে কি তুমি এতই বোকা ভেবেছো যে, গুলি ছাড়া বন্দুকটা তুলে নিয়ে আসবো? এই দেখো—বলে গুলির ব্যাগটা দীপালীকে দেখিয়ে দিল।

দীপালী বললো, আমার বড়ো তেষ্টা পেয়েছে! এখানে জল পাওয়া যাবে না?

এবার সুবীর বেশ চিন্তায় পড়লো—এই জন-নির্জন দেশে সে কোথা থেকে দীপালীর জন্য খাবার জল সংগ্রহ করবে? বললো, সামনে, এই তো এক গঙ্গা জল রয়েছে—এই যা,—এর চেয়ে ভালো জল বোধ হয় এখানে আর পাওয়া যাবে না!

দীপালী আর পারছিল না। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর সে বেশী জল পান করে নি। ভেবেছিল, স্টীমার ফিরলে একবারে পেট ভরে জল পান করে নেবে। কিন্তু তা আর সম্ভব হয় নি। তেষ্টায় ক্লিষ্ট হয়ে দীপালী এখন এই গঙ্গাতীরে শুয়ে পড়লো। সুবীর ওর মাথাটা কোলের ওপর তুলে নিয়ে বসে রইলো।

দীপালীর তৃষ্ণা সুবীরকে তার ক্ষুধার কথা স্মরণ করিয়ে দিল। জল-পিপাসা যে তার একদম লাগে নি, তা নয়। পরে যদি খুব তৃষ্ণা লাগে তো তা হলে না হয় সামনের এই খোলা গঙ্গাজল

একটুখানি খেয়ে নেবে সুবীর। কিন্তু দীপালীর কি হবে? ও তো এই ঘোলা-জল খেতে পারবে না! কোনোদিন এই ঘোলা-জল খাবার কথা সে কল্পনাই করতে পারে নি।

ওদের বাড়ীতেই তো রয়েছে দু' দুটো রেফ্রিজারেটর—যার ঠাণ্ডা জল ছাড়া দীপালী কক্ষনো পান-ই করে না গ্রীষ্মকালে! সুবীর ওদের বাড়ীতে ঐ রেফ্রিজারেটরের ঠাণ্ডা জল বহুবার পান করেছে। তৎক্ষণাৎ সুবীরের দাঁত বরফের মতো কনকন করে উঠেছে। কী সুন্দর সেই রেফ্রিজারেটর দুটি! সেই দীপালী এই ঘোলা গঙ্গাজল পান করবে? নেহাৎ আজকে এই নির্জন গঙ্গার কূলে স্টীমার পরিত্যক্ত হয়েই—

দীপালীর মতো মেয়েদের কাছে খাবার জল বলতে বোঝায় রেফ্রিজারেটরের ঠাণ্ডা জল। পাখা বলতে ইলেক্‌ট্রিক ফ্যান্—তাল-পাতার হাত-পাখা নয়। ট্রেনের কামরা বলতে ফার্স্ট ক্লাস, সিনেমার টিকিট বলতে দোতলার ওপর কোন আসন; আর গ্র্যাণ্ড হোটেলের মতো নামজাদা হোটেলগুলিই ওদের কাছে একমাত্র পরিচিত।

না, সুবীর ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা এখন একদম চিন্তা করবে না। তাতে ক্ষুধা-তৃষ্ণা বাড়বে। তাই অন্যদিকে মন দেবার জন্য সে বন্দুকের গুলিটা আর একবার ভালো করে পরীক্ষা করে নিল।

আকাশে অসংখ্য একচক্ষু তারা মিটমিট করছে। চোখ পিটপিট করে ওরা যেন কী বলতে চাইছে সুবীরকে। সেই দুর্বোধ্য ভাষা তার অজ্ঞাত। গঙ্গার ওপর চাঁদ উঠেছে। কী আশ্চর্য, কে এই চাঁদকে একটু একটু করে প্রতিদিন কামড়াতে কামড়াতে একদিন সম্পূর্ণ গ্রাস করে ফেলে—সেদিন আসে অমাবস্যার তিমির রজনী। আবার সেই গ্রাসিত অংশগুলো প্রতিদিন একটু একটু করে ফিরে পেতে পেতে চাঁদ তার পূর্ণাঙ্গ রূপ একদিন ফিরে পেয়ে পুনর্বার আলো-ঝলমলে হয়ে ওঠে। তখন আসে জ্যোৎস্না-স্নাত আলোকোজ্জ্বল পূর্ণিমা-রাত্তির। চন্দ্রের অমন রূপালী গোলাকার দেহকে সে কোন্

নিষ্ঠুর এমন করে গ্রাস করে চলেছে যুগ যুগ ধরে!

সন্ধ্যে-রাত তো কখন পেরিয়ে গেছে। এখন যে রাত ক'টা তা ঠাহর করতে পারলো না সুবীর। কেবল তার মনে হতে লাগলো, এখন রাত ছুটো। সবাই এখন গাঢ় ঘুমে মগ্ন —শুধু ওরা ছু'জনেই এই নির্জন গঙ্গার কূলে—

সুবীরের কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে দীপালী। সুবীর স্পষ্টই বুঝতে পারছে, ও ঘুমিয়ে পড়ে নি। এরকম পরিবেশের মধ্যে কেউ কি পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়তে পারে? সুবীর বললো, এই দীপালী, তোমার কি খুব তেষ্টা পেয়েছে?

উত্তর এলো, হুঁ!

—তাহলে এক কাজ করো না, এই গঙ্গাজলই একটু খেয়ে নাওনা? কী হয়েছে তাতে? আমি হলে তো তাই করতুম।

—ইস্, এই জল আবার মানুষে পান করে! রাজ্যের যত নর্দমার নোংরা জল এসে মিশছে।

—এঃ, তুমি এই জল ঘেন্না করছো? জানো, এই গঙ্গাজল ছাড়া পুজোই হয় না? মহামান্য দেবদেবীরা সব এই জলেই তৃষ্ণা মেটান। তা ছাড়া চরণামৃত খেয়েছো তো—সেটা কি থেকে তৈরী হয়?

—আচ্ছা, তুমি এ জল খেয়ে দেখেছো কখনো?

সুবীর কোন চিন্তা না করে একেবারে বলে দিল, হ্যাঁ, আমি তো খেয়েছি অনেক।

দীপালী এবার উঠে বললো, সত্যিই খেয়েছো তা হলে, কেমন লাগে? মেটে মেটে, না?

সুবীর গঙ্গাজল খেয়েছে ঠিকই। কিন্তু তৃষ্ণা মেটাবার জন্য কোনদিন পেট ভরে খায় নি। সে একটু অন্যমনস্কভাবে বললো, মরুভূমিতে আটকা পড়ে থাকলে বুকের ছাতি যখন তৃষ্ণায় ফেটে যায়, তখন সে সাগরের নোনা জলও পান করতে পারে।

দীপালী বললো, এই সুবীরদা, তবে এই জলই একটু এনে

দাও না। আজকে একটু প্রথম খেয়ে দেখি।

দিচ্ছি, বলে সুবীর বন্দুকটা মাটিতে রেখে নদীতে একলা নেমে এক আঁজলা জল নিয়ে উঠে এলো। কিন্তু দীপালী কোনোদিন এরকমভাবে জল পান করে নি, তাই এখন তার আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে সব গলে গিয়ে মাটিতে পড়ে গেল। এক বিন্দুও পান করতে পারলো না।

সুবীর বললো, ওরকম করে আর পারবে না। তার চেয়ে বরং তুমি নদীতে নেমে নিজের হাতেই তুলে নাও। ওতে সুবিধে হবে তোমার।

এমন সময় নৌকার দাঁড় টানার শব্দ শোনা গেল।

সেই শব্দ সুবীরের তীক্ষ্ণ কর্ণকে এড়িয়ে যেতে পারলো না। তৎক্ষণাৎ বন্দুকটা নিয়ে সে উঠে দাঁড়ালো এবং সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সজাগ রেখে কান খাড়া করে রইলো।

অল্পক্ষণের মধ্যে শব্দ আরো স্পষ্ট হয়ে উঠলো। এবার তার বুঝতে আর একটুও কষ্ট হলো না যে, কোনো একটা নৌকা তীরের দিকে আসছে।

সে তখন দীপালীকে বললো, দীপালী, তুমি এখন কিছু শুনতে পাচ্ছ নাকি?

উত্তর এলো, কই না তো!

—না, তুমি ও বুঝতে পারবে না। শীগ্‌গির এখানে একটা নৌকা এসে থামবে। তুমি চট্ করে উঠে পড়ো। বলেই ওর হাতটা ধরে সুবীর ওকে মাটির ওপর তুলে দাঁড় করিয়ে খানিকটা সরিয়ে নিয়ে এলো ওখান থেকে।

— কই নৌকা, কোথাও দেখতে পাচ্ছি না তো—দীপালী বললো।

—এই, চুপ! আস্তে, ঐ যে আসছে এদিকে। ওখানটায় নৌকাটা এসে থামবে বলে মনে হচ্ছে। চলো, আমরা আর একটু পিছিয়ে যাই।

দীপালী আজীবন কাল ধরে শহুরে মেয়ে। কোন্‌টা দাঁড় টানার শব্দ; কোন্‌টা সাপের খস খস শব্দ, বাঁশবনের ভিতর দিয়ে হাওয়া বইলে কি রকম শব্দ ওঠে—সেইসব জানবে কেমন করে? কাজেই এইসব ব্যাপার-স্যাপার দীপালীর কাছে একদিকে যেমন বড়ো অদ্ভুত, অন্যদিকে তেমনি ভয়ের। এদের যদি ঐ নৌকার লোকগুলো তীরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পায়?

আকাশের চাঁদ এত ক্ষীণ যে তার আলোয় সবকিছু স্পষ্ট করে দেখা যাচ্ছে না। তার ওপর বড়ো বড়ো মেঘের চাপড়া ভেসে এসে চাঁদকে বারে বারে ঢাকনা পরিয়ে দিচ্ছে। যাই হোক, অল্পক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল, একটা ছোট নৌকা এসে তীরে ভিড়েছে। ঠিক ঐ জায়গায়ই, ওরা আর কিছুক্ষণ আগে যেখানে বসে ছিল।

নৌকা দেখা মাত্রই দীপালী আরো ভয় পেয়ে সুবীরের একটা হাত ওর দু'হাতে চেপে রাখলো। বললো, না সুবীরদা, তুমি গুলি-টুলি একদম এখন ছুঁড়ো না! চলো, আমরা এই পার ধরে দূরে পালিয়ে যাই—

কিন্তু সুবীর দীপালীর কথা শুনে পালাতে উৎসাহিত হলো না। অন্ধকারে বরং নিজেকে আরো একটু বেশী আড়াল করে নিল এক বিশেষ উপায়ে। অন্ধকারের মধ্যে গুটিশুটি মেরে মাটির ওপর বসে পড়লো সুবীর দীপালীকে আড়াল করে। যদিও সুবীর গ্রাম্য ছেলে—কিন্তু অতি সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি আছে তার। তা না হলে অবলা ও ভীতু একটা কিশোরীকে নিয়ে সে ঝুঁকি নিতে যেতো না কক্ষনো।

দীপালীও সুবীরের ঠিক পেছনে বসে। নৌকা তীরে লাগতে দু'জন লোককে নামতে দেখা গেল। ওরা তারপর নৌকাটাকে একটা পাথরের সাথে বেঁধে রাখলো।

একজন অপর জনকে বললো, আজ খুব রাত হয়ে গেল রে! দিনে-দিনে আসতে চেয়েছিলাম - যাকগে, তোর সব টাকা আজকেই

ফেরৎ পাবি! এইখানটায় ওঠ—বলরামের ঘরের হারিকেন দেখা যেতে পারে। যাক, তোর পাওনা পাঁচশোটি টাকা আজকেই দিয়ে দেবো। কবেই দিয়ে দিতুম—ঐ শালা বলরামের জন্যে—

অপরজন বললো, চল, চল, আর দেরী করিস না, কতটা দূর? অনেক দূর নাকি রে?

—না রে, এই খুব কাছেই। দিনের বেলা ওর কুঠরিটা এখান থেকে দেখাও যায়। আচ্ছা, ঐ বলরামটা কি শয়তানি করছে কতদিন ধরে, বল তো!

অপরজন বললো, আজ যদি তোর সব টাকা ওর কাছ থেকে ফিরে পাস ভালই তো। নে, এখন চল—

বলেই সে বন্ধুর একটা হাত ধরে টান দিল।

কিন্তু অপর বন্ধু দু-পা যেতে না যেতেই বলে উঠলো—ঐ যাঃ! মালগুলো যে আনা হল না। যা তো, তুই নিয়ে আয়। এই বলার পর ওরা আবার নৌকার কাছে ফিরে এলো।

যাকে মাল আনতে আদেশ করা হলো, সে নৌকায় উঠে এক থলে কি সব খাবার আর দু'বোতল মদ নিয়ে নেমে এলো।

অন্যজন তা দেখামাত্রই তীব্র প্রতিবাদ করে উঠলো, না, না, না,—এত খাবার নিয়ে যাব না! ও যা পেটুক—আর কিছু বাকী রাখবে না। আর এই দু'বোতল মদ—ওরে বাবাঃ- বলরাম একাই সাবড়ে দেবে—এক ফোঁটাও রেখে দেবে না। যা, ওগুলো রেখে দিয়ে আয়, আর মদ থাক—। খাবারগুলো ফেরার পথে আমাদেরই কাজে লাগবে।,

লোকটা আদেশ পালন করলো।

তারপর এই লোকটা আবার বললো, আয়, এই বোতলটা আমরা দু'জনে মিলে ফাঁক করি, আর অন্যটা বলরাম শালার জন্য থাক। বলেই সে খানিকটা মদ বোতল থেকে গলায় ঢেলে নিল।

সুধীর আর দীপালী বসে আছে, সেখান থেকে এরা মাত্র হাত

পঁচিশেক দূরে। সুবীর বুঝতে পারলো, মদ্যপান না হওয়া পর্যন্ত এরা নড়বে না।

বোতলটা বন্ধুর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে সেই লোকটা বললো, নে, তুই এবার একটু কণ্ঠ ভিজিয়ে নে। বলরামটা রোগা-পটকা হলে কি হবে, মাল টানার বেলায় ঠিক ওস্তাদ। এর আগে যতবার মাল এনেছি, ঐ বলরাম একাই সব সাবড়ে দিয়েছে—আমার জন্য এক ফোঁটাও না।

অন্যজন বললো, আচ্ছা, তুই যে নৌকায় বললি, কোথায় কলাগাছ আছে—কই সে গাছ ?

এর প্রত্যুত্তরে অপর লোকটা বললো, হ্যাঁ, রে বলরাম ওর ঘরের চারিদিকে লাগিয়েছে। হ্যাঁ, আর ও যদি আমাদের কলা না খাওয়ায়, নৌকায় ফেরবার সময় আমরা একটা কাঁধি—। বলে সে তার হাতের পাতা দিয়ে এমন একটা ইঙ্গিত দেখালো—যা অপহরণের ইঙ্গিত বুঝায়। তারপর বললো, বুঝলি তো ?

এরপর একটুক্ষণ নীরবতা।

কলার কাঁধি অপহরণে ইচ্ছুক ব্যক্তিটি আবার বললো, বলরামটার লম্বা চুল থাকলে কি হবে, মাথায় বুদ্ধি আছে। গত পরশুদিন তো আমি এখানে এসেছিলাম। ও বললে, কোথায় একটা জমি বিক্রি করেছে, হাতে ওর টাকা এসে গেছে। আজকে যদি আমি আসতে পারি তো তা হলে আমার পাঁচশো টাকা ও থোক ফেলে দেবে। তা না হলে ওর সাথে সেদিন মারামারি লেগেই যাচ্ছিল।

সুবীর অন্ধকারের মধ্যে বসে এদের কথাবার্তা কান খাড়া করে শুনছে, আর তীক্ষ্ণ নজরে রেখেছে।

এবার সুবীর একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে মনে মনে বললো, আর কোনোদিনই এই ব্যক্তিটি তার পাওনা পাঁচশো টাকা বলরামের কাছ থেকে আদায় করতে পারবে না। এ জন্মে ঐ টাকা আর কক্ষনো ফেরত পাবে না। সমস্ত ব্যাপারটা সুবীরের বোধগম্য

হয়েছে। গুলিবিদ্ধ মৃতদেহটা সে দেখেছে, সেটা আর কেউ নয়, সে-ই বলরাম! তার মাথায় লম্বা চুল আছে, ঘরের চারিদিক কলাগাছে ঘেরা। আর এই গঙ্গাতীর থেকে ঐ কুটীরটা ছাড়া আর কোনো কুটীর কাছাকাছি কোথাও চোখে পড়ে না।

আর বলরামের খুন হবার কারণও পরিষ্কার। টাকার লোভেই আততায়ী ওকে খুন করে অদৃশ্য হয়ে গেছে। হয়তো বলরামের ঘরে অনেক টাকা ছিল—

—দে, দে, তুই যে একাই সাবড়ে দিলি সব, বাকীটা আমায় দে,। বলেই কলার কাঁদি অপহরণে ইচ্ছুক ব্যক্তিটি বন্ধুর হাত থেকে মদের বোতলটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে বাকী তরল পদার্থটা গলার মধ্যে ঢকঢক করে ঢেলে দিল। তারপর শূন্য বোতলটা নদীর জলে ছুঁড়ে মারলো।

অতঃপর লোক দুটো টলতে টলতে তীর ছেড়ে উঠে এলো। একজন অন্যকে বললো, এই, আমার হাতটা একটু ধর রে ; অন্যজন বললো, আমারও কাঁধটা একটু ধর তুই। এইভাবে হেলতে-দুলতে চলতে লাগলো দুই মাতালে।

সুবীর অমনি উঠে দাঁড়ালো। ক্ষীণ জ্যোৎস্নালোকে ওদের দিকে চেয়ে রইল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে।

অন্ধকারের মধ্যে দুই মাতাল অদৃশ্য হয়ে যাবার পরও অল্পক্ষণ অপেক্ষা করলো সুবীর। যদি ঐ মাতাল দুটো আবার ফিরে আসে।—অল্পক্ষণ দেখার পর সুনিশ্চিত হয়ে সুবীর শশব্যস্তে দীপালীকে মাটির ওপর তুলে দাঁড় করিয়ে বললো, চলো দীপালী, এই সুযোগে আমরা পালাই—আর একদম নয় এখানে।

ভয়েই দীপালী চলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। সুবীর প্রায় টানতে টানতে তাকে নৌকার কাছে নিয়ে এলো। তারপর তাকে নৌকায় তুলে মাঝখানে বসিয়ে দিয়েই সে ক্ষিপ্রহস্তে নৌকার বাঁধনটা খুলে ফেলে চড়ে বসলো।

অল্প জলে নৌকা ঠেলবার জন্য একটা নাতিদীর্ঘ বাঁশ ঐ নৌকার ওপরে রাখা ছিল। যাতে কোনপ্রকার শব্দ না ওঠে, তাই ওটা দিয়ে জোরে ঠেলে সে নৌকাটাকে তীর ছেড়ে গভীর জলের দিকে নিয়ে যেতে চেষ্টা করলো।

জলের তলদেশে মৃত্তিকাতে বাঁশ লাগিয়ে ঠেলতে গিয়ে একসময় তার কাঁধ থেকে বন্দুকটা পড়ে গেল জলে। সেটা পড়ে যেতে সে মনে মনে কোন দুঃখ প্রকাশ করলো না। কুঠার-হারা কাঠুরিয়ার মত সে কাঁদতেও বসলো না। গুলির ব্যাগটা এখনও তার কাছে। —সেটা আর কি হবে—জঞ্জাল! ঘোড়ার মৃত্যুর পর চাবুকটা যেমন প্রভুর কাছে অনাবশ্যক, আজ গুলির ব্যাগটা সুবীর তেমনি অনাবশ্যকতা জ্ঞান করলো।

দাঁড না টানলে আর নৌকা চলবে না। এখানে জল খুব গভীর—বাঁশের তলদেশ আর লাগছে না। যতটা শব্দ না করলে দাঁড় টানা সম্ভব নয়, সেইরকম প্রায় নিঃশব্দে সে নৌকাখানি চালাতে লাগলো।

এরকমভাবে কিছুদূর পর্যন্ত এসে সুবীর তারপর খুব জোরে দাঁড় টানতে লাগলো। এখন ওরা নিরাপদ স্থানে চলে এসেছে।

লোক দুটোর অবস্থা ভেবে সুবীর দুঃখ বোধ করলো। যখন ওরা বলরামকে গুলিবিদ্ধ মৃত অবস্থায় দেখবে, তখন তো ভয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়োতে দৌড়োতে সোজা ওদের নৌকার কাছে এসে পৌঁছোবে—কিন্তু এসে দেখবে–। নৌকা চুরি করা ছাড়া আর কি-ই বা উপায় ছিল সুবীরের?

দীপালী এই প্রথম কথা বললো, সুবীরদা, তোমার মাথায় এত বুদ্ধি ছিল? আমি তো ভেবেছিলাম, তুমি বুঝি ওদেরকে গুলি করে মেরে দিলে! যাক, কোনোরকম খুন-খারাপি না করে যে এরকম সহজ উপায়ে নৌকাটাকে হাতিয়ে নিতে পারলে—

সুবীর বলে উঠলো, না, ওদেরকে আমি মোটেই গুলি করতে

চাই নি। রক্তারক্তি আমিও পছন্দ করি না। এখন তো ঐ দুটো লোক বেশ ফ্যাসাদে পড়েছে—

আর একটু হলেই বলে ফেলেছিল বলরামের মৃত্যুর কথা। আবার বললো, আর সেই বন্দুকটাও নদীর জলে পড়ে গেছে দাঁড় টানতে। শুধু গুলির ব্যাগটাই এখন আছে।

দীপালী বললো, ওটা আর কি করবে ?

তাই তো! ওটা আর কি হবে—বলে সুবীর ঐ ব্যাগটাকে গঙ্গার জলে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

দীপালী নৌকার মাঝখানে বসে, আর সুবীর দাঁড় টেনে চলেছে। নৌকাটা একেবারে শূন্য নয়, কিছু জিনিসপত্র রয়েছে। সুবীর তা লক্ষ্য করেছে। কি যেন একটা চকচকে বস্তু দেখতে পেয়ে সে দীপালীকে বললো; তোমার পিছনদিকে কি একটা যেন রয়েছে, দাও তো ওটা আমার দিকে হাত বাড়িয়ে।

দীপালী দিল। এ্যালুমিনিয়ামের একটি জলের বোতল। সুবীর ওটার ঢাকনাটা খুলে ভিতরে জল দেখতে পেয়ে হুররে করে উঠলো। বললো, এই তো পেয়েছি খাবার জল! তুমি যে জল খেতে চাইছিলে, এবার খাও না, এই তো রয়েছে এক বোতল।

দীপালী সন্দেহ প্রকাশ করলো, এটা কি সত্যিই খাবার জল ?

—নিশ্চয়ই। তা না হলে এই বোতলে যত্ন করে ধরে রাখতো কেউ ? আচ্ছা, আমিই প্রথমে একটু খেয়ে দেখছি—বলে সে নিজে একটুখানি খেয়ে বললো—চোখ বুজে পান করতে পারো।

খাবো না খাবো না - করেও দীপালী খেয়ে নিল খানিকটা। তৃষ্ণার্ত হৃদয়টা এতক্ষণ পরে এবার একটু জুড়ালো।

আকাশ-পানে চেয়ে রইলো দীপালী। নক্ষত্র-খচিত ঊর্ধ্বলোক। নৌকাটা একটু দুলতে দুলতে চলেছে বলে দীপালীর অঙ্গও মৃদু মৃদু দুলছে। ইস, ওরা যদি কোনো প্রকারে এই নৌকাটাকে না পেতো, তা হলে এখনও ঐ নির্জন গঙ্গার কূলে পড়ে থাকতে হতো

আকাশ পানে চেয়ে! আর যদি কেনো বিষাক্ত সাপ এসে সুবীরদাকে কামড়ে দিতো? তা হলে কী সর্বনাশ! দীপালী কত অসহায়া—সুবীরদার জন্য সে একা কি করতে পারতো? মৃত-স্বামী-কোলে বেহুলার মতো সে সারারাত সুবীরদাকে নিয়ে সেই নির্জনে—

—দীপালী।

সুবীরের ডাকে দীপালী ভীষণভাবে চমকে উঠলো। তার মনে হলো, গঙ্গায় ডুবে যারা মরে, তাদের প্রেতাত্মা বুঝি ওকে ডাকছে। গঙ্গার ওপরে চতুর্দিকে এই দারুণ নিস্তব্ধতার মাঝে মানুষের ডাক শুনলে কতকটা এরকমই মনে হয়।

দ্বিতীয় বার ডাকতে দীপালী সাড়া দিল। সুবীর বললো, তুমি নৌকার ওপরে শুয়ে পড়তে পারো তো, বসে আছ কেন?

সে আর শুতে রাজী হলো না। আকাশের পানে চাইলো, অগনিত একচক্ষু নক্ষত্রদের সহিত দীপালীর চোখাচোখি হয়ে গেল। আকাশের এই তারাগুলো কী মহা-রহস্য! এরা খসেও পড়ে না, সরেও যায় না, বা জ্বলতে জ্বলতে একদিন নিবেও যায় না। দীপালীর হঠাৎ মনে হলো, এরা যেন রিফিউজী। রিফিউজীর মতোই তো এরা সেই কোন্ মহাকাল থেকে সারা মহাশূন্যে গ্যাঁট হয়ে বসে আছে—আর নড়াচড়ার নাম নেই।

অমনি একটা তারা-খসা দেখতে পেল দীপালী। একটা জ্বলন্ত অগ্নি তারা থেকে হঠাৎ খসে পৃথিবীর দিকে নেমে আসতে আসতে আবার মিলিয়ে গেল।

দীপালীর যেন মনে হলো, তারাগুলোকে সে রিফিউজী ভেবেছে বলেই ওরা অমনি একটা আগ্নেয় দৃশ্য দেখলো। একচক্ষু ক্ষুদে নক্ষত্ররা যেন মিলিতভাবে দীপালীকে বলতে চাইছে—অ্যাঁ! আমাদেরকে রিফিউজী ভাবা। সেই কোন মহাকাল থেকে এই মহাকাশে রয়েছি— তা জানো? আমাদের এই চক্ষু অসংখ্য কোটি

বছরের পুরোনো ; তা দিয়ে আমরা সৃষ্টির রহস্য দেখে আসছি সেই আদি কাল থেকে।

এমন সময় একটা প্লেন দীপালীর চিন্তাজাল ছিঁড়ে দিয়ে গঙ্গার ওপর দিয়ে উড়ে গেল দানবের মতো গর্জন করতে করতে।

আবার কোটি কোটি নক্ষত্র দীপালীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো। এই তো সেদিন চাঁদের জন্ম দেখলুম। তোমাদের স্কুল-কলেজে ভারী তো দু'দিনের দু'পাতা ইতিহাস পড়ানো হয়—তাই আবার কত গর্ব। আমরা এই - এই চোখে কি দেখিনি? কতটুকু জানো তোমরা সৃষ্টি-রহস্য? কাজেই সাবধান, আমাদের আর কক্ষনো রিফিউজী ভেবো না। বুকে হাত দিয়ে ভাল করে ভেবে দেখো—রিফিউজী তোমরাই। একটা পরের ফাঁকা গৃহ পেয়ে, সেখানে বেঁচে থাকার সবকিছু পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকায় হাজার হাজার বছর ধরে তোমরা তো সেখানে মাটি কামড়ে পড়ে আছো রিফিউজীদের মতো। পার্থিব কোটি কোটি জীবগুলো জন্মাচ্ছে, মরছে, আবার জন্মাচ্ছে, আবার মরছে—চাকার মতো ওরা গড়িয়ে চলেছে—ওদের আর শেষ নেই।

আরও সাবধান করে দিচ্ছি। তোমাদের পৃথিবী মহাকাশ-চারিদের পা বড্ড খুস্‌খুস্‌ করছে—কিন্তু বেশী ভাল হবে না এর ফল। আমাদের মহাকাশে ওরা বড্ড উৎপাত করছে—হ্যাঁ, তোমাদের হোমড়া-চোমড়াদের বলে দিয়ো একটু, ওদের যদি পৈতৃক প্রাণের মায়া থাকে, তাহলে আমাদের সীমানায় উৎপাত যেন না করে। কেন বাবা বেশতো আছো, খাচ্ছ-দাচ্ছ ঘুমাচ্ছ, সিনেমায় লাইন দিচ্ছো, স্ফূর্তি করতে পিকনিক করছো - এত কিছু থাকতে তবু কেন আমাদের এলাকায় ঢুঁ মারতে আসছো? পৈতৃক প্রাণটাকে বে-ঘোরে হারাবে? মহাকাশে চাঁদ পর্যন্ত আসতে শুধু তোমাদের অধিকার দিলুম। কেন না চাঁদটা তোমাদেরই কিনা। পৃথিবীর

দেহ থেকে একদিন চাঁদের জন্ম হয়েছিল তাই। এর বাইরে এলে—। কাজেই খবরদার, আমাদের আর কক্ষণো রিফিউজী বোলো না। ভেবে ছাখো আমরা যদি সবাই মিলে তোমাদের ঐ ক্ষুদে পৃথিবীর ওপর আছড়ে পড়ি—তা হলে তোমাদের অবস্থাটা কি রকম হয়? ইঁদুরের ঘাড়ের ওপর বাড়ীর পাকা ছাদটা ভেঙে পড়লে তবুও তার দেহটা খুঁজে পাওয়া যায়। আমাদের এলাকায় পাপী জীবের আগমন আমরা মোটেই সহ্য করবো না এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পডবো যে, মুহূর্তেই পৃথিবীসুদ্ধ তোমরা গুঁড়িয়ে ছাতু হয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে।

দীপালী!

সুবীরের ডাকে দীপালীর চমক ভাঙলো।

সুবীর বললো, কিসের একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছ? মনে হচ্ছে স্টীমারের শব্দ।

দীপালী বললো, সুবীরদা, তুমি কি এভাবে দাঁড় টেনে টেনে নৌকাকে সেই হাওড়া পর্যন্ত নিয়ে যাবে?

সুবীর উত্তর দিল, দেখি, শেষ পর্যন্ত কি হয়। স্রোতের অনুকূলে হলে তো কোন ভয়ই ছিল না। এখান থেকে অনেক পথ। যা হোক, রাত্তিরটার মতো তো আমাদের কিছু নিরাপদ হলো।

সুবীরদের নিজেদেরই নৌকা রয়েছে। সেইজন্য সে অল্প বয়স থেকে দাঁড় টানতে শিখে গেছে। সে অনেকবার নদীপথে দূরে পাড়ি দিয়েছে। কিন্তু অনেকদিন দাঁড় না টানায় এখন তার হাত দুটো ধরে এসেছে।

দীপালী জিজ্ঞেস করলো, সুবীরদা, তোমার হাত ব্যথা করছে না?

সুবীর মিথ্যে করে বললো, না। আমার তো দাঁড় টানার অভ্যেস আছে। আগে কত টেনেছি।

দীপালী এবার উঠে এসে তার পাশে বসলো, বললো, সত্যি

করে এবার বলো তো, তোমার হাত ব্যথা করছে কি না ?

দীপালীর কণ্ঠে এমন কিছু ছিল, যা সুবীর এড়িয়ে যেতে চাইলেও পারলো না। হেসে ফেলে বললো, একটু করছে বটে, কিন্তু তবুও এখনো টানতে পারব।

না, তুমি এখন টানবেনা আর। তীরে নৌকাটা ভিড়িয়ে এখন বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নাও, তারপর আবার বাইবে। কই, তীরে নৌকাটা লাগাও!

সুবীর বুঝলো, একমাত্র দীপালী এরকম কথা বলতে পারে। কোন মেয়ে হলে বলতো—জোরসে চালাও।

সে বলল, না গো, তা হয় না। পাড় কোথায় কত উঁচু, তীরে কতখানি জল—তা তো কিছুই জানি না। আর নৌকা বাঁধবো কিসের সাথে ? না বাঁধলে যে নৌকা স্রোতে ভেসে যাবে। তা ছাড়া এই অচেনা-অজানা জায়গা। এই মরেছে। স্টীমারটা যে আমাদের দিকেই আসছে।

সত্যিই একটা স্টীমার তরতর করে এগিয়ে আসছে জল কাটতে কাটতে। সুবীর বললো, সর্বনাশ।—এখন আমাদের নৌকার কি হবে ? এই সময় যদি একটা হারিকেন থাকত—

নৌকার ওপর একটা বাঁশের সঙ্গে একটি হারিকেন টাঙানো ছিল। সেটা দেখতে পেতে সুবীরের কোন কষ্ট হল না; কিন্তু সেটা নিভানো। সে বলল, দেশলাই না হলে এটাকে জ্বালি কেমন করে ?

দীপালী দেশলাইয়ের জন্য এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। কিন্তু অন্ধকার নৌকায় কোথায় খুঁজে পাবে ?

সুবীর হতাশভাবে বললো, দেশলাই এখন পাবে কোথায় ? সেটা যে ঐ লোকছুটোর পকেটে। আর এখন উপায় নেই—ঐ স্টীমার এসে গেল। যদি আমাদের নৌকার সাথে ওটার ধাক্কা লাগে, তুমি সাঁতার কাটতে পারবে তো ? প্রথমে কিন্তু নীচের দিকে

নেমে যাবে অন্ততঃ বিশ হাত পর্যন্ত, তারপর পঁচিশ তিরিশ সেকেণ্ড বাদে ওপরে ভেসে উঠবে। নইলে স্টীমারের চাকায় মাথা গুঁড়ো হয়ে যাবে। আর, ওপরে ভেসে উঠে আমার ডাক শুনতে পেলেই আমার দিকে তুমি সাঁতরে চলে আসবে।

দীপালী এবার সুবীরের কাঁধ ধরে কাকুতি-মিনতি করতে লাগল, না সুবীরদা, তুমি এক্ষুনি নৌকা তীরে ভেড়াও। আমার ভয় করছে খুব।

পাড় তো এখান থেকে বেশ কিছুটা দূরে। ওখানে যাবার সময় কি পাবো? আর পাড়ের দিকে যাবো যে, স্টীমারটাও যদি বেঁকে যায়—? তার চেয়ে যা কপালে আছে, তাই হবে। বরং নৌকা মাঝগঙ্গার দিকে নিয়ে যাই। বলে সেইদিকে দাঁড় টানতে লাগলো।

তবুও দীপালী কাকুতি-মিনতি করছে। সুবীর বললো, খালাসীরা বড্ড বদমাস। এক একসময় ওরা আলতো করে নৌকা ছুঁয়ে যায়, কখনো পরা নৌকার সম্মুখে হঠাৎ থেমে পড়ে হ্যা হ্যা করে হেসে ওঠে। বলতে বলতে স্টীমারটা এসে পড়লো, অদূর দিয়ে চলে যাবার পর তীব্র জলের ধাক্কায় নেচে উঠল ওদের নৌকাটা।

দীপালী বললো, ওরা ওরকম করে কেন?

কি রকম?

ওই যে বললে, খালাসীরা ইচ্ছে করে নৌকায় ধাক্কা লাগায়, হ্যা হ্যা করে হাসে।

বাঃ, ওরকম একটু না করলে ওদের চলবে কেমন করে? সারাজীবন ধরে ওরা শুধু নদী-সাগরের জল দেখছে, দীপালী, একটা কাজ করলে হয় না? চলো আমরা এই স্টীমারটা গিয়ে ধরি। ওটাতে চেপে যাবো। ওটা যতদূর যাবে—হাওড়া, বজবজ কিংবা ডায়মণ্ড হারবার পর্যন্ত—আমরাও ততদূর যাবো। এরকম করে কতদিনে যে আমরা বাড়ী-পৌঁছাব, তা ছাড়া খাবার-টাবারই বা

কোথায়? তার চেয়ে চল বরং আমরা স্টীমারের পিছনে চুপি চুপি উঠে পড়ি; কাল সকালে আবার নেমে পড়া যাবে। বলতে বলতে সে নৌকা নিয়ে স্টীমার ধরবার জন্য এগিয়ে গেল।

দীপালী বললো, স্টীমারে যদি লোকজন না থাকে, খালাসীরা যদি আমাদের বিনা টিকিটে চড়তে না দেয়, তা হলে আমরা কি করব?

সেজন্য কোন ভয় নেই—আমি তো আছি।

দীপালী ভাবলো, তা মন্দ হয় না। একবার যদি কোনরকমে ওঠা যায় স্টীমারটায়। তাহলে অন্ততঃ নির্বিঘ্নে ও দ্রুত বাড়ী ফেরা যাবে। ঐ অন্ধকারের মধ্যে সুবীরদা বিনা রক্তপাতে কেমন বেমালুম এই নৌকাটাকে আস্ত হাতিয়ে ফেললো। এবার যদি স্টীমারে করে দ্রুত বাড়ী ফেরা যায়—ভালোই তো। আর যদি কেউ ভাড়া দেবার জন্য ওদেরকে জোর করে, তাতে ভয় কি? দীপালীর কাছে টাকাকড়ি না থাকলেও দু-চারটে সোনার জিনিস তো রয়েছে—

স্টীমার ধরতে বেশী সময় গেল না। সুবীর নৌকার দড়ি নিয়ে লাফিয়ে ওটাতে উঠে পড়ে নৌকাটা বেঁধে ফেললো। তারপর আবার নৌকায় নেমে দীপালীকে বললো, তোমার মাথাটা বাদে সারা গায়ে এই গঙ্গার জলে ভালো করে ভিজিয়ে নাও শীগগির।

বলেই সে তৎক্ষণাৎ নিজের আপাদকণ্ঠ নদীর জলে ভিজিয়ে। নিল। ওর দেখাদেখি দীপালীও আদেশ পালন করলো।

এবারে দু'জনে উঠে পড়লো স্টীমারে।

স্টীমারের সরু ধার দিয়ে ওরা দু'জনে হাঁটছে। ওদের পোশাক গঙ্গার জলে দারুন সপসপে। সুবীরের ফুলপ্যাণ্টটা ওদের স্টীমারেই রয়ে গেছে; এখন ও শুধু একটা আঁট হাফপ্যাণ্ট পরে, গায়ে একটা গেঞ্জি।

স্টীমারের একটা কুঠরী থেকে আলো এসে বাইরে পড়ায় সেই জানালা দিয়ে সুবীর আর দীপালী উঁকি মারলো। ভিতরে মেঝের ওপর একজন লম্বা লোক শুয়ে, আর একজন দাঁড়িয়ে।

বুকের ওপর বসে-থাকা লোকটাকে দাঁতে দাঁত চেপে হিংস্র-ভাবে বললো, শালা বড্ড সাধু হয়ে গেছিস, না? তোর বাপ-ঠাকুরদা যেন একেবারে সাধু-মহাপুরুষ ছিল। কেন বলতে গেলি? আমরা মাল চালান দিচ্ছিলুম তো তোর কি। তোর জন্যেই তো আমাদের জেল হয়ে গেল। আর একটু হলে চাকরিটা যাচ্ছিল, জানিস?

দাঁড়িয়ে-থাকা লোকটা বললো, দেনা শালার পেটে ঢুকিয়ে; সব আপদ চুকে যাক।

লোকটা দৃঢ়কণ্ঠে বললো, না। একখণ্ড দড়ি নিয়ে আয়—যা। এর হাত-পা ভালো করে বেঁধে ফ্যাল।

দড়ি আনতে কোথাও যেতে হলো না। লোকটার পকেটেই দড়ি ছিল। মুহূর্তের মধ্যে ওকে সে বেঁধে ফেললো।

বুকের ওপর থেকে উঠে দাঁড়িয়ে এবার লোকটা বললো, এখন এই নদীর জলে তোকে ছুঁড়ে ফেলে দিই? কোন্ শালা পুলিস এসে তোকে বাঁচায়।

শুয়ে-থাকা লোকটা এবার ভয়ে কেঁদে উঠলো, বললো, আমি নতুন লোক—কিছু জানতাম না, তাই বলে ফেলেছি। আমাকে মেরো না তোমরা, তোমাদের পায়ে পড়ছি—আমাকে ছেড়ে দাও। আর কক্ষনো বলবো না, মা কালীর দিব্যি—

চুপ্ শালা। তোকে কিছু শাস্তি পেতেই হবে। বলে সে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

সুবীর আর এক মুহূর্ত দেরী করলো না, দীপালীকে টেনে নিয়ে চট্ করে অন্ধকারের দিকে এগিয়ে গেল। এইসব ব্যাপার-স্যাপার দেখে দীপালী ভয়ে জড়ষ্ট।

কে একজন আলো নিয়ে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে আসতে গিয়ে হঠাৎ ওদের সামনে পড়ে গেল। সে অমনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে জিজ্ঞেস করলো, কে? কে এই অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে?

বলতে বলতে সে আলোটা উঁচু করে তুলে ধরলো। সেই আলোয় সুবীর ঐ লোকটার মুখ দেখতে পেয়ে খানিকটা নিশ্চিন্ত হ'লো। যাক এ অন্ততঃ সেই ভয়ঙ্কর লোকটি নয়—কুঠরীর মধ্যে যে একটু আগে আর একটি লোককে নদীর জলে ডুবিয়ে মারতে চেয়েছিল।

দৃঢ়কণ্ঠে লোকটা আবার বললো, কে তোমরা ?

সুবীর বললো, আমাদের নৌকা এই স্টীমারের সঙ্গে ধাক্কা লেগে উল্টে গেছে, আমরা সাঁতরে কোনো রকমে এটাতে উঠেছি—

লোকটা আলোয় সুবীর আর দীপালীর মুখ আরও একবার ভালো করে দেখে বললো, শুধু তোমরা তুইজন ? আর কেউ আছে নাকি ?

সুবীর বললো, হ্যাঁ, এ আমার বোন। আর অন্যদের সন্ধান আমরা এখনো কিছু জানি না।

ঠিক আছে, তোমরা এদিকে এসো। বলে সে লোকটা ওদেরকে অন্ধকার থেকে এক আলোময় স্থানে নিয়ে এলো।

এখানকার আলোয় পরস্পর পরস্পরকে দেখতে পেল ভালো-ভাবে। এরা তু'জনে যে নদীতে পড়ে গেছে সে বিষয়ে তার কোনো সন্দেহ রইলো না। আরো জন তিনেক খালাসী এসে এখানে ভিড় করলো। কোনো মজাদার ব্যাপার ভেবে ওরা বললো, ওহে নকুলবাবু, ব্যাপার কি এখানে ?

নকুল-ই অন্ধকারের মধ্যে এদেরকে প্রথম দেখেছে। কিন্তু তার বোধ হয় ইচ্ছে ছিল এদেরকে আলোতে এনে দেখবার এবং কাউকে কিছু না জানিয়ে এদের চুপি চুপি আশ্রয় দেবার। কিন্তু তা হলো না। খালাসীরা সুবীরকে নম্রভাবে জিজ্ঞেস করলো, কি হয়েছে ভাই ?

সে বলল, আমরা কয়জন মিলে নৌকা করে ফিরছিলাম। আমাদের নৌকায় হারিকেন ছিল বটে, কিন্তু তেল একদম ছিল

না বলে ওটা নিভানো ছিল। মাঝিরা খানিকটা নেশা করেছিল; শেষে এই ষ্টীমারটা হঠাৎ দেখে ওরা নৌকা এদিক-ওদিক করতে গিয়ে দিল ভিড়িয়ে। নৌকা উল্টোবার আগেই প্রস্তুত ছিলাম আমি। তারপর দীপালীর দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বললো, এ আমার ছোট বোন—একেই শুধু নদী থেকে বাঁচিয়ে এই ষ্টিমারে তুলতে পেরেছি।

এই পর্যন্ত বলে সে থামলো। দীপালী সিক্ত পোষাকে নতমুখে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের দু'জনের দেহে নদীতে পড়ে যাবার চিহ্ন যথেষ্ট বিদ্যমান। ওদের দিকে সবাই তাকিয়ে আছে।

নকুল একবার জিজ্ঞেস করলো, তোমাদের বাড়ী কোথায়?

সুবীর উত্তর দিল, ষ্টীমার যদি হাওড়া পর্যন্ত যায়, তা হলেই আমরা বাড়ী ফিরে যেতে পারবো। কিংবা তাও যদি না হয় তো, বজবজ পর্যন্ত পৌঁছোলেই চলবে।

অন্যজন বললো, হাঁ, ষ্টীমার বজবজ যাবে।

অপর একজন সুবীরের দিকে হাত বাড়িয়ে বললো, হ্যাঁ, যাবে তো ঠিকই, কিন্তু তোমরা কি এই সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে এখানে ভেজা দেহে। সেখানে পৌঁছোতে এখনও অনেক দেরী। না, তা হবে না! এসো—আমরা কাপ্তেনবাবুকে তোমাদের কথা বলে একটা কিছু ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। কেন, তোমরা কি মানুষ নও যে, জলে ভেজা বেড়ালের মতো সারারাত এখানে পড়ে থেকে ঠকঠক করে কাঁপবে? চলে এসো তোমরা। নকুলবাবু, এদেরকে একটু নিয়ে যাচ্ছি আমরা। বলেই সে ওদের নিয়ে হনহন করে হেঁটে গেল। এই লোকটা বোধ হয় খালাসীদের সর্দার। সেই রকমই চেহারা, কথাবার্তাও তেমনি। অপর দু'জন খালাসীও ওদের দ্রুত পশ্চাৎ অনুসরণ করলো। নকুল কি একটা যেন বলতে গেল, কিন্তু ততক্ষণে ওরা দূরে চলে গেছে।

মধ্যযৌবনে উপবিষ্ট কাপ্তেনবাবু। তাঁকে সব বলা হলো,

তিনিও সব শুনে গেলেন নীরবে। দু-চারটে প্রশ্নও করলেন সুবীরকে। সুবীর তার উত্তর দিল। পুনঃ পুনঃ সুবীর আর দীপালীকে তিনি আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করতে লাগলেন চশমার ভিতর দিয়ে।

খানিকক্ষণ নীরবে থাকার পর কাপ্তেনবাবু একটা হুঙ্কার দিলেন বাঘের মতো। তারপর খালাসীদের ধমকে বললেন, ওরা নাকি রাত্রে নেশাগ্রস্ত হয়ে স্টীমার চালায় যার জন্য একটা অস্ত্র নৌকা উল্টে গেছে। এবার কোনোদিন ওরা এমন একটা কাণ্ড করবে যার ফলে স্টীমারও ডুববে, ওরাও মরবে! এমন কি ওদের চাকরি হারাবার সম্ভাবনা রয়েছে, ইত্যাদি।

কাপ্তেনবাবুর আদেশে খালাসীরা নতমুখে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

তিনি এবার ঘণ্টা বাজিয়ে বেয়ারাকে ডাকলেন।

বেয়ারা এসে সেলাম ঠুকে দাঁড়ালে তাকে বললেন, যাও এদেরকে তিন নম্বর ঘরে নিয়ে গিয়ে থাকবার ব্যবস্থা করে দাও। আর সেই সঙ্গে গরম চা আর খাবার-টাবার ব্যবস্থা করো। তারপর সুবীর আর দীপালীর দিকে ফিরে বললেন, যাও তোমরা এর সঙ্গে। তোমাদের জামা-কাপড়ের কী অবস্থা? এই ভিজে কাপড়েতে থাকলে জ্বর হবে! শুকনো জামা-কাপড় কিছু আছে আমার স্যুটকেসে —আচ্ছা, তোমরা যাও, আমি একটু পরেই তোমাদের ঘরে যাচ্ছি।

ওরা দুজনে বেয়ারার সাথে তিন নম্বর ঘরে এসে প্রবেশ করলো। ঘর অন্ধকার, বেয়ারা আলো জ্বাললো। অতঃপর বেয়ারা ওদের জন্য খাবার আনতে চলে গেল।

অল্পক্ষণের মধ্যে কাপ্তেনবাবু এসে প্রবেশ করলেন ঐ তিন নম্বর ঘরে হাতে একটি স্যুটকেস নিয়ে।

প্রবেশ করেই তিনি প্রথমে ওদের জন্য একদফা দুঃখ-সহানুভূতি প্রকাশ করলেন। তারপর দীপালীকে বললেন, তোমরা বুঝি

দুই ভাই-বোন ?

দীপালীর আগেই সুবীর উত্তর দিল, হ্যাঁ, ও আমার আপন ছোট বোন।

সুবীরের দিকে একবারও না তাকিয়ে তিনি বললেন, তা বেশ, তা বেশ ! অতঃপব হাতের সুটকেসের ডালাটা খুলে ভিতর থেকে একটা নতুন শাডী বার করলেন। দামী সিল্কের সুন্দর শাড়ী। সেইসঙ্গে উপযুক্ত একটা ব্লাউজ, সায়া, বড়ো তোয়ালে বার করলেন —সবই নতুন।

তারপর দীপালীকে বললেন তিনি, তুমি আমার মেয়ের মতন। আমার মেয়ে সুজাতা ঠিক তোমার বয়সী। নাও, এগুলো এখন তুমি পরে নাও—কোন লজ্জা পেয়ো না। আমার মেয়ের জন্য এগুলো কিনেছিলাম সিংহল থেকে আসার সময়। কই নাও—

দীপালী বলে উঠলো, না, না, ওসব কিছু আমার লাগবে না। ও রেখে দিন। আমাকে বরং তোয়ালেটা একটু দিন গা-টা মুছে নিই।

কাপ্তেনবাবু এতে নিরাশ হলেন না। বিনয় সহকারে বললেন, তোমাব নামটা কি ?

দীপালী।

দীপালী ? বাঃ, বেশ সুন্দর নাম তো ! দীপালী, তুমি আমার কথাটা শোনো। সারারাত এভাবে ভিজে পোশাকে থেকো না— ওতে অসুখ করবেই। আমাকে তুমি লজ্জা পেয়ো না, আমাকে লজ্জা পাবার কিছু নেই। তুমি তো চাইছো না—বরং আমিই তোমাকে পরতে দিচ্ছি। আমাকে কি তোমার কাকা-জ্যেঠা বলে ভাবতে পার না ? ঠিক আছে, না নাও তো যাবার সময় দিয়ে যেয়ো। নাও, লজ্জা না করে এখন পরে নাও !

দীপালী নেবেনা কিছুতেই। শেষে তাঁর অনুরোধে বাধ্য হয়ে নিল।

কাপ্তেনবাবু সুবীরকে নিয়ে ঘরের বাইরে এলেন, তাকে পায়জামা শার্ট, একটা তোয়ালে দিলেন। সুবীর নিল বটে, কিন্তু একদম বিনা পয়সায় নয়, পিছনের পকেট থেকে আধুলি বের করে তাঁর হাতে দিল।

তিনি প্রতিবাদ করলেন প্রথমে ; শেষে অনিচ্ছায় গ্রহণ করলেন। সুবীর বললো, এই তোয়ালেটা আমার আর লাগবে না—এটা আপনি রাখুন। আমার বোনকে যে তোয়ালেটা দিয়েছেন—ওটাতে আমাদের চলে যাবে। বলে সে তোয়ালেটা কাপ্তেনবাবুর হাতে তুলে দিলেন।

তোমাদের কিছু খাবারের ব্যবস্থা করে আসছি, বলে তিনি সেখান থেকে গমন করলেন।

কামরার মধ্যে দীপালী তার ভিজে পোশাক ছেড়ে শাড়ী পরে নিল। মনোমত একটা শাড়ী পেয়ে বেশ কিছুটা খুশী হয়েছে। বাড়ীতেও সে মাঝে মাঝে শাড়ী পরে। সুতরাং শাড়ী এখানে তার একদম নতুন নয়। দীপালীর সুন্দর সুঠাম দেহে দামী সিল্কের শাড়ীটা অপূর্ব মানিয়ে গেল। সবশেষে সে নিজেকে ভালো করে দেখে নিয়ে কামরার দরজা খুলে বাইরে আসতেই দেখতে পেল সুবীরকে।

সুবীর ওর হাত থেকে তোয়ালেটা নিয়ে প্রথমে নিজের গা-হাত-পা-র জল মুছে নিল, তারপর পরে নিল ওগুলো। সুবীরকে দেওয়া পায়জামা আর শার্ট ঐ শাড়ী-ব্লাউজের মত একদম খাস মাল নয়, ওগুলো কাপ্তেনবাবুর নিজস্ব ব্যবহারের জন্য সম্ভবতঃ।

কাপ্তেনবাবুর একটা কথা কিন্তু ডাহা মিথ্যা। দীপালীকে যা পরতে দিলেন, তা সিংহল থেকে কেনা ঠিকই—কিন্তু তাঁর কন্যা সুজাতার জন্য নয়। তিনি অদ্যাপি অবিবাহিত—কাজেই সুজাতা নামে কোনো মেয়ে তাঁর নেই।

ইতিমধ্যে কাপ্তেনবাবু আবার ফিরে এলেন বেয়ারাকে নিয়ে।

বেয়ারার হাতে ট্রেতে গরম চা, পাঁউরুটি, সুস্বাদু বিস্কুট আর ডিম সিদ্ধ।

এতকিছু এনেও তিনি প্রথমে বললেন, বিশেষ কিছু যোগাড় করে আনতে পারলুম না—এত রাত হয়ে গেছে, নাও, তোমরা এইগুলো খেয়ে নাও। কাল সকালে যদি কিছু যোগাড় করতে—

রাতের জন্য এক গ্লাস পানীয় জলই জুটছিল না ওদের। যদি ওরা এখন সেই কাকদ্বীপে পড়ে থাকতো! আর এখন এসব তো সোনায় সোহাগা! কাপ্তেনবাবুর ওপর মনে মনে সম্পূর্ণ কৃতজ্ঞ হয়ে পড়ল দীপালী। কে এমন করে আজ ওদেরকে আশ্রয় আহার দিত?

কাপ্তেনবাবু সামনে বসে থেকে ওদেরকে খাওয়ালেন। তারপর দীপালীকে বললেন, তোমাদের বাড়ী কোথায় দীপালী?

দীপালীকে কোনো উত্তর দিতে না দিতে সুবীর নিজে বলে দিল, আমাদের বাড়ী নৈহাটীতে।

এই কামরায় আসার পর কাপ্তেনবাবু একমাত্র দীপালীর সঙ্গে যা-কিছু বলছেন, সুবীরের দিকে একবারও তাকাচ্ছেন না, সুবীরকে গ্রাহ্যই করছেন না। সুবীর যেন এখানে অনাবশ্যক উপস্থিত। দীপালীকে দু'চোখ ভরে সামনে তিনি দেখছেন।

একসময় তিনি বললেন, তোমরা এবার একটু বিশ্রাম করে নাও। আমি তোমাদের জন্য দুটো খাট পাঠিয়ে দিচ্ছি—কেমন? আর বেয়ারাটা দরজার বাইরে সারারাত থাকবে—যদি তোমাদের কিছু দরকার লাগে। বলে তিনি চলে গেলেন।

অল্পক্ষণের মধ্যে দুটো খাট এসে গেল। বেয়ারা খাট দুটো কাঁধে করে এনে কামরার দু'দিকে পেতে দিল। এ খাট ত্রিপলের তৈরী, মাথা ও পায়ের দিকে উন্মুক্ত। সহজেই ভাঁজ করে যেখানে সেখানে নিয়ে গিয়ে পাতা যায়। বেয়ারা কাজ সেরে চলে গেল।

সুবীর ভাবলো, বেয়ারা এমন করে খাট দুটো পেতে গেল কেন? দু'জনকে একেবারে দু'দিকে করে দিয়েছে! সুবীরের ইচ্ছে হলে তার খাটটাকে তুলে দীপালীর পাশে নিয়ে যেতে—পাশাপাশি দু'জনে থাকা ভালো। কিন্তু এতে যদি দীপালী কিছু মনে করে?

তাই ভেবে আর কিছু না করে খাটটা দরজার সাথে লাগিয়ে তাতে সে গা এলিয়ে দিল। দীপালীও তার খাটের ওপর গা এলিয়ে দিয়েছে। শুয়ে শুয়ে সুবীর ভাবছে! এটা মালবাহী স্টীমার—কাজেই এখানে আর কোন সহযাত্রী নেই। কামরার মধ্যে দুটো আলো ও দুটো দরজা দেখে তার মনে হলো, এটাতে কি মোটে দুটো কামরা? কিন্তু একটাই তো দরজা খোলা রয়েছে। তা ছাড়া, সুবীরদের শ্রেণীকক্ষে যে দুটো করে পাখা ঘোরে, দুটো দরজা আছে—কি সেটাও মোট দুটো ঘর নাকি? একটাই তো মাত্র ঘর!

সুবীর নিজের চিন্তায় মগ্ন ছিল। হঠাৎ কিসের একটা উচ্চ শব্দে সে ধড়ফড় করে উঠে বসলো। ঘুটঘুটে অন্ধকার! দ্রুত সে খাট থেকে লাফিয়ে পড়ে উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিল—দীপালী! কিন্তু কোনো সাড়া এলো না। সে অমনি দৌড়ে দীপালীর কাছে আসতে গিয়ে তীব্র বাধা পেল। কিসের একটা নিরেট-নিশ্ছিদ্র কপাট কামরার ছাদ থেকে মেঝে পর্যন্ত পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে দীপালীর কাছে যাবার আর একটুও উপায় নেই!

সুবীর কামরার বাইরে আসতে গেল, কিন্তু বাইরে থেকে দরজা। বন্ধ।

॥ চার ॥

তাপসীকে নিয়ে মাঝি জটাধর দাঁড় টানছে।

একসময় সে তাপসীকে বললো, এই যে তোমার খাবারের প্যাকেট দুটো পড়ে রয়েছে, এই ধরো—খেয়ে নাও। বলে সেগুলো তাপসীর কোলের ওপর তুলে দিল।

তাপসী আবার ছুঁড়ে ফেলে দিল নৌকার ওধারে।

মাঝি বললো, বুঝেছি। ঠিক আছে, তুমি যদি না খেতে চাও, আমি জোর করবো না। কিন্তু আমাকে ঐ লোক দুটোর দলে ভেবো না তুমি! সত্যি বলছি—ওদের মধ্যে আমি একটুও নেই! তোমাকে ঐ দস্যু দুটো নিশ্চয়ই চুরি করে এনেছে, তাই না? ঠিক আছে, আমি কথা দিচ্ছি, তোমাকে বাড়ী পৌঁছে দেবো।

তাপসী বুঝতে পেরেছে এ মাঝি সাধারণ মানুষ নয়। আজকাল কোন ভদ্রলোকেই নিজের গাঁটের টাকা খরচ করে কোন অসহায়াকে বাঁচাতে আসে না আর এ তো একজন তুচ্ছ মাঝি হয়ে তাপসীকে বাঁচিয়েছে। সে বললো এবার, না আমাকে বাড়ী পৌঁছে দিতে লাগবে না।

মাঝির মুখে বিস্ময় ফুটে উঠলো, বাড়ী যাবে না! সে কি! তবে কোথায় যেতে চাও তুমি?

তাপসী বললো, জানি না!

মাঝি আবার বললো, তুমি কি তবে ঐ লোক দুটোর ওপর প্রতিশোধ নিতে চাও? তা পারবে না সত্যিই!

এর পর পাঁচ-ছদিন কেটে গেছে। জটাধর অনেক সাধ্যসাধনা করেছে তাপসীকে বাড়ী ফিরে যাবার জন্য। কিন্তু তাপসী একদম অনড়। সে কিছুতেই বাড়ী ফিরে যাবে না। কাজেই জটাধর মাঝখান থেকে বেশ একটা ফ্যাসাদে পড়ে গেছে। নেহাৎ মমতায় একটা নাবালিকা মেয়েকে বাঁচাতে গিয়ে, এখন পুলিশের হাতে ধরা পড়লে সে জেলে যেতে বাধ্য। কে-ই বা চায় কারাগার-জীবন বরণ করতে ?

কিন্তু জটাধর সেই ধরনের লোক নয়। সে নিজেকে বাঁচাবার জন্য অসহায়া তাপসীকে জোর করে নামিয়ে দেয়নি নৌকা থেকে। তাপসী নৌকায় রয়ে গেছে, বিশেষ কিছু খায়-দায় না। মাঝি বার বার অনেক করে বুঝিয়েছে, এবং এও বলেছে ওকে যে, তাপসীর অপহরণের কথা কেউ-ই জানতে পারবে না একদম। সে তাপসীকে থানায় জমা দিয়ে বলবে, পথে হারিয়ে যাওয়া এই মেয়েটাকে সে শুধু উদ্ধার করেছে।

কিন্তু তাপসী কিছুতেই রাজী নয়। সে বলে দিয়েছে, তাকে যদি জোর করে এই নৌকা থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়, সে এই মা-গঙ্গার বুকে ডুবে মরবে। সে মাঝির সমস্ত কাজকর্ম করে দেবে, আর তার বিনিময়ে ছু'বেলা সামান্য কিছু আহার্য পেলেই তার চলে যাবে।

কাজেই মাঝি এখন কি করবে বা করা উচিত, ঠিক কবতে পারছে না। একদিকে রয়েছে নাবালিকার আত্মহত্যার আশঙ্কা, অপরদিকে তার অসহায়াত্ব।

নৌকা ভেসে চলেছে গঙ্গার বুকের ওপর দিয়ে ক্রমশঃ উত্তরে। নৌকায় থাকবার জন্য মাঝি পাল আর মাচার ব্যবস্থা করে নিয়েছে।

তাপসী রান্নাবান্না করতে জানে। লোহার উনানে কাঠ দিয়ে সে খাবার-দাবার তৈরী করে। খিচুড়ি, মোটা চালের ভাত, রুটি —যেদিন যা জোটে, তাই ওরা ছু'জনে মিলে খায়। খাওয়া নিয়ে ওদের কোনো বাছ-বিচার নেই। সে গ্রাম্য মেয়েদের মতো কাপড়

পরে থাকে ; মাচার বাইরে দিনের বেলায় বড়ো একটা বেরোয় না। জটাধরকে সে 'কাকা' বলে ডাকে।

মাঝি তাপসীকে তাড়িয়ে দিতে পারে নি। দিলে ও হয়তো এই গঙ্গায় ডুবে মরবে—তাই ওকে থাকতে দিতে বাধ্য হয়েছে। আর সেইজন্য নৌকা নিয়ে সে নিরুদ্দেশেব পথে পাড়ি দিয়েছে—কলকাতার কাছাকাছি থাকা মোটেই চলে না।

জটাধরের কাছে যা টাকাকড়ি আছে, তা দিয়ে স্বল্প খবচে কষ্টে-সষ্টে কাশী পর্যন্ত পৌঁছোতে পারবে ওরা দু'জনে।

ভাগ্যিস টাকাকড়িগুলো সাথে নিয়ে সেইদিন নৌকায় উঠেছিল বলেই আজকে তবু কিছু খাবার জুটছে, কিছুকালের জন্য অন্ততঃ বাঁচতে পারবে! তা না হলে তাপসীকে নিয়ে নৌকার ওপর শুকিয়ে মরতে হতো!

এখন জটাধরের সবচেয়ে বেশী ভয় হচ্ছে—পুলিশ-টুলিশেব হাতে গিয়ে তাকে যেন না পড়তে হয়। কিন্তু তাপসী তাকে অভয় দিয়েছে, কাকু, আমি তো আছি, আমিই সাক্ষী দিয়ে তোমায় বাঁচাবো।

মাচার এক কোণে বসে তাপসী গঙ্গার দু'পারের দৃশ্য দেখে। কত বিচিত্র সব দৃশ্য! আর জটাধর দাঁড় টেনে যায়। পালে হাওয়া লাগলে নৌকা অল্প পরিশ্রমে চলে যায়। দিনের বেলায় কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে-নেয় মাঝি, আর সারারাত দাঁড় টানে। কারণ, রাত্রে দু'জনে ঘুমিয়ে পড়লে নৌকা পাহারা দেবে কে?

গঙ্গার কূলে গ্রাম বা লোকালয় পড়লে সেখান থেকে ওরা চাল, ডাল, আটা, অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করে নেয়। নৌকা থেকে নেমে কোথাও যেতে হলে তাপসীকেও সাথে করে নিয়ে যায় মাঝি। সেইসময় তাপসীকে সেই কালো বোরখাটা পরিয়ে দেওয়া হয়। নৌকায় ওকে একা রেখে যাওয়া মাঝি নিরাপদ মনে করে না।

মাঝি নৌকোকে সবসময় মাঝ-গঙ্গায় রাখে—যাতে লোকদৃষ্টি ওদের ওপর না গিয়ে পড়ে। দিনের বেলায় কয়েক ঘণ্টার জন্য নৌকা বাঁধতে হয়, সেইসময় মাঝি ঘুমিয়ে নেয়। লোকালয়, গ্রাম বা ঘাট থেকে সে সব সময় দূরে নৌকা বাঁধে, কখনও গঙ্গার চড়াতে বাঁধে।

সারারাত্তির ধরে দাঁড় টানে মাঝি। রাত্তিরে সূর্যের কিরণ থাকে না, সেইসময় গঙ্গার মৃদুমন্দ বাতাস বয় বলে সহজে পরিশ্রান্ত হয় না। বেশী রাত হলে তাপসী ঘুমিয়ে পড়ে। কোনো কোনোদিন মাঝির কাছে বসে বিচিত্র সব গল্প শোনে।

প্রথম প্রথম তাপসীকে সারাদিন মাচার মধ্যে বন্দী থাকতে হতো, সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকতো তাই মাঝি একটা মতলব বার করলো। সে একটা ডোরা-কাটা পায়জামা আর শার্ট কিনে এনে দিল। সেই দুটো পরে থাকে তাপসী দিনের বেলায়; সেই সঙ্গে মাথায় একটা পাগড়ি বেঁধে চুল সব ঢেকে রাখে। এর ফলে নৌকায় সে সহজে বেরোতে পারে! ডোরা-কাটা ঐ পায়জামা-শার্ট পরলে তাপসীকে বাঘের মতো দেখায়। কিন্তু রাত্তিরে সে শাড়ী পরে, উন্মুক্ত কেশে গঙ্গার হাওয়া লাগায়।

মাঝি লুঙ্গি পরে, মুখে বড়ো বড়ো দাড়ি-গোঁফ—তাই তাকে মুসলমান-মুসলমান বলে মনে হয়।

জটাধর ভালো করে জানে, যে-দুটো দস্যু তাপসীকে হরণ করে তার নৌকায় তুলেছিল, ওদের মতো অর্থপিশাচ আর নেই। অর্থের জন্য ওরা সবকিছুই করতে পারে, কোনো কাজই ওদের আটকায় না। অর্থের লালসায় ওরা ওদের প্রভুর সাথে বেইমানি করেছে, আবার অর্থের লোভেই ওরা মেয়েটাকে মাঝির হাতে তুলে দিয়েছে। এখন যদি তাপসীর বাবা-মা তাঁদের মেয়ের সন্ধান দেবার জন্য এক হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন—অমনি তা হলে ঐ দস্যুদুটো নৌকা নিয়ে সুড়সুড় করে বেরিয়ে পড়বে; তারপর জটাধরের

সন্ধান কোনোদিন পেলে পুলিসের হাতে তাকে তুলে দিয়ে বলবে —এই শালা চোর—নারী অপহরণকারী! অমনি ওরা নিজেরা সেজে যাবে একদম শ্রীরামকৃষ্ণদেব, অথচ ওরা-ই একদিন প্রথমে—

তাপসী কিন্তু মাঝিকে বলেছে, তার নাম 'পুষ্প'।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে—পৃথিবীর বর্ণ এখন শ্যাম। তাপসী হারিকেনটা জ্বেলে নৌকার মাচার ওপর টাঙিয়ে দিল। প্রতি সন্ধ্যায় এই ব্যবস্থা করা হয়—যাতে অন্য কোনো নৌকা বা স্টীমার অন্ধকারের মধ্যে এদের ঘাড়েব ওপর এসে না পড়ে। হারিকেন জ্বালার পর একটা ঢাকনায় করে সরষের তেল এনে তাপসী বললো, কাকা, তোমাকে একটু তেল মালিশ করে দিই। বলে মাঝির সম্মুখে বসে পড়লো।

এই মেয়েটাকে মাঝি খুব ভালোবাসে, এ যাতে একটু ভালো করে থাকতে পারে, তার চেষ্টা করে সর্বক্ষণ। এখন সে তাপসীকে বললো, না পুষ্প, আমাব এখন তেল মালিশ লাগবে না; তুমি বরং কাল ওটা মাথায় দিয়ে স্নান কোবো।

তাপসী ছাডবার মেয়ে নয়, বললো, না কাকু, তা হবে না! মাথায় দেবার তেল আছে। এখন তোমায় একটু মালিশ করে দিই। বলে সে মাঝির তুই কাঁধে তেল মালিশ করতে লাগলো তার কোমল আঙ্গুল দিয়ে।

মাঝির গায়ে কোনো জামা নেই। দাঁড় টানতে টানতে গা আপনিই গরম হয়ে যায়। তেল মালিশ করতে করতে তাপসী বললো, কাকু, সেই গল্পটা বলো—

মাঝি জিজ্ঞেস করলো, কোন গল্পটা?

তাপসী জানালো, যেটা তুমি বলছিলে কাকু।

জটাধর কেমন করে মাঝিতে পরিণত হলো, সেই অতীত ইতিহাসটা বলে শোনাচ্ছিল গত তু'দিন ধরে। তাপসী মালিশ শেষ করে ঐ ইতিহাস শুনতে লাগলো।

জটাধর তখন কুড়ি বছরের। সে তখন মাঝি নয়, যদিও দাঁড় টানা জানতো কানপুরে তারা সবাই থাকতো। দরিদ্র পরিবারের পুত্র সে।

তার বাবা বেশী রোজগার করতেন না। তাঁর মদ-জুয়ারও নেশা ছিল। টাকা উপার্জন করতে একমাত্র তিনিই একা। আর ঐ পরিবারের লোকসংখ্যা দশ।

কাজেই, এরকম অবস্থায় পরিবারের অবস্থা যে-রকম হয়, উক্ত পরিবারের অবস্থা সেইরকম। অর্ধাহার, অনাহার লেগেই থাকতো। ছেলে-মেয়েরা বাপ-মা-র হাতে মার খেতো খুব। জটাধর বড় ছেলে, সেও মার খেতো, স্কুল অবধি পড়াশোনা করে টাকা উপার্জনে পথে বের হতে বাধ্য হলো।

উনিশ বছর বয়সে সে লরীচালক। কানপুরের গুদাম থেকে মাল নিয়ে যেতে হতো নানা স্থানে; পাড়ি দিয়েছে শত শত মাইল দূরে।

কিন্তু এই চাকরিতে জটাধর যে টাকা আয় করে, তাতে ওদের অভাবগ্রস্ত পরিবারের কোনো সুরাহা হয় না। কারণ আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে তার বাবার নেশাও বৃদ্ধি পেয়েছে সেই অনুপাতে। তখন রাত জেগে অতিরিক্ত পরিশ্রম করে বেশী টাকা আয় করতে লাগলো জটাধর। কিন্তু জুয়ায় ওদিকে সব উড়িয়ে দিচ্ছেন তার বাবা। সংসারের অভাব-অনটন অনড়।

একটি বছর চাকরীতে নির্বিঘ্নে কেটে গেল। তারপর এমন একটা ঘটনা ঘটলো, যার ফলে জটাধর তার প্রাণ নিয়ে যে বেঁচে আসতে পেরেছে—এই-ই তার সৌভাগ্য!

সাধারণতঃ কোনদিন মাল তল্লাশ হয় না, মালের তালিকা দেখে লরী ছেড়ে দেওয়া হতো। সেদিন পুলিশ কি ভেবে কয়েকটা লরী তল্লাশ করে কিছু অবৈধ মাল পেল—যার ফলে সেদিন পুলিশ

সমস্ত লরীতে জোর তল্লাশ চালালো। কিন্তু জটাধর একটুও জানতে না যে, তার লরীতে প্রচুর অবৈধ মাল লুকানো। পুলিশ লরীসুদ্ধ সবাইকে আটক করলো। জটাধরের পাশে বসে যে কাগজপত্র নিয়ে যাচ্ছিল, সে প্রথমেই অন্ধকারের মধ্যে দৌড়ে পালিয়েছিল পুলিশ গুলি ছুঁড়লেও তার লাগে নি।

সত্যিই জটাধর মাল সম্পর্কে কিছুই জানতো না। যখন যেখানে তাকে যেতে বলা হতো, সেখানে সে লরী নিয়ে যেতো।

থানা থেকে অনেক কষ্টে জটাধর মুক্তি পেয়েছিল। তার লাইসেন্স নম্বর, নাম-ধাম, গুদাম-অফিসের ঠিকানা ইত্যাদি নিয়ে তবে পুলিশ মুক্তি দিয়েছিল, কিন্তু মাল সমেত লরী পুলিশের হাতে আটক রইল।

জটাধর গুদামঘরের কাছাকাছি একটা ঘরে থাকতো দেবদুলাল নামে তার এক অন্তরঙ্গ বন্ধুও থাকতো একই ঘরে ওরা দু'জনে একই প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতো। দিনে-রাতে যে কোনো সময় গুদাম থেকে মাল নিয়ে জটাধরকে রওনা হতে হতে বলে তার বাড়ীতে থাকা চলতো না। জটাধরের কাছ থেকে সব শুনে দেবদুলাল বললো ওকে, হ্যাঁ, আমারও এরকম একটা সন্দেহ জন্মেছিল কতগুলো ব্যাপার দেখে। যাক সে কথা। এখন তোকে আমি খুব সাবধান করে রাখছি—তুই আজ থেকে খুব সাবধানে থাক—তোর ওপর যে-কোনো রকম বিপদ আসতে পারে দু-চারদিনের মধ্যেই! এমন কি তোর প্রাণসংশয়...

সত্যি তাই ঘটলো। জটাধরের কাছ থেকে ঠিকানা জেনে পুলিশ ওদিকে গুদামঘর ও অফিস-ঘর ঘিরে রাখলো। পরদিন জটাধর ও দেবদুলাল সেই খবর জানতে পারলো। একজন দূত পরদিন এসে জটাধরকে জানালো যে, আজ রাত ন'টার সময় গঙ্গার ধারে কাঁচাঘরে খুব গোপনে মিটিং বসবে, সেই মিটিং-এ ম্যানেজার আসবেন খুব গোপনে। ঐ সময় জটাধরকে অবশ্যই

পস্থিত থাকতে হবে।

গঙ্গার ধারে একসারি কাঁচাঘর আছে। সেগুলো গুদামঘর ‌সব মাল নৌকা করে চালান যায় নানাস্থানে, সেগুলো ঐ দামঘরে থাকে। কিছুদিন ধরে ঐ ঘরগুলো ফাঁকা, পুলিশ না দিয়ে কিছুই পায় নি। আজ রাত্রে ওখানে গুপ্ত মিটিং। বদুলাল জটাধরকে বললো, ভাই আর রক্ষে নেই তোর! কি । হবে তা বলা যায় না। তবুও আমাদের বাঁচার চেষ্টা করতে বে।

সভয়ে জটাধব বলেছিল, তা হলে চল না ভাই, আমরা কোথাও লিয়ে যাই এর মধ্যে। রাত ন'টা বাজতে ঢের দেরী—

দেবদুলাল উত্তর দিয়েছিল, উঁহু! তার আর একটুও উপায় ই! তা হলে আমাকে মনে করিয়ে দিতে লাগতো না। তার ওপর এখন কতগুলো নজর আছে, জানিস? এতদিনে তুই কছুই জানতিস না, এখন যেহেতু জেনে গেছিস ওদের গুপ্ত যাপার—তোকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শেষ করবার চেষ্টা করবে! ই এখন কানপুর থেকে কোথাও পালাতে পারবি না ওদের চোখ ড়িয়ে। দেখবি, আজকের মিটিং-এ হয়তো তোকে কিছু টাকা য়ে দূরে কোথাও পাঠাবার চেষ্টা করবে।

একটু কি চিন্তা করে সে আবার বলেছিল, আর একটা কথা— াজ রাতে আমরা দুজনে একসাথেই মিটিং এ যাবো, আমাকে ছেড়ে টা এক-মুহূর্তও কোথাও থাকবি না। আর ঘরে যা টাকা-পয়সা াছে সব আমার কাছেই থাকবে—যদি একটা পালাবার সুযোগ াই বুঝলি?

দেবদুলাল মাঝির পুত্র, সে নিজেও মাঝি। তাদের নিজস্ব ঘরে টা নৌকা রয়েছে কিন্তু সে চাকরি নিয়েছে, কানপুর থেকে প্রতি-ানের মাল নিয়ে গঙ্গায় পাড়ি দেয়। কানপুরে থাকলে দুই বন্ধুতে কই ঘরে থাকে। জটাধর যা মাইনে পায় তার প্রায় সবটাই

বাড়ীতে পাঠিয়ে দিতো। কাজেই তার ভালোভাবে দিন কাটতো না। দেবত্বলাল তাকে নানাভাবে সাহায্য করে যেতো। জটাধরের চেয়ে সে মাত্র বছর ত্নু-তিনেকের বড়ো।

সেদিন ত্নপুরে দেবত্বলাল বন্ধুকে অভয় দিয়ে ছদ্মবেশে বেরিয়ে পড়লো। গঙ্গার পাড়ে ওদের একটা নৌকা যাত্রার জন্য প্রস্তুত রেখে ফিরে এলো।

রাত ন'টায় ওরা ত্নজনে এলো গঙ্গার ধারে সেই গুপ্ত মিটিং-এ। ম্যানেজার থোক ত্নশো টাকা জটাধরের হাতে দিয়ে বললেন, এবার যেখানে তুমি আমাদের গুপ্ত ব্যাপারটা জেনে গেলে, তখন আজ থেকে তুমি আমাদের লোক। মাইনে একশো টাকা করে বেশী পাবে। কেমন? তুমি এবার আমাদের লাভ-লোকসানের অংশও পাবে। আজ যাও, শোনো, পরশু রাত্রে ঠিক এই সময় এখান থেকে ত্নটো নৌকা ছাড়বে, তুমি মাঝিদের মধ্যে থাকবে। এলাহাবাদে পৌঁছলে সব জানতে পারবে। সেখানেও আমাদের সেণ্টার।

ম্যানেজার অতি পাকা লোক। এক গোছা নোট দিয়ে জটাধরকে কিছু সময়ের জন্য কানপুরে বেঁধে রাখলো। হয়তো কানপুরে, নতুবা নৌকাপথে তাকে সাবাড় করে দেবেই। নিজেদের মধ্যকার একান্ত গুপ্ত ব্যাপার একবার জানাজানি হয়ে গেলে আর রক্ষে থাকবে নাকি!

সেটা ফলতে বেশী দেরী হ'ল না। ওদের ঘরে ফেরবার পথে অন্ধকারের মধ্যে কারা লাঠি নিয়ে আক্রমণ করলো। জটাধরের কাঁধের ওপর এসে পড়লো লাঠির ঘা। সেই লাঠি-আক্রমণের হাত থেকে অনেক কষ্টে দেবত্বলাল তাকে রক্ষা করে তার হাত চেপে ধরে তীব্রবেগে দৌড়োতে লাগলো। আর পিছন থেকে আসতে লাগলো গুলি। একটা গুলি রাস্তার বেওয়ারিশ কুকুরের গায়ে লাগায় তার সে কী গগনভেদী আর্তনাদ! জটাধরকে নিয়ে সে গঙ্গার

পাড় ধরে অন্ধকারের মধ্যে এঁকে-বেঁকে দৌড়োতে দৌড়োতে তার নৌকার কাছে এসে পৌঁছোলো। অবিলম্বে সেই নৌকা খুলে দিয়ে ওরা দু'জনে হাল টানতে লাগলো ক্ষিপ্রগতিতে।

অন্ধকারে এলোপাথাড়ি গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে ওদের গুলি গেল ফুরিয়ে,—তবুও একটি গুলি এসে বিঁধেছিল দেবদুলালের ডান পায়ে। কিন্তু সেদিকে সে কোনো ভ্রূক্ষেপ না করে দাঁড় টানায় মগ্ন। জটাধর বলতে সে বললো, ও আমার বেশী কিছু নয়। এখনো আমরা বিপদ-সীমানায়!

খানিকদূর আসতেই জটাধর তার ধুতির একাংশ ছিঁড়ে ভালো করে বেঁধে দিয়েছিল দেবদুলালের পায়ে।

দীর্ঘকাল পরে নৌকা নিয়ে ওরা এসে পৌঁছেছে এই কলকাতায়। তারপর গঙ্গা পার করেই ওরা বেঁচে আছে দু'জনে একত্রে। সেই কুড়ি বছর বয়েস থেকে জটাধর আজ পর্যন্ত মাঝি।

পরে ওদের একটা নৌকা থেকে দুটো নৌকা হয়েছে। সেই দ্বিতীয়টাতেই এখন জটাধর বসে। সে তার বন্ধুর জন্য আজ প্রাণ নিয়ে বেঁচে আছে—সে দেবদুলালের ওপর চিরকৃতজ্ঞ। বন্ধুর কাছে ঋণ সে কোনোদিনেই শোধ করতে পারবে না। কিন্তু হায়, সেই দেবদুলাল আজ নেই! যে-বন্ধু একদিন নিজেই গুলি খেয়ে প্রাণের বন্ধুকে বাঁচিয়েছিল—সে-ই আজকে পৃথিবী থেকে নিয়েছে চিরবিদায়!

ওদের বন্ধুত্ব কোনোদিন টুটে যায় নি। শেষদিন পর্যন্ত ওরা একত্রে থেকেছে। ওদের দু'জনার যে-মিল ছিল, পারিবারিক জীবনে তা সত্যি দুর্লভ। বিয়ে করে নি কেউ। জটাধর কলকাতা ছেড়ে আসবার কিছুদিন আগে সেই দেবদুলাল মারা গেছে। জটাধর আর দেবদুলালের মধ্যে চিরদিন এইরূপ কথা ছিল—যদি ওরা কেউ মারা যায়, তার সবকিছু অপর বন্ধুই পাবে, বাড়ীর কেউ ই নয়। তাই মৃত বন্ধুর সম্পত্তি সে পেয়েছিল।

সেই যে কানপুর থেকে তারা জীবন নিয়ে পালিয়ে এসেছিল, আর কোনোদিনই তারা ঘরমুখো হয়নি, বাবা-মা-র মুখদর্শন করে নি। তারা দু'জনে ভালো করেই জানে—তাদের জীবনের সব দুর্গতির জন্য একমাত্র পিতামাতা-ই দায়ী। পিতামাতাব জন্যই তো তারা এ পৃথিবীতে এসেছে—আর আজকে যত জীবন-যন্ত্রণায় ভুগে মরছে! নচেৎ, জটাধব কিংবা দেবদুলাল—কেউ-ই নিজের জীবনের জন্য আকাঙ্খিত নয়; পৃথিবীব কোন অমৃত তারা পান করতে চায় নি। আব এই পার্থিব জীবন-বুদ্বুদেব জন্য তারা কোনো মিথ্যে সংগ্রাম কবতে রাজী নয—কিন্তু করতে বাধ্য হয়েছে স্রেফ একজোডা নব-নাবীব যৌন-স্বেচ্ছচাবিতাব জন্য। একদিন তো শ্মশানঘাটে কাঠে আর মানুষে একত্রে পুড়ে হয়ে যাবে ভস্ম—সেদিন আর কি রইবে? কোনো অস্তিত্ব থাকবে?

সেই অতীত কাহিনী সমাপ্ত হয়ে গেছে। নৌকা আবার ভেসে চলেছে।

গঙ্গার দু'পারের ক্ষেত-খামার, গ্রাম-লোকালয়, ঘাট, মানুষ, প্রাকৃতিক দৃশ্য আরও কত কি দেখত তাপসী নৌকায় বসে দিনের বেলায়।

অন্ধকার রাত্রে কোন শ্মশান ঘটের পাশ দিয়ে নৌকা ভেসে গেলে তাপসী দেখতে পায়, অন্ধকার চিরে দাউ দাউ করে পুড়ছে শব।

একদিন মাঝি তাপসীকে বলল, পুষ্প, তোকে কত করে বললুম ঘরে ফিরে যেতে, তবুও গেলি না। এখন কি করবি? আমার সাথে এরকম সারা জীবন ধরে জলে জলে ভেসে বেড়াবি? তুই আমার ছোট বোন, তোকে এখনও বলছি তোর ভালোর জন্য। তুই ঘরে ফিরে যা। আমিই সব ব্যবস্থা করে দেব। এরকম

ভাবে কতদিন আর কাটাবি ?

তাপসী উত্তর দিল, কাকা, তুমিও যে তোমার কুড়ি বছর থেকে এই জলে জলে ঘুরে বেড়াচ্ছ ! তবে আমি পারব না কেন ?

উত্তর শুনে মাঝি ঈষৎ হাসল। যদি সে জটাজুটধারী হয়ে একদল শিষ্য নিয়ে বটবৃক্ষতলে গিয়ে বসে, তাহলে তাকে যে-কেউ বলবে সেই প্রাচীন যুগের ঋষি। এই ঈষৎ হাসিটি তার সৌমমূর্তির মাধুর্য বাড়িয়ে দিল। সে বলল কেন আবার জিজ্ঞেস করছিস ? তুই কিছুই বুঝিস না ? ঠিক আছে, এই নৌকাখানি তোকে দিয়ে আমি হরিদ্বারের দিকে চলে যাই। তারপর একমাস বাদে ফিরে এসে গঙ্গার বুকে খুঁজে দেখব কোথও তোর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় কি না। তুই কতবড় মাঝি হয়ে উঠেছিস একবার দেখি তো !

তাপসী ভয়ে ভয়ে বলল, না কাকু, আমাকে একা ফেলে কোথাও যেও না।

মাঝি বলল, এই পেটের আর এই জীবনেব জ্বালা যে কতখানি, তা জানিস ? পথে বসে যে জুতোয় পেরেক মারছে, সেও পেটের জ্বালায় ; আবার যে আলো ঝলমলে দোকানে বসে হীরে-মুক্তোর হার গড়াচ্ছে সেও পেটের জন্য। উদ্দেশ্যর কোন পার্থক্য নেই রে ! জীবনটা যতদিন, ততদিন সব জ্বালা ! মৃত্যুর পর পরলোকে গিয়ে পড়লে তখন সব নদীর জল এক হয়ে যায়।

তাপসী জিজ্ঞেস করল, পরলোক কাকে বলে ?

মাঝি বলল, কি জানি ! লোকে বলে তাই শুনেছি। পর্বত থেকে কয়েকটা নদী বেরিয়ে সাগরে গিয়ে মিশলে তখন আর কোন নদীকে আলাদা করা যায় ? সেইরূপ মৃত্যুর পর আর কউকে আলাদা করা যায় না রে। নদী যেমন ঘুরে ফিরে সমুদ্রে গিয়ে পড়ে, তেমনি সব মনুষও ঘুরে ফিরে সেই মৃত্যুতে গিয়ে মিশবেই। মুচি-মেথরই হোক আর লাখপতি-কোটিপতিই হোক।

তাপসী বলল, কিন্তু কাকা নদী তো গড়ায় ঢালুর দিকে,

তার সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক কি ?

মাঝি উত্তর দিল—হ্যাঁ, সব মানুষও তেমনি সুখের দিকে গড়ায়। ছাখ না, মানব-জীবনের মাঝপথটাই যা আলাদা—নচেৎ শুরু আব সমাপ্ত এক ? কোটিপতির পুত্র যেমন নিজের ইচ্ছায় জন্মায় নি, ভিখিরর ছেলেও তেমনি স্বেচ্ছায় জন্মায় নি। কোটিপতির সন্তান জন্মের পর থেকেই স্থান পেয়েছে রাজশয্যায়. আর ভিখিরর ছেলে জন্মের পর থেকে পড়ে আছে ধুলিশয্যায়। জীবনের মাঝপথটা সবারই আলাদা। কিন্তু ক্ষুধা নিবৃত্তি সকলকেই করতে হয়। কেউ হয়ত পচা-ধোসা আহার করে, কেউ এক টেবিল দিশি-বিলিতি সব খাবার নিয়ে আহারে বসে। জীবনের শেষে মৃত্যুতে গিয়ে সবাই আবার এক হয়। কিন্তু মৃত্যুস্থানও আলাদা আলাদা। ভিখিরির পথের ধূলোয়, গাছতলায়, রেলের স্টেশনে মরে আর লাখপতি কোটিপতিরা মরে তাদের প্রাসাদতুল্য গৃহে দামী পাথরের মেঝের ওপর। কিন্তু ঐ যে বললুম মৃত্যুর পর আর কেউ-ই ফিরে আসতে পারবে না। কোটি টাকার বিনিময়েও না।

একটু থেমে আবার বলল -বুঝলি না ? মনে কর, আমরা কলকাতা থেকে দিল্লী যাবো। কিসে যেতে পারি ? ট্রেনে করে বা প্লেনে বা মোটরে বা নৌকায় যেতে পারি। সবই তো দিল্লীতে নিয়ে যাবে।

যে যাতেই যাক, সেই দিল্লীতে গিয়ে পৌছবে, কিন্তু কলকাতা আর দিল্লীর মধ্যে এই মাঝপথটা থাকবে আলাদা। তেমনি, সব্বাই মৃত্যুতে গিয়ে পৌছবে একদিন। কিন্তু জীবনের মাঝপথটা থাকবে আলাদা।

ভাসতে ভাসতে শেষে ওদের নৌকা এক শারদীয় দুপুরে এসে ভিড়ল কাশীর ঘাটে। দুর্গাপূজা তখনও আসে নি। তাপসী ঘাট দেখে খুব আনন্দিত হয়ে মাঝির একটা হাত ধরে জিজ্ঞেস করল—কাকা, আমরা পৌছে গেছি-? মাঝি উত্তর দিল—হ্যাঁ মা।

॥ পাঁচ ॥

কাশীর এক গলির মধ্যে একখানা ঘর ভাড়া নিয়ে সেখান থাকে জটাধর আর তাপসী। সাথে আর একখানা ছোট্ট ঘর। সেখানে রান্না হয়। ইচ্ছে করলে সেখানে একটা লোকও থাকতে পারে।

এখন জটাধর কাশীব গঙ্গার মাঝি। দাঁড় টেনে যা আয় হয় তাতে ওদের দুজনার মোটামুটিভাবে চলে যায়। তাপসী তো বেনারসী পরে না, বা জটাধরও ফিনফিনে ধুতি-পাঞ্জাবি পরে না কাজেই কাশীর বিশ্বনাথের দয়ায় মোটা ভাত-কাপড় জুটলে ওদের চলে যাবে।

ওরা দুজন ছাড়া আরও একজন হিন্দুস্থানী বিধবা আছে সে রান্নাবান্না ও অন্য সব কাজ করে দেয়। মাঝি তাপসীকে একা রেখে যেতে সাহস পায় না। তাই বিধবাটিকে রেখেছে। সে মাইনে নেয় না, শুধু দুবেলা ডাল-রুটি খায়। রাত্রে আবার ফিরে যায় ঘরে। এই বিধবাব একটি মেয়ে, সেও ঠিক তাপসীর মত দেখতে। কলেরায় মারা গেছে। তাই সে তাপসীকে ভালবাসে নিজের মেয়ের মত।

মাঝি সেই সকালে বেরিয়ে যায় আবার দুপুরে বাড়ীতে খেতে আসে। খেয়ে-দেয়ে আবার নৌকায় যায়। তারপর রাত্তিরে সে ঘরে ফিরলে বিধবাটি তখন বাড়ী যায়। মাঝি সারাদিন নৌকা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। ওটাই এখন একমাত্র বেঁচে

থাকবার সম্বল। ওটা না থাকলে এখন ওদের ভিক্ষে করতে হত।

মাঝি তাপসীকে সবার কাছে পরিচয় দিয়েছে তার ভ্রাতুষ্পুত্রী বলে।

একদিন দুপুরে নৌকায় ফেরার পথে মাঝি দেখতে পেল এক বৃদ্ধ গাড়োয়ান গাড়ি থামিয়ে কলে জল পান করতে গিয়ে হঠাৎ বসে পড়ল। তারপর ঢলে গেল। মাঝি তাড়াতাড়ী কাছে গিয়ে দেখল অজ্ঞান হয়ে গেছে। তখন ঐ কল থেকে জল নিয়ে গাড়োয়ানের চোখে-মুখে ছিটিয়ে দিল।

কিছুক্ষণ বাদে তার জ্ঞান ফিরল। সে তখন মাঝিকে বলল— বেটা তুই আমাকে আজ বাঁচালি। বৃদ্ধ গাড়োয়ানের আপাদমস্তক এমন একটা ভাব ছড়ান ছিল যে মাঝি তার প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে পারল না। তাকে দেখতে অনেকটা বৃদ্ধ পুরোহিতের মত। মাঝি বলল—গাড়োয়ানজী তোমার ঘর কোথায়? চল, তোমার ঘর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসি।

গাড়োয়ান বলল—না, তার দরকার নেই। আমি একাই যেতে পারব।

মাঝি তা শুনল না। জোর করে গাড়ীতে তাকে তুলে দিয়ে মাঝি তার পাশে বসল। ঘর চল বলে গাড়োয়ান লাগামটায় একটা টান দিল। গাড়ি চলতে সে মাঝির হাতে লাগামটা দিয়ে বলল— ধর।

মাঝি লাগাম ধরল বটে কিন্তু তার ভয় ভয় করছে। আজ পর্যন্ত কোন দিনই সে ঘোড়া চালায় নি। এক জায়গায় ঘোড়া থামিয়ে মাঝি কিছু ছাতু কিনল—গাড়োয়ানের হয়তো কিছু খাওয়া হয় নি।

শিক্ষিত ঘোড়া, তাকে কিছু বলতে হল না। ঐ যে ঘর চল শুনেছিল, তাই ঘরের সামনে এসে থামল। এখানে এক সারি ঘর—এইসব ঘরে গাড়োয়ানরা থাকে। সামনের ফাঁকা জায়গাটায়

টাঙ্গাগুলো দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। তখনও একটা টাঙ্গা ওখানে দাঁড়িয়ে। লাল রঙের ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘাস ছোলা চিবুচ্ছে। সেখানে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে রেখে মাঝি বুড়ো গাড়োয়ানকে তার ঘরে এনে শুইয়ে দিল। শুয়ে পড়ে বুড়ো যেন একটু সস্তিলাভ করল।

কিছুক্ষণের মধ্যে একটা লোক গাড়োয়ানের কাছে এল দুটো টাকা চাইতে। মিনিট দুই বাদে আরও একজন এল ঐ ঘরে, বলল—সীতারামজী, কাল রাত্তির থেকে আমার একদম খাওয়া হয়নি, দুটো টাকা দিন। গাড়ির চাকাটা কদিন যাবৎ খারাপ হয়ে পড়ে আছে।

গাড়োয়ান সীতারাম তখন বিছানার তলা থেকে একটা দু'টাকার নোট বার করে ওদের একজনের হাতে দিয়ে বললো, এই নে, এই দুটো টাকাই মাত্র আছে। তোরা দু'জনে ভাগ করে নে।

টাকা দুটো নিয়ে ওরা দু'জন চলে যেতে মাঝি বললো, সীতারামজী, তোমার আজ খাওয়া হয় নি বলে মনে হচ্ছে! আসবার সময় তোমার জন্য কিছু ছাতু কিনে এনেছি—খেয়ে নাও।

সীতারাম বললো, তুই আমার জন্য ছাতু কিনে এনেছিস? খুব ভালো রে বেটা! আজ আমার খাওয়াই হতো না! ঐ দুটো টাকা যে ওদের দিলুম। ওরা খুব গরীব। ঠিক খেতে পায় না ওরা। আয় আমরা দুজনে মিলে ভাগ করে খাই।

মাঝি তাড়াতাড়ি বললো, না না, আমি বাড়ী থেকে খেয়ে এসেছি।

সে ভালভাবে বুঝতে পারল যে গাড়োয়ান এভাবে অনেককেই সাহায্য করে। ফলে নিজেরই ভালো করে আহার জোটে না। অপরকে সাহায্য করতে গিয়ে বুড়ো বয়সে এই ভগ্নপ্রাপ্ত শরীর নিয়ে ভুগছে।

দুপুরবেলায় কেউ বড় একটা ভাড়া করে না জটাধরের নৌকা। তাই পরদিন দুপুরে জটাধর ঘাটে একা বসে না থেকে এলো গাড়োয়ানের আস্তানায়। টাঙ্গাটা বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে ভাবলো, গাড়োয়ানজী নিশ্চয়ই আজ ঘরে আছে।

সীতারামের দেহ দুর্বল ও ভগ্ন ছিল কিন্তু তার ঘোড়াটা বেশ সবল ও তেজী। সাদা রঙের ঘোড়া, খুব সুন্দর দেখতে। আপাদমস্তকে তার কত সব অলংকার। সব নিয়ে টাঙ্গাটা এখনও বেশ মজবুত।

মাঝি ঘরে ঢুকতে গাড়োয়ান তাকে খাটিয়ার ওপর বসালো। বললো, বেটা, তুই আজো আমায় দেখতে এলি? আজ বুকটা এত ব্যথা করছে যে আজকে আর টাঙ্গা নিয়ে বেরোতে পারলাম না। এরকম আমার হয়ই। আজ না হলে কাল আবাব বেরোতে হবে। বেঁচে থাকতে আমি না চাইলেও পেটের জন্য তো ডাল রুটি দরকার—সেটা পাবো কোথায়?

কিছু কথাবার্তার পর মাঝি একসময় তার খাওয়ার কথা জিজ্ঞেস করলে সীতারাম বললো, হাঁ খাওয়া হয়েছে।

একটু পরে একটা খোঁড়া লোক বালতি হাতে ঐ ঘরে প্রবেশ করল। গায়ে তার ছেঁড়া গেঞ্জি। সেও টাকা চাইল গাড়োয়ানের কাছে।

গাড়োয়ান ঐ খোঁড়ার হাতে একটা টাকা দিয়ে বলল, একটা টাকা মাত্র হাতে আছে, আজ এই নিয়ে যা। অন্যদিন আবার আসিস।

খোঁড়া বিদায় নিতে মাঝি বলল, সীতারামজী, তুমি তো সব টাকা দান করে শেষ করলে। এবার বাঁচবে তুমি কেমন করে?

গাড়োয়ান উর্দ্ধে তর্জনী তুলে জানাল, বিশ্বনাথজী মিলিয়ে দেবেন! তারপর বলল, ঐ যে খোঁড়াটা আমার কাছে এল, ওর দুঃখ কিছু বুঝবি বেটা? ও আজন্ম খোঁড়া, ওকে ছোট থেকেই

দেখে আসছি। কেউ ওকে একটা কাজও দেয় নি। খোঁড়া বলে সবাই দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে। এখন ও একটা বড় খাটালে কাজ করে। মালিকও সুবিধে বুঝে ওকে দিয়ে বেশী খাটিয়ে নেয়, আর মাইনে যা দেয়, তাতে ওর চলেই না। তাই তো সে মাঝে মাঝে আমার কাছে আসে। খাটালের মালিক সব সময় ঐ খোঁড়াকে 'কাজ ছাঁটাই করে দেব' ভয় দেখিয়ে সিঁটিয়ে রেখেছে আর ওকেই বেশী খাটায়। খোঁড়া বেচারার না করে আর উপায় কি? কে আর তাকে নতুন চাকরি দেবে? ভোর চারটায় উঠে রাত পর্যন্ত সে খাটে। দুধের বালতি নিয়ে এই কাশী শহরে ঘোরে ঐ খোঁড়া পায়ে। আর সারারাত সে পড়ে থাকে ঐ খাটালের এক কোণে। কেন, কিসের জন্য ও আজ এত কষ্ট পাচ্ছে? ওর বাপ-মা-ই তো ওর সর্বনাশের জন্য সব দায়ী! বাপ মায়ের জন্যই তো ও আজ এই পৃথিবীতে সারা জীবন খুঁড়িয়ে মরছে!

জটাধর জীবনে দেবদুলালকে ছাড়া আর কাউকে প্রাণের বন্ধু হিসেবে পায় নি। সেই দেবদুলালকে হারিয়ে আজ যেন এই বুড়ো গাড়োয়ানকে প্রাণের বন্ধু হিসেবে পেল। সীতারামের প্রতিটি কথা মাঝি আজ অন্তর দিয়ে বুঝেছে। এই বুড়োর প্রতি একটা মমতায় মাঝির অন্তর ভরে গেল।

মাঝি এক সময় বলল—সীতারামজী, তুমি তো বুড়ো হয়েছ, শরীর তোমার ভেঙে পড়ছে। তাই তুমি টাঙ্গা নিয়ে এখন ঠিকমত বেরোতে পারছ না। তা তোমার টাঙ্গাটা আমাকে ভাড়া দাও না তোমাকে ন্যায্য পাওনা দেব। এতে তোমার ঠিক দুবেলা খাওয়ার জুটবে আর তোমার শীর্ণ শরীরটাও বিশ্রাম পাবে। এই বুড়ো বয়সে আর এই শরীর নিয়ে কি তোমার দিনরাত ঘোড়া ছুটিয়ে বেড়ান চলে? এখন তোমার একটু বিশ্রামে থাকা দরকার। নৌকার চেয়ে টাঙ্গায় আমারও একটু বেশি আয় হবে।

গাড়োয়ান আগের দিন মাঝির পরিচয় পেয়েছিল। এখন সে আনন্দে বলল, হ্যাঁ, তাই কর বেটা। বুড়ো হয়ে গিয়ে আমি আর সব পেরে উঠি না। দুপুর রোদে ঘুরতে হয়! বেটা, তুই বরং গাড়ীটা নে আর আমার ডাল-রুটি খাওয়ার মত কিছু দিস।

পরদিন দুপুরবেলায় যখন মাঝি এই গাড়োয়ানের আস্তানায় এল, তখন দেখতে পেল গাড়োয়ানজী তার সাদা ঘোড়াটাকে ছোলা খাওয়াচ্ছে। আর সেই ঘোড়ার গায়ে ও মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করছে।

গাড়োয়ান মাঝিকে দেখতে পেয়ে বলল, বেটা তুই এসে গেছিস? চল তবে আমার টাঙ্গায় করে একটু ঘুরে আসবি আজ। বলে সে আবার তার ঘোড়াকে খুব আদর করতে লাগল। আদর করতে করতে ঘোড়াকে জড়িয়ে ধরল।

মাঝি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রভু আর অশ্বের দৃশ্য দেখছে।

গাড়োয়ান ঘোড়াকে আদর করতে করতে বলল, এ আমার বহুদিনের সাথী, এ আমার জীবনের সাথী। আমি নিজে না খেয়েও একে খাওয়াই একে একটুও কষ্ট দিই না। এক ঘা চাবুকও মারি না। যার জন্য আমার টাঙ্গায় তো চাবুক নেই একটাও। এই ঘোড়া আমার টাঙ্গার চির দিনের সাথী। বলতে গেলে এ-ই তো আমায় খাওয়াচ্ছে। এ বসে থাকলে ডাল-রুটি আসবে কোথা থেকে?

মাঝি জিজ্ঞেস করলো তোমার ঘোড়াটা কত টাকায় কেনা?

গাড়োয়ানজী জানালো, মাত্র দশ টাকায় কিনেছিলাম। তখন তো একদম বাচ্চা। তারপর আমার হাতে খেয়ে খেয়ে বড়ো হয়ে উঠছে এখন। একদিন এক বড়লোকবাবু একে পাঁচ হাজার টাকায় কিনতে চায়। এক লাখ টাকা দিলেও আমি একে বেচবো না কোনদিনই। এই ঘোড়া আমায় ডাল-রুটি যোগায়। এ-ই আবার একদিন আমার মৃতদেহ নিয়ে যাবে।

বলতে বলতে সে মাঝির একটা হাত জড়িয়ে ধরলো, তারপর ঝরঝর করে কাঁদতে কাঁদতে বললো, আমি যেদিন মরে যাবো বেটা, সেদিন তুই আমার ঘোড়াকে বলে দিবি তোর প্রভু মরে গেছে রে আজ ! দেখবি এ ঠিক বুঝবে। আর আমার মৃতদেহটা তোরা একে দিয়েই বয়ে নিয়ে যাবি শ্মশানঘাটে। ঠিক নিয়ে যাবি তোরে বেটা ? চল তবে, এখানকার রাস্তাঘাট আর ঘোড়া চালানো একটু দেখিয়ে দিই তোকে। এবার থেকে তুই-ই আমার টাঙ্গা চালাবি।

মাঝি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে টাঙ্গায় উঠে বসলো। পর পর তিন-চার দিন সে ঐভাবে গাড়োয়ানের পাশে পাশে থেকে অনেক কিছু শিখে নিল।

মাঝি গাড়োয়ানের কাছ থেকে তার অতীত জীবনটা শুনেছে।

সীতারাম বিহারী। বিহারের এক গ্রামে দরিদ্র পরিবারে তার জন্ম। স্কুলে কিছুদূর পর্যন্ত লেখাপড়া শিখে স্কুল ছেড়ে দিতে হলো তাকে দারিদ্র্যের জন্য। তার তখন মজবুত স্বাস্থ্য ছিল বলে এক বড়োলোকের গৃহে চাকরের কাজ পেয়েছিল।

সেখানে তার কেটে গেল পাঁচটি বছর। সে ভালই খেতে-পরতে পেতো সেখানে। মাইনের সব টাকাই সে বাড়িতে পাঠিয়ে দিতো। সীতারাম বিশ্বাসী ছিল, এবং দরদ দিয়ে করতো প্রভুর সব কাজ। কিন্তু একদিন শেষে তার কপালেই এসে জুটলো মিথ্যে কলঙ্কের কালিমা।

রাজু বলে অপর একজন ঐ বাড়ীর চাকর প্রভু কন্যার মূল্যবান হারটি চুরি করে লুকিয়ে রেখে দিয়েছিল সীতারামের ছিন্ন বিছানার তলায়। রাজু ছুটি নিয়েছিল দেশে যাবার জন্যে। সেই সঙ্গে ঐ হারটি নিয়ে পলায়ন করবার মতলব এঁটেছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে হার চুরি গেছে। জানাজানি হয়ে যাওয়ায় বাড়ীর লোকেরা পুলিশে সংবাদ দেয়। পুলিশ এসে চাকরদের

ঘর তল্লাশ করতে গিয়ে সীতারামের বিছানার তলা থেকে উদ্ধার করলো সেই হারটি। হায়, সীতারাম কত নির্দোষ! অথচ তাকেই সশ্রম জেল খাটতে হলো দীর্ঘদিন।

এমন কি সীতারামের বাবা মা-ও ছেলেকে ভাবলেন চোর, জেল থেকে ফিরতেই ছেলেকে মারধোর করে তাড়িয়ে দিলেন। ওখানে আর কেউ-ই ওকে কোনো কাজ দিল না। সবাই তাড়িয়ে দিল 'চোর' বলে।

পথে ঘুরতে ঘুবতে একদিন সে এসে পৌছালো কাশীতে। প্রথমে থাকতো স্টেশনে। শেষে সীতারাম একটা কাজ পেয়ে যায় অশ্বশালয়। ঘোড়ার মলমূত্র পরিষ্কার করা, ঘোড়া চান করানো, ঘোড়াকে খাওয়ানো—এইসব তার কাজ! ঐ কাজটা পাওয়ার পর অশ্বশালার কাছেই তার একটা থাকবার জায়গা জুটে গেল।

এইভাবে কয়েকটা বছর থাকবার পর সীতারাম একদিন একটা ছ'মাসের বাচ্চা ঘোড়া কেনে। ঐ ঘোড়াটি কিসে একটা আঘাত পেয়ে শেষে সে মরে যাবার উপক্রম হলে তার প্রভু ঘোড়াটাকে বেচে দেয় সস্তায়। কিন্তু সীতারাম ঘোড়া কিনে একদম ঠকে নি। কিছুদিনের মধ্যেই সে আবার সুস্থ হয়ে উঠেছিল। তার পর সেটাকে সে নিজের পয়সায় খাইয়ে খাইয়ে বড় করে তুলেছে। আজ সেই ঘোড়াটাই সীতারামের টাঙ্গা টানছে।

বড়ো করে তোলার পর তার নিজের টাকায় আর অল্প কিছু ধার করে সীতারাম একটা গাড়ি যোগাড় করে তাতে ঘোড়াটাকে নিয়োগ করেছে। অতঃপর সে ঐ চাকরি ছেড়ে দিয়ে আজ পর্যন্ত টাঙ্গা ছুটিয়ে যাচ্ছে।

সেই যে সীতারাম ঘর থেকে বিতাড়িত হয়েছিল, আর কক্ষনো বাপের মাটিতে পা দেয় নি। কোনোদিন আর বাবা-মা-র মুখ দেখে

নি। সে ঈশ্বর মানে, কিন্তু সমস্যা-শোক-যাতনা-জরা-ব্যাধি-মৃত্যুর জন্য ঈশ্বরকে দায়ী করে না, বা প্রকৃতিকে না, বা অদৃষ্টকেও না। সে এগুলোর জন্য সম্পূর্ণ দায়ী করে পিতা-মাতাকে। কারণ, সীতারাম জন্মাতে চায় নি। সে না জন্মালে এই জগতে কার কি ক্ষতি হতো? সে টাঙ্গা না চালালে এ জগতে কি কোথাও কোনো টাঙ্গাগাড়ি চলতো না? সে কোনো পিতামাতাকেই গ্রাহ্য করে না। বিবাহ-নামক একটা মুকুট মাথায় চাপিয়ে ওরা সাধু সেজে রয়েছে প্রত্যেক গৃহেই বিবাহ-ঘটিত ব্যাপারটাই ওদের একমাত্র রক্ষাকবচ! সীতারাম তো কোনো আদমীকে কষ্ট দিচ্ছে না, পৃথিবীর কেউই সীতারামের জন্য জন্মে নরক-যাতনা ভোগ করছে না। সীতারাম সামান্য আত্মসুখের জন্য এতখানি পশু নয়—তবে সে আজ এত কষ্ট পাচ্ছে কেন?

সেইজন্য সীতারাম আজ সবাইকে সাহায্য করে না। যারা আজ পর্যন্ত পিতামাতা হয় নি, তারাই একমাত্র সীতারামের সাহায্য পাবার যোগ্য বা যোগ্যা। নচেৎ কেউ মরে গেলেও তাকে সাহায্য করবে না সে কোনো প্রকারে।

জটাধর এখন গাড়োয়ানজীর টাঙ্গা চালায়। নিজের নৌকাটি ভাড়া দিয়েছে। এতে জটাধরের আয় নৌকার চেয়ে বেশী হয় এবং তার কায়িক শ্রমও কম হয়। দাঁড় টানতে যে শক্তি লাগে, টাঙ্গায় তো তা লাগে না। গাড়োয়ানজী বলে দিয়েছে তার মৃত্যুর পর তার ঘোড়া আর টাঙ্গা জটাধর পাবে। দু-তিন দিন অন্তর অন্তর জটাধর গাড়োয়ানকে কিছু করে টাকা দেয়—যাতে তার আহার যেন ঠিকভাবে জোটে। একসঙ্গে সব টাকা দিলে সে হয়তো দান করেই সব বসে থাকবে!

জটাধর একদিন তাপসীকে বললো, পুষ্প ! চল্‌, তোর এক দাদুকে দেখে আসবি। সে তোর কথা জিজ্ঞেস করে—

তাপসীর সুন্দর মুখের রেখাগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠলো। আশ্চর্য হয়ে বললো, দাদু ! কোথায় থাকে ?

চল না, দেখতে পাবি। দাদুর সুন্দর একটা সাদা ঘোড়া আছে।

তাপসী কাশীতে অনেক ঘোড়া-টোড়া দেখেছে। ঘোড়া দেখার তার বেশী শখ নেই। উপরন্তু, দিনের বেলায় সে বেরোতে চায় না। তার বেশী ভয়—তার বাবা পুলিসে খবব দিয়ে থাকলে পুলিসের চোখে যদি একবার সে কোনোক্রমে পড়ে যায় ! —তা হলে তাকে আবার সেই বাঘিনীর কাছে ফিরে যেতে হবে !

তাপসী প্রথমে রাজী হয় নি যেতে। শেষে তার কাকুর কথায় রাজী হলো। ভাগ্যিস সেদিন সে তাব অনেক পুণ্যবলে দাদু দেখতে গিয়েছিল—তাই সারাজীবনের জন্য তার একটা নতুন অভিজ্ঞতা জন্মেছে।

গাড়োয়ানজীর কথা তাপসী আজ প্রথম শুনলো। সে জানেও না যে, তার কাকাও এখন একজন গাড়োয়ান।

গাড়োয়ানজীর ঘরে পৌছে তাপসী দেখতে পেল, ষাট বছরের কাছাকাছি একটি বুড়ো খাটিয়ায় শুয়ে আছে। মাথার চুল পক্ক, ভগ্ন দেহ।

গাড়োয়ান ওদের দেখতে পেয়ে খাটিয়ায় বসে বললো, আও বেটী, আও ! জটাধর তাপসীকে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করে অপর একটি খাটিয়ায় বসলে। তারপর সে তাপসীকে তার ভ্রাতুষ্পুত্রী বলে পরিচয় দিল। এই একটি কথাই কেবল জটাধরকে মিথ্যে বলতে হয়। উপায় নেই

গাড়োয়ান বললো, বেটী, আমায় তো তবু দেখতে এলি। কি নাম বেটী ?

তাপসী তার ছদ্ম নামটা বললো। জটাধর জিজ্ঞেস করলো, সীতারামজী, তোমার শরীরটা আজ কেমন? ভালো আছে তো?

সীতারাম বললো, আর ভালো! দুটো পশুর আত্মসুখের কাছেই তো বলি হয়েছি আমি। ঐ পশু দুটোর জন্যই তো আজ আমার এই দশা! ওরাই একদিন আমার দেহে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল ওদের সেই বিষ আজও আমার রক্তে! না মৃত্যু হওয়া পর্যন্ত এ বিষের জ্বালা আর আমার জুড়োবে না। যাক গে! বেটা, তুই আমার জন্য কেন এত কষ্ট করছিস, কেন এত খরচ করছিস? কাশীর বিশ্বনাথজীর চরণে স্থান পেলে বাঁচি!

বলতে বলতে সে উঠে গিয়ে একটা শালপাতার ঠোঙা নিয়ে এসে তাপসীর হাতে দিয়ে বললো, বেটী সন্দেশ খাও।

জটাধর দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি বললো, এ কি সীতারামজী! একে আবার সন্দেশ দিচ্ছ কেন? তোমার নিজেরই এখন ভালো ভালো খাওয়া দরকার।

সীতারাম বললো, না, আমি ওকে দিয়েছি। বিশেষ তো কিছু নয় চারটে মাত্র ক্ষীরের সন্দেশ। আজ সকালে সেই খোঁড়া গোয়ালাটা আমার অসুখ শুনে দেখতে এসে পাঁচখানা ক্ষীরের সন্দেশ দিয়ে গেছে। একটা আমাকে জোর করে খাওয়ালো, আর এই বাকী চারটে আছে। বেটী, তুমি খাও।

জটাধর শুনে বললে—সেই খোঁড়া গোয়ালাটা!

সীতারাম বললো, হ্যাঁ। ওদের খাটালে অনেক কিছু তৈরী হয় বটে কিন্তু ও কোনো জিনিস চুরি করে না, আমি তা জানি। কালকে নাকি ওর মালিকের জন্মদিন ছিল তাই সব গোয়ালাদের কাল পাঁচটা করে ক্ষীরের সন্দেশ খাওয়ানো হয়েছে। খোঁড়া ওর নিজের ভাগেরটা আজ সকালে আমায় দিয়ে গেল। আমি তো ওকে অনেক সাহায্য করি।

ঠিক আছে, ও তো বাড়ীতে খায়, এটা তোমার জন্য থাক, জটাধর বললো।

বুড়োর চোখ দুটো ছলছল করে উঠলো। বললো, না, না, আমি তো একে সামান্য ক'টা সন্দেশ দিয়েছি। ও না খেলে আমি সত্যি ফেলে দেবো।

আচ্ছা বাবা আচ্ছা, জটাধর বললো, পুষ্প খাবে। এই পুষ্প খেয়ে নে তো তোর দাদু রাগ করছে! সীতারামজী, তুমি এখন বেশী কথা বলবে না, তোমার এখন পুরো বিশ্রাম দরকার। ডাক্তারবাবু তো তোমায় বলেছে।

এমন সময় একটা তেরো-চোদ্দ বছরের ছেলে ঐ ঘরে প্রবেশ করে একটা ওষুধের শিশি নামিয়ে রেখে বললো, দাদু, এখনও একটা ওষুধ বাকী রইলো—আরো দু'টাকা লাগবে।

গাড়োয়ানজী শুনলো বটে, কিন্তু সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ করলো না। যেন তার আর কোনো ওষুধ খাওয়ার প্রয়োজন নেই। এইভাবে সে তাপসীকে বললো, আয় বেটী, একটু পাশে বস।

ছেলেটাকে চোখের ইশারায় বাইরে ডেকে নিয়ে গেল জটাধর! বাইরে এনে তাকে জিজ্ঞেস করলো, গাড়োয়ানজী কাল রাত্রে কেমন ছিল রে?

ছেলেটি বললো, ভালো না। ওষুধপত্র তো দাদু খেতে চায় না। তারপর কি সব বকছিল। কে দুটো শয়তান নাকি তার সর্বনাশ করেছে, সেই শয়তান দুটোকে দাদু ঘোড়ার তলায় পিষে মারবে।

এই নে দুটো টাকা। বলে পকেট থেকে দু'টাকা বার করে জটাধর তার হাতে দিল। বললো, যা, ওষুধটা নিয়ে আয়! আর টাকা পয়সা লাগলে চাইবি। এখানে সব সময় কেউ না কেউ আছে তো?

হ্যাঁ! আমরা তো পালা করে আছি, দেখাশোনা করছি।

বলে টাকা নিয়ে ওষুধ কিনতে চলে গেল ছেলেটা।

জটাধর আবার ঘরে প্রবেশ করলো।

তাপসী মাত্র দুটো সন্দেশ তুলে নিয়ে খেয়েছে।

গত কয়েকদিন ধরে গাড়োয়ানজী হৃদরোগে আক্রান্ত। জটাধর বেশী টাকা ফী দিয়ে ভালো ডাক্তার নিয়ে এসেছে, ওষুধপত্র ও অন্যান্য খরচ সে বহন করেছে। গাড়োয়ানজী ঘর থেকে কোথাও বেরোয় না, খাটিয়ায় শুয়ে থাকে! ডাক্তার দীর্ঘ সময়ের জন্য পূর্ণ বিশ্রাম নিতে বলেছেন। তাকে আবার বাঁচিয়ে তোলবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে জটাধর। গাড়োয়ানজীর কাছ থেকে যারা সাহায্য পায়, তাদের মধ্যে কয়েকজন আজ পালা করে তাকে সেবা করছে। কিন্তু আজ আর কী হবে! ভাঙা কাচের গ্লাসকে তো আর জোড়া লাগানো যায় না রং লাগিয়ে।

গাড়োয়ানজী আবার খাটিয়ায় শুয়ে পড়েছে, বাঁ হাত তার বুকের উপর রাখা। সে তাপসীকে ডাকতে তাপসী উঠে এসে খাটিয়ার একধারে বসলো।

গাড়োয়ানজী তার শীর্ণ দীর্ঘ আঙুল দিয়ে তাপসীর একটা হাত ধরে নিজের বুকের উপর রাখলো এবং বলল, বেটি, তোকে আমার খুব ভাল লাগছে। তোকে অনেক কিছু খাওয়াতে ইচ্ছে করছে। মাঝে মাঝে তুই আমাকে দেখতে আসবি তো তোর কাকার সাথে? দ্যাখ—এখন তোকে কত ভালো লাগছে, তোর জন্য আমি মরে যেতেও পারি - আবার যদি কোনদিন তুই সন্তানের জন্ম দিস, সে দিন তোকে একটুও ভালবাসবো না, তোকে আমার একটুও ভালো লাগবে না। তোকে আজ কত সুন্দর লাগছে! আমি তো আমার বাবা-মাকে জীবনে কোনোদিনই ক্ষমা করিনি, মরে গেলেও করবো না। আজকে আমার জরা-ব্যাধির জন্য সম্পূর্ণ ঐ

দু'জনাই দায়ী।

জটাধর তখন বললো, থাক সীতারামজী, একে আর এইসব বুঝিয়ে দরকার কি।

এখানকার ব্যাপার-স্যাপার অদ্ভুত লাগছে তাপসীর। অন্যের দুঃখ দেখলে তাপসীর বড়ো কষ্ট হয়, চোখে জল আসে। এই বৃদ্ধের করুণ দৃশ্য দেখে তারও চোখ ভিজে আসতে চাইছে, কিন্তু সে অনেক কষ্টে সংবরণ করছে।

সীতারাম আবার বললো, কেন এ বেটী জানবে না? এই বেটীরও কিছু বোঝা দরকার। চালাকি নাকি! বাপ-মায়েরা জন্ম দিয়ে পৃথিবীতে চিরকাল ধরে যা খুশী তাই করে এসেছে, আর আমরা যেন হয়ে গেছি ভিখিরি!

জটাধর দেখলো, গাড়োয়ান হৃদ্‌-রোগী! একে বেশী উত্তেজিত হতে দেওয়া মোটেই ভালো না। তাই বললো—আচ্ছা সীতারামজী, আজ আমরা চললাম। একে রেখে দিয়ে আসি।

গাড়োয়ানজী বললো, চলে যাবি তোরা এখন? চলে যাবি বেটী? বলতে বলতে সে পুষ্পর একটি হাত নিয়ে সজল নয়নে বললো, বেটী, কাল আবার আমায় দেখতে আসবি তো? এই বুড়োকে একটু মনে রাখবি?

তাপসী কি বলবে খুঁজে পেল না। একটু পরে বললো কাকু যদি নিয়ে আসে আসবো।

জটাধর তাপসীকে বাইরে ঘোড়ার আস্তানায় নিয়ে এলো। সেখানে একটা সাদা ও দুটো লাল ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। সাদা ঘোড়াটার কাছে এসে জটাধর বললো, এটা এই দাদুর ঘোড়া।

ঘোড়াটা জটাধরকে দেখেই চিনতে পারলো। অমনি সে মাথাটা অল্প নাড়া দিল, সামনের ও পিছনের দুটো পা একবার করে মাটিতে ঠুকলো, লেজও দোলা দিল। ছড়িয়ে পড়ল চামমের

মতো তার লেজের কেশ। অর্থাৎ সে যেন ভেবে নিয়েছে তাকে এক্ষুনি আবার ছুটতে হবে।

তাপসী তার নরম আঙুল দিয়ে ঘোড়ার রেশমের মতো গায়ে স্পর্শ দিল। জটাধর বললো, চল, এবার আমরা বাড়ী যাই।

তাপসী ডাকল, কাকু—

কি রে?

তাপসী ফিসফিস করে বায়না করার মতন বললো, আমি এর পিঠে একটু চড়বো!

আজ না অন্যদিন।

তাপসী আর কোনোদিনই গাড়োয়ানজীকে দেখতে আসতে পারবে না। গত রাতের শেষেই হৃদ্‌রোগে সাঙ্গ হয়ে গেছে তার ইহলীলা। তাপসী কোনোদিন কাঁদে না। কিন্তু আজকে এই গাড়োয়ানের মৃতদেহের পাশে দাঁড়িয়ে কেঁদে ফেললো। সে যে কাল কত আদর করে তাপসীকে ক্ষীরের সন্দেশ খাইয়েছে!

জটাধরের একমাত্র প্রাণের বন্ধু ছিল দেবদুলাল। আজ সে তার দ্বিতীয় প্রাণের বন্ধুকে হারালো। জটাধরও কান্না ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু আজ তার চোখ বাধা মানছে না।

একটা মাল টানা ঘোড়ার গাড়ি যোগাড় করে তাতে গাড়োয়ানজীর মৃতদেহটা তুলে দিয়ে ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে ঐ গাড়ির ঘোটকীটাকে বাদ দিয়ে তাতে জুড়ে দেওয়া হয়েছে গাড়োয়ানের শ্বেত ঘোড়াটিকে। সেও আজ তার প্রভুর শোকে শোকাচ্ছন্ন বদনে দণ্ডায়মান!

যারা যারা গাড়োয়ানজীর সাহায্য পেয়েছে, তাকে যারা যারা ভালবাসে তারা সবাই পায়ে পায়ে গাড়ির পিছু পিছু হেঁটে চললো গঙ্গার ঘাটের দিকে। নগণ্য টাঙ্গাওয়ালার মৃতদেহ তুলে দেওয়া হলো চিতায়। দেখতে দেখতে দাউদাউ করে জ্বলে উঠল চিতাবহ্নি।

॥ ছয় ॥

সুবীর অনেকক্ষণ ধরে বন্দী হয়ে রয়েছে ষ্টীমারের ঐ খুপরীর মধ্যে। সকাল হয়ে আসছে, ঐ খুপরীর অন্ধকার কেটে কোথা থেকে একফালি ভোরের মৃদু আলো এসে পড়েছে। সুবীর এদিক ওদিক তাকাতে তার চোখে পড়লো ঘরের উপর একটা সংকীর্ণ ফোকর। ওখানে উঠতে পারলে একটা মানুষ কোনোক্রমে ওখান দিয়ে গলে যেতে পারবে।

মুক্তির একটু আলো দেখে সুবীর তৎক্ষণাৎ সক্রিয় হয়ে উঠলো, এবং ওখান থেকে বাইরে আসবার জন্য উপায় নির্ধারণ করতে লাগলো।

চোখে যে জিনিষটা প্রথমে পড়লো, সেটা ক্যাম্প খাট। সুবীর অমনি খাটটাকে দু-ভাঁজ করে দেওয়ালের গায়ে দাঁড় করিয়ে দিল খাড়া করে, কিন্তু উঠতে গিয়ে বেশ বেগ পেতে হলো। কয়েকবার চেষ্টা করার পর অনেক কষ্টে সে উঠে গেল ফোকর পর্যন্ত। তারপর ওখান থেকে একহাত ব্যবধানে সে একটা ঝুলন্ত দড়ি দেখতে পেল। সুবীর অমন কাঁচা ছেলে নয় যে, সে অমনি তরতর করে দড়ি বেয়ে নেমে পড়বে। দড়ির অপর প্রান্ত ভালো করে বাঁধা আছে দেখে তবে সে ধীরে ধীরে নেমে পড়ল নীচে।

সুবীর যেখানে নৌকাটাকে বেঁধে রেখেছিল, ঘুরে ঘুরে সেখানে এসে উপস্থিত হলো। সেখানে নকুল বলে সেই লোকটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেল। নকুল বেশ একটু চিন্তামগ্ন, সুবীরকে দেখে বললো আরে তুমি! তোমার সাথে ঐ মেয়েটি

বোধ হয় তোমারই বোন সর্বনাশ হয়ে গেছে! ঐ শালা ক্যাপ্টেনের কাজ।

সুবীর প্রথমেই জিজ্ঞেস করলো, ও এখন কোথায় জানেন?

নকুল বললো, ক্যাপ্টেন তোমার বোনকে এখান থেকে সরিয়েছে। আমি দেখেছি। এ ষ্টিমারে খুঁজে এখন তাকে কোথাও পাবে না!

সুবীর ব্যগ্রকণ্ঠে বললো—তবে ও এখন কোথায়?

নকুল উত্তর দিল, এতক্ষণে ডাঙায় পৌঁছে গেছে খানিকক্ষণ আগে অন্ধকার থাকতে থাকতে একটা মেয়েকে ধরাধরি করে নৌকায় তুলে নিয়ে যাওয়া হলো। দেখে তখনই আমি বুঝতে পেরেছি তোমদের অবস্থাটা।

সুবীর জবাব দিল, আমার বোনকে না নিয়ে আমি একা ঘরে ফিরবো না। বোনকে বাঁচাতেই হবে! প্রাণ থাকতে আমি কাপুরুষ নই!

ঐ লোকটা বললো, নিশ্চয়, নিশ্চয়! কিন্তু শোনো ভাই, আমার কাছে ব্যাপারটা শুনে যাও। বলে সুবীরের একটা হাত ধরে তাকে একটু আড়ালে এনে আবার বললে, শোনো ভাই, তোমাকে আমি সাহায্য করবো। আমাকে তুমি ভাই ভাবতে পারো। কাল রাত্রে তোমাদের যখন প্রথম দেখি, তেমোদের বাঁচাতে চেয়েছি। আমি সত্যিই চাই নি যে, ক্যাপ্টেনের সাথে তোমাদের দেখা হোক। তোমরা যখন খালাসীদের সাথে চললে, তখন তোমাদের আমি নিষেধ করতে গেছি, কিন্তু তোমরা তখন খানিকদূর চলে গেছো—তা ছাড়া কয়েকজন খালাসীও তখন তোমাদের সাথে। তার পর সরারাত ধরে তোমাদের কথা চিন্তা করেছি, সত্যি আমি গত রাত্রে ঘুমোই নি, ভেবেছি শুধু তোমাদের কথা—কোনো একটা কাণ্ড যেন আবার না ঘটে! ঠিক যা ভেবেছি তা-ই হলো। দেখলাম, অন্ধকারের মধ্যে জনাচারেক লোক একটা মেয়েকে ধরাধরি

করে নিয়ে গিয়ে নৌকায় তুললো সঙ্গে সঙ্গে ওরা নৌকা নিয়ে চলে গেল স্টীমার ছেড়ে। তখন আর ব্যাপার বুঝে নিতে আমার দেরী হয় নি।

সুবীর বললো, এখানে দাঁড়িয়ে কথাবার্তায় সময় নষ্ট না করে নৌকা নিয়ে রওনা দিলে হয় না? কিংবা এখন গিয়ে পুলিসে একটা খবর দিলে

নকুল হাত নেড়ে জানালো কোনো লাভ নেই, কোনো লাভ নেই! তুমি জানো না, ক্যাপ্টেনটা কত বড়ো শয়তান! তুমি ভাবছো যে, আমি তোমার বোনকে বাঁচাতে পারি নি কেন? দেখবে—বলতে বলতে এদিক ওদিক একবার তাকিয়ে নিয়ে সে কোমর থেকে বার করলো একটা লুকোনো পিস্তল। পিস্তল দেখে সুবীর চমকে উঠলো। সে আবার বললো, এই পিস্তলে ঐ চারটেকে সাবড়ে দিতে পারতুম! কিন্তু অন্ধকারে গুলি ছুঁড়লে কাকে লাগবে তার তো ঠিক নেই। হয়তো তোমার বোনের গায়েই! তারপর তোমার অবস্থাটা বুঝে নিতে আমার একটুও কষ্ট হয় নি। ঐ তিন নম্বর ঘরটিই এই স্টীমারের ফাঁদ এখানে একবার পা দিয়েছো তো! যাই হোক, সেই অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে তোমাকে বাঁচাবার একটা উপায় তখুনি ঠিক করলাম। অমনি একটা মোটা দড়ি নিয়ে স্টীমারের ছাদে উঠে বেঁধে ঝুলিয়ে দিলাম দড়িটাকে ঠিক তোমার ঐ ঘরের ফোকরটার পাশ দিয়ে যাতে তুমি—

সুবীরের কণ্ঠে বিস্ময় ফুটে উঠলো, তবে আপনি ঐ দড়িটা বেঁধেছেন!

নকুল বললো, হ্যাঁ ভাই, আমি!

পিস্তল দেখানোর পর সে ওটাকে আবার যথাস্থানে রেখে দিয়েছে। হঠাৎ একটু সন্ত্রস্ত হয়ে বললো, আর না ভাই—এখানে স্টীমার অল্পক্ষণের মধ্যে ল্যাণ্ড করবে—বজবজ এসে গেল! চলো

এবার আমরা এখান থেকে সরে পড়ি। আর ঐ বাঁধা লোকটা তোমার কি ··?

গত রাত্রে সুবীর যে অন্য কথা বলেছে। এখন তাই একটু আমতা আমতা করে বললো, হ্যাঁ।—

ওরা দু'জনে নৌকা নিয়ে স্টিমার ছেড়ে দূরে চলে এসেছে। সুবীর দাঁড় টানছে জোরে। নকুল বললো, তোমার সাথে যখন নৌকা রয়েছে তখন ভুল করে বোনকে নিয়ে স্টিমারে উঠতে গেলে কেন?

দাঁড় টানতে টানতে সুবীর বললো, ঠিক ভুল করে নয়?

বুঝেছি! কোন বিপদে পড়ে। আচ্ছা, তোমার কাছে এখন কোনো অস্ত্র আছে?

এই কথা শুনে সুবীরের নিজের ওপর দারুন রাগ চড়ে গেল। আঃ, গত রাত্রে বন্দুকটা কেন তার কাঁধ থেকে পড়ে গেল জলে! তা না হলে সে এক্ষুণি এক গুলিতে কাপ্তেনের মাথার খুলি উড়িয়ে দিতো! দুঃখের স্বরে বললো, এখন নেই, কাল রাত্রিরে একসময় একটা তাবু ছিল। আচ্ছা, আপনি সব সময় কোমরে পিস্তল রাখেন?

হ্যাঁ। এখন রাখি বলতে বলতে সে একটু বেশ জোর দিয়ে বললো, ঐ কাপ্টেনকে আমি খতম করে দেবোই। ও-ই তো আমার সব সর্বনাশ করেছে! তুমি জানো না ঐ কাপ্তেন-শয়তান লোক নিয়ে আমাদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে, সেই সঙ্গে আমার বোন ও স্ত্রী পুড়ে মরেছে!

আশ্চর্য্য হয়ে সুবীর বললো, সে কী!

হ্যাঁ, তাই করেছে শয়তানটা। ওকেও কি আমি ছেড়ে দেবো নাকি। আমার সুন্দরী বউকে সে হাতে আনতে পারে নি, আমার সুন্দরী বোনকে বিয়ে করতে পারে নি—তাই আক্রোশের জ্বালায় আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। ক্যাপ্টেনের সাথে আগে আমার খুব ভাব

ছিল, ও আমার বাড়ী এসেছে। আমিও ওর বাড়ী গেছি। কিন্তু তখন কি জানতাম, ও এত বড়ো একটা জ্যান্ত শয়তান। আচ্ছা আমিও দেখে নেবো! বাগে পাবো না কোনদিন! সেদিন দেবো সাবড়ে! আজ এক বছর ধরে আমি পিস্তল নিয়ে ওর পিছনে ছায়ার মতো ঘুরছি। কিন্তু পাচ্ছি না বাগে শয়তানটা যে সামনে পিছনে দৃষ্টি রেখে চলে সব সময়।

বজবজের কিনারায় ওরা নৌকা ভেড়ালো। তারপর নৌকা বেঁধে রেখে ওরা হাঁটতে লাগলো দু'জনে।

হাঁটাত হাঁটতে নকুল বললো, ক্যাপ্টেনের এখানে একটা বাড়ী আছে। ঐ বাড়ীতে সম্ভবতঃ তোমার বোনকে আনা হয়েছে। চলো ওখানে গিয়ে প্রথমে একবার দেখে আসি: আমার ধারণা ভুল না হলে, ওখানেই পাওয়া যাবে তোমার বোনটিকে। ক্যাপ্টেন-শয়তানের কোথায় কী আছে-আমার সব জানা!

সুবীর বললো, যে বাড়ীর কথা আপনি বলছেন, সেই বাড়ীর ভিতর কি আমাদের ঢুকতে দেবে?

ঠিক বলছো ভাই এ কথাটা। কিন্তু আমার এ-দেহটা একবার দেখেছো? যেমন করেই হোক, ভিতরে ঢুকতে হবে। তোমাকে যখন 'ভাই' বলেছি, তোমাকে সাহায্য করতে যখন এসেছি, তখন তোমাকে একা বিপদে ফেলে রেখে আমি অন্ততঃ পালাবো না।

ওরা একটা চায়ের দোকানে ঢুকে চা-বিস্কুট খেলো।

সাতটা বেজে গেছে। সোনালী রৌদ্র চারিদিকে। নকুল সুবীরকে নিয়ে একটা বাগান বাড়ীর সামনে এসে ঘোরাঘুরি করছে। এই বাড়ীটা কাপ্টেনের। সামনের দিকে খানিকটা বাগান, তার পরে বাড়ীটা। বাড়ীর সমস্ত জানালা বন্ধ, একেবারে নিস্তব্ধ বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে, এ বাড়ীর আবালবৃদ্ধ

এখন বুঝি প্রবাসে রয়েছে। বাড়ীটার সমস্ত অংশ ওরা দেখতে পাচ্ছে না। এই পয়াণ নিথর বাড়ীটার অভ্যন্তরেই লুকিয়ে রয়েছে কয়েকটি মূল্যবান রত্ন—যেমন রত্ন লুকিয়ে থাকে বালুকার অন্তরালে, কিন্তু এখানকার রত্ন সমুদ্রগর্ভের নয় রক্তমাংসের।

এই বাড়ীব বাইরের গেটের উল্টোদিকে কিছুক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে নকুল আর সুবীর। কি করে ভিতরে ঢোকা যায় তাই ওবা ভাবছে। একসময় ওরা দেখতে পেল, একটা গোয়ালার ছেলে বালতি হাতে নিয়ে ঐ গেটের মধ্যের গেট দিয়ে মাথা গলে বেরিয়ে এল।

এই চোখ-কান-বোজা বাড়ীর লোকেরাও দুগ্ধপান করে দেখছি! নকুল বললো, চলো আমরা ভিতরে ঢুকে দেখি। বলে সুবীরকে নিয়ে সে ঐ মধ্যকার গেটটি দিয়ে গলে ভিতরে প্রবেশ করলো।

গেটের পাশেই একটা টুলের উপর বসে আছে একটি নেপালী দ্বাররক্ষী। সে তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ভিন্ন ভাষায় বললো. কি চাই?

নকুল বলবার কথা সব ঠিক করে রেখেছে, বললো, ক্যাপ্টেনবাবু আমাদের এইসময়ে আসতে বলেছিলেন, আছেন তিনি?

নেপালী বললো, নেই তিনি। আপনারা এখন যান।

ক্যাপ্টেনবাবু এইসময়ে এখানে একবার দেখা করতে বলে দিয়েছেন যে, তাই তো আমরা এসছি! আমাদের যে দেখা করা খুব বেশী দরকার! একটা চিঠিও দিয়েছেন সেটিও সাথে আছে।

বলতে বলতে নকুল তার দুটো পকেট হাতড়াতে লাগলো পকেট হাতড়ে কিছু না পেয়ে সুবীরকে বললো, ঐ যাঃ! বাড়ীতে তা ভুলে ফেলে এসেছি! কী ভুলো মন যে হয়েছে আজকাল।

এমনভাবে বলছে যেন সে সত্যিই চিঠি ফেলে এসেছে। তারপর নেপালীকে বললো, আমরা এখানে ক্যাপ্টেনবাবুর জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করছি।

নেপালী অবিলম্বে বললো, না বাবু, এক ঘণ্টা আপনারা বাইরে কোথাও ঘুরে আসুন। তারপর আসবেন, তখন দেখা হতে পারে। কাপ্তেনজীর আজ আসবার কথা, আপনারা এক ঘণ্টা বাদ আসুন।

নকুল বললো, এই অচেনা জায়গায় আমরা আর কোথায় ঘুরবো! আমরা বরং এইখানটায় বসে আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করছি। এর মধ্যে তিনি না এলে আমরা চলে যাবো।

নেপালীর কী মন গেল সামনের বেঞ্চে ওদের বসতে বললো

বেঞ্চে বসে ওরা দু'জনে মাঝে মাঝে আড়চোখে বাড়ীটার দিকে তাকাচ্ছে। আবার নেপালীকেও দেখছে। নেপালীটি বেঁটেখাটো, নাক থ্যাবড়া। চোখগুলো ছোট ছোট ও গোল গোল, মাথার চুল সব ছোট করে ছাঁটা, মুখে পাকানো গোঁফ। খাকী পোশাক পরিহিত। কিন্তু ওর হাতে কোনো বন্দুক নেই। ওর কোমরে অবশ্য একটি ভোজালির খাপ রয়েছে তবে তাতে এখন কোনো ভোজালি নেই।

নকুল একটা মতলব ঠিক করলো মনে মনে। সে উঠে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে সিগারেট বার করে হাতে একটা রেখে অন্যটা নেপালীকে দিল। নেপালী চিরদিন বিড়ি টানে, দৈবাৎ তার ভাগ্যে সিগারেট জোটে। আজ মুহূর্তে তার ক্ষুদে ক্ষুদে চোখ আরো গোল গোল হয়ে গেল। এ তো বহুত আচ্ছা বাবু!

নকুল দেশলাইটাও ওর হাতে দিল। যেই সে দেশলাইটা জ্বেলে পরম আনন্দে সিগারেট ধরাচ্ছে আমনি নকুল বিদ্যুৎবেগে একটা ঘুষি চালিয়ে দিল নেপালীর মুখের ওপর।

সিগারেটটা ছিটকে পড়লো একদিকে, নেপালী ঢলে পড়ল আর একদিকে। এতখানি প্রত্যাশা সে মোটেই করে নি। গল গল করে রক্ত বেরুচ্ছে নাকে। নকুল আর একটি ঘুষি মারলো নেপালীর পেটে।

অল্পক্ষণের মধ্যে নেপালীটা উঠে দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে রক্ত মুছলো। স্বভাববশতঃ তার বাঁ হাতটা সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল ভোজালির খাপে। কিন্তু সে মোটেই জানে না, তার ভোজালিটা কখন সে একসময় নামিয়ে রেখেছে। ব্যর্থ আক্রোশে নেপালী নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরলো জোরে—বুঝি এক্ষুণি রক্ত বেরিয়ে পড়বে। তারপর সে তার ঘাড় ঈষৎ নীচু করে মুষ্টিবদ্ধ হাত দুটো দু'পাশ থেকে ধনুকের মতো ঝুলিয়ে এক পা এক পা করে দুলতে দুলতে এগিয়ে আসছে নকুলকে আক্রমণ করবার জন্য।

এই সব ব্যাপারের কিছুই পূর্বাভাষ পায়নি সুবীর, তাই সে প্রথমে একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছে। এখন সে নিজেকে সামলে নিয়ে আসন্ন আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে।

নেপালীর সাহসে কুলোচ্ছে না নকুলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে। নেপালীর স্বাস্থ্য ভালো হলেও, তার চেয়ে নকুল আরো বেশী শক্তিশালী। নকুল আক্রমণ ও প্রতিরক্ষার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। নেপালী এগিয়ে আসতে তাকে একটা উত্তম ঘুষি দিল সে।

নেপালী-বেটা তখন থেকে মার খেয়ে যাচ্ছে। বাচ্চা কেড়ে নিলে বাঘিনীর অবস্থা যেমন হয়, এর অবস্থাটা সেইরকম। রক্তবর্ণ দুটো চোখ দিয়ে গিলে খাচ্ছে নকুলকে। দু'জনে পরস্পরের দিকে আছে চেয়ে এবং সুযোগ খুঁজছে, মাঝে রয়েছে মাত্র কয়েক হাত ব্যবধান।

নেপালী নকুলের কাছাকাছি আসতেই নকুলের আর একটি ঘুষি খেলো মুখের ওপরে। সঙ্গে সঙ্গে সে মাটিতে পড়ে গেল, আর পড়ে যেতেই তাকে একটা লাথি মেরে সরে গেল নকুল।

উঠে দাঁড়িয়েছে নেপলী, আবার তার নাক দিয়ে রক্ত ঝরছে। সে অমনি নকুলের দিকে তেড়ে গিয়ে একটা বজ্রমুষ্টি ছুঁড়লো, কিন্তু নকুল তার আগে বসে পড়েছে বলে তার মাথার ওপর দিয়ে শূন্যে মুষ্টি বেরিয়ে গেছে। তৎক্ষণাৎ সে উঠে দাঁড়িয়ে একটা লাথি মারলো জোরে নেপালীর বুকে—অমনি সে উল্টে পড়ে গেল ঘাসের ওপর।

সুবীর এইসব দৃশ্য দেখছে চলচ্চিত্রের মতন। সে ওদের ওখান থেকে খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে। সুবীরের পক্ষে সম্ভব নয় এই নেপালীর সঙ্গে লড়া। নেপালী এখন যাকে হাতের মধ্যে পাবে, তাকে ছিঁড়ে ফেলবে। তবে ঐ বিজাতিটা একবার বেকায়দায় পড়লে তখন ওকে একবার উত্তম-মধ্যম দিয়ে দেবে সুবীর। অর্থাৎ ঝোপ বুঝে কোপ মারবে। মহাবীর কর্ণ যখন তাঁর রথচক্র উত্তোলনে নিমগ্ন তখনই তো অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে কর্ণের মৃত্যুবাণ ছেড়ে দিয়েছিলেন।

ঘাসের ওপর নেপালী উঠে দাঁড়াতে তাকে আঘাত করতে এগিয়ে এলো নকুল। কিন্তু নেপালী তাকে এবার পা ধরে মাটিতে ফেলে দিল। নকুল ঘাসের ওপর পড়ে যেতেই তার বাহুর ওপর এসে পড়লো নেপালীর ঘুষি। দ্বিতীয় ঘুষিটা খাবার আগেই নকুল ওখান থেকে খানিকটা দূরে সরে গেছে। নেপালীকে ঘাস থেকে কী একটা তুলতে দেখে চক্ষের নিমেষে নকুল মাটিতে বসে পড়লো, সঙ্গে সঙ্গে তার মাথার ওপর দিয়ে কী একটা বিদ্যুৎবেগে চলে যেতে মুহূর্তের মধ্যে কাঁচ ভাঙবার ঝন্‌ঝন্ শব্দ উঠলো।

নেপালীটা ঘাসের মধ্য থেকে একটা নুড়ি তুলে নিয়ে নকুলের মাথা লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিয়েছে, আর সেটা তার মাথার ওপর দিয়ে এসে বাগানের বৈদ্যুতিক আলোতে লাগায় সেটা ভেঙে পড়েছে।

লক্ষ্য ব্যর্থ হওয়ায় নেপালী বেশ একটু হকচকিয়ে গেছে। ঠিক

ঐ সময় নকুল সামনের ঢিপি-করা বালির স্তূপ থেকে এক মুঠো বালি নিয়ে ছুঁড়ে দিল ওর দিকে।

সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রের মতন নেপালীর হাত দুটো চলে গেল ওর দু'চোখে। এই সুবর্ণ-সুযোগে ওকে মাটিতে ফেলে দিয়ে ওর বুকের ওপর চেপে বসতে একটুও কষ্ট হলো না নকুলের। সুবীরও এই সুযোগে এবার ছুটে এসেছে। নেপালীর শক্তি কিন্তু স্তিমিত হয়ে যায় নি, নকুলকে বুকের ওপর থেকে ফেলে দিয়ে তার বুকে উঠে বসলো। প্রকৃত দৈহিক শক্তিতে নকুলই সবচেয়ে বেশী বলবান। ধস্তাধস্তি করে সে আবার নেপালীকে নীচে ফেলে তার বুকে চড়ে বসলো, এবং সুবীরকে বললো, আমার পকেটে দড়ি আছে—এর হাত পা বেঁধে দাও ভালো করে। সুবীর সেই আদেশ পালন করে ফেললো।

সেখান থেকে উঠে নকুল বললো—চলো, এবার আমাদের বাড়ীর মধ্যে ঢুকতে হবে শীগগির। সঙ্গে সঙ্গে ওরা বাগান পেরিয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়লো। একতলার ঘরগুলো আগে খোঁজবার ইচ্ছে ছিল সুবীরের, তাই সে ওদিকে পা বাড়াতে নকুল তাড়াতাড়ি বললো, না, না, একতলায় আগে নয়। দোতলায় চলো আগে। মেয়েরা সব দোতলা বেশী পছন্দ করে, ওদের দোতলায় রাখা হয়।

দোতলার লম্বা বারান্দা ওরা পেরিয়ে যাচ্ছে, নকুলের হাতে পিস্তল। জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই। হঠাৎ এক জায়গায় ওরা মেয়েদের হাসির সুমিষ্ট রোল শুনতে পেল। কিন্তু কোন পাস থেকে সেটা আসছে, তা ওরা ঠাহর করতে পারছে না। বাইর থেকে বাড়ীটাকে ছোট বলে মনে হয়, কিন্তু অন্দরমহল সত্যিই বিরাট—লম্বা-চওড়া।

একটা ঘরের দরজার পর্দার ফাঁক দিয়ে ওরা উঁকি দিল, এবং ভিতরে যে আশ্চর্য দৃশ্য দেখলো, তাতে ওরা স্তম্ভিত না হয়েও পারলো না।

ঘরটা বেশ বড়ো এবং বৈদ্যুতিক সুউজ্জ্বল আলোয় ঝলমলে। একটা টেবিলের কাছে বসে জন ছ-সাতেক সেরা সেরা সুন্দরী প্রাতরাশ সারছে। টেবিলে অনেক কিছু খাবার কিন্তু পর্দার আড়াল থেকে তা ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। টেবিলের দু'পাশে দু'জন পরিচারিকা দাঁড়িয়ে আছে হাতে ট্রে নিয়ে হাসিমুখে। সুন্দরীরা সব এর মধ্যেই পরিপাটি করে সেজে গুজে নিয়েছে, এখন অত্যুজ্জ্বল আলোয় ওরা একেবারে ঝলসিয়ে যাচ্ছে। মনে হবে উর্ধ্বলোকের কয়েকটা পরী বুঝি মর্তের কিঞ্চিৎ আহার্য সেবনের জন্য দয়া করে এই কক্ষে একটু পদার্পণ করেছে। জবাফুলের মত লাল ওদের ঠোঁটগুলি—যেন কোনো নিষ্ঠুর এইমাত্র ওদের সুকোমল ঠোঁটে রক্তপাত ঘটিয়েছে।

টং করে ঠিক এই সময় ঐ ঘরের দেওয়াল ঘড়িটা সাড়ে সাতটা ঘোষণা করলো। অমনি একজন সুন্দরী ঘড়ির পানে তাকিয়ে বললো, এই যাঃ, সাড়ে সাতটা বাজলো—তোরা তাড়াতাড়ি করে খা!

অন্য একজন সুন্দরী উত্তর দিল, কেন রে? তোর এত তাড়া কিসের! ওঃ, বুঝেছি—

এইবাব এক সখী পার্শ্ববর্তী অপব সখীব গায়ে ঈষৎ ধাক্কা দিল—আর সঙ্গে সঙ্গে উঠলো আবার হাসির বোল।

নকুলের বুঝতে কষ্ট হলো না যে, এই সুন্দরীরা স্টীমারের ঐ ফাঁদ থেকে কিংবা অন্য কোথা থেকে এখানে আগত। কাজেই এই বাড়ীটা ভালো করে সন্ধান করলে উদ্দেশ্য সফল হবে। নকুলের এখন মনে হচ্ছে, এই সময় তাব হাতে একটা মহাস্ত্র থাকলে এক্ষুণি সে ক্যাপ্টেনের সাধের এই প্রমোদ ভবনটি উড়িয়ে দিতো।

সুবীরের কাঁধে হাত রাখলো, নকুল চুপি চুপি বললো—এদের ঘর থেকে বের হতে দেওয়া হবে না। বলে সে আস্তে আস্তে দরজার শিকলটা তুলে দিল।

ওখান থেকে সরে এলো ওরা। ঐ ঘরের পরের দুটো ঘর তালাবন্ধ। তার পরের ঘরেব দরজাটা ঠেলতেই খুলে গেল। ভিতরে দেখা গেল, দীপালী খাটের ওপর বসে রয়েছে। অদূরে একজন পরিচারিকা দাঁড়িয়ে, তার হাতে একটা তালপাতার হাত পাখা। দীপালীর সম্মুখে ছোট গোল-টেবিলে রয়েছে কিছু জলযোগ।

গত রাত্রে স্টীমারের কক্ষের মধ্যে সহসা ওপর থেকে কপাটটা পড়ে যেতেই দীপালী সেই অন্ধকারের মধ্যে সেই যে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল, আর তার কিছু খেয়াল নেই। অজ্ঞান অবস্থায় ওকে ওখান থেকে স্টীমারের একটি নৌকায় তুলে পাড়ে আনা হয়। তার পর ক্যাপ্টেনের এই বাড়ীতে চালান করে দেওয়া হয়েছে। অনেকক্ষণ অজ্ঞান অবস্থায় ছিল। কিছুক্ষণ আগে দীপালীর জ্ঞান হবার পর সে নিজেকে সম্পূর্ণ নতুন জায়গায় একটা বিছানার ওপর দেখে, আর একজন পরিচারিকা তার মাথায় তালপাতার হাওয়া করছে। ঘরে তার সুবীরদার কোনো চিহ্ন নেই।

দীপালী মাথা নত করে আছে বলে কিছুই দেখতে পায় নি। কিন্তু পরিচারিকাটি দেখতে পেয়েছে। নকুলের হাতে পিস্তল দেখে পরিচারিকার টিয়াপাখির মতো লাল ঠোঁট দুটি ফাঁক হয়ে গেল, মাঝখান থেকে বেরিয়ে এলো একটি মেয়েলি ভয়ার্ত আর্তনাদ।

এবার দিপালী মুখ না তুলে পারলো না দরজার দিকে দৃষ্টি পড়তেই ওদেরকে দেখতে পেল, সঙ্গে সঙ্গে সে একটা শব্দ করে উঠে দাঁড়িয়ে ডাকল—সুধীরদা!

সুবির আর নকুল চৌকাঠ পেরিয়ে সবে ঘরে একটা পা দিয়েছে, তখন পরিচারিকা ভীষণ ভয় পেয়ে হাতজোড় করে বললো—না না আমাকে মারবেন না, আমাকে মারবেন না! আপনার পায়ে পড়ি—সত্যি বলছি—একে আমি চুরি করে আনিনি! সত্যি আমি চুরি করি নি—

বলতে বলতে সে মেঝেতে হাঁটু ভেঙ্গে বসে পড়লো। এবং সে নকুলের পা ধরতে এলে নকুল তখন পিস্তল উঁচিয়ে কঠিন স্বরে বললো—খবরদার! চুপ করো একদম—নইলে একেবারে গুলি চালিয়ে দেবো! ওঠো বলছি! ওঠো, এই খাটের তলায় গিয়ে শুয়ে পড়ো, তা না হলে গুলি করবো।

প্রাণের দায়ে সে তা-ই করলো। খানিকটা কুঁকড়ে শুয়ে পড়েছে। স্থবির তৎক্ষণাৎ দীপালির হাতটা ধরে তাকে ঘরের বাইরে টেনে আনলো। নকুল ঘরের শিকল তুলে দিল।

আগের সেই ঘরটার সামনে দিয়ে যেতে গিয়ে ওদের কর্ণে প্রবেশ করলো মেয়েলি হাসির রোল। সুন্দরীগুলো এখনো হাসছে—কিন্তু এখনো জানে না যে ওরা বন্দিনী। নকুল থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বললো, আমরা কি চোরের মতো এখান থেকে চুপি চুপি চলে যাবো? না, একটা চিহ্ন রেখে যেতে হবে।

ঐ ঘরের একটা জানালা খোলা, সেই জানালার পর্দার ফাঁক দিয়ে ভিতরে একবার উঁকি মারলো নকুল। তারপরেই ঐ আড়াল থেকে পিস্তল দিয়ে তাক করতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে পিস্তলের শব্দ এবং কিসের একটা কাঁচ ভাঙার ঝনঝন শব্দ উঠলো। সেই সঙ্গে সমবেত নারী কণ্ঠে ভয়ার্ত আর্তনাদ উত্থিত হলো।

না, নকুল কাউকে হত্যা করেনি; কেনো মানুষকে সে নির্বিচারে খুন করবে না। ঐ ঘরের মধ্যকার অতি মূল্যবান ঝাড় আলোটা ভেঙে দিয়েছে নকুল গুলি ছুঁড়ে। কিন্তু কেউ আহত নয়।

ওরা তিনজনে একতলায় নেমে এসেছে। বাগান পেরিয়ে গেটের কাছে আসতে আহত ও বন্দী নেপালীকে দেখতে পেল। নকুল ওর দিকে এগিয়ে এসে কণ্ঠে শ্লেষ হেনে বললো —ওহে বীর পুরুষ শিক্ষা হয়েছে, না আর কিছু লাগবে? কেন

বাপ-ঠাকুরদার দেশ ছেড়ে এখানে রঙ দেখাতে এসেছিস! আমাদের দেশের লোকেরা তোদের নেপালে গিয়ে দারোয়ান সেজে বাহাদুরি করে না। যা শীগগির তোদের দেশে ফিরে! কী রে, খুব তো পাথর ছুঁড়ে মেরেছিলি—এবার তুই পালাবি কোথায়—দিই এবার সেটা ছুঁড়ে তোর মাথা ফাটিয়ে? ওপারের ঐ আদমীগুলোর কাছ থেকে তোর কিছু ভাগ-টাগ মেলে নাকি?

নেপালী ঘাসের উপর পড়ে আছে, গায়ে রোদ লাগছে, তার হাত পা বাঁধা। চোখে-মুখে রক্ত, বাঁ চোখে বালি পড়ায় সেটা বন্ধ, অপরটা দিয়ে পিটপিট করে তাকাচ্ছে। তার তীক্ষ্ণ ধারাল দাঁতগুলি দিয়ে সে নকুলকে দাঁত দেখালো বাঁদরের মতন। তারপর একটা গালি দিল কুৎসিত।

নকুল চলেই আসছিল; কিন্তু গালি শুনে সে এক মুঠো বালি তুলে ওর দিকে ছুঁড়ে দিল। নেপালীর খোলা চোখে বালি পড়ায় পশুর মতন সে কি রকম একটা শব্দ তুললো। নকুল সুবীরের দিকে ফিরে বললো, চলো ভাই, চলো—। ও বেটা থাক পড়ে—ক্যাপ্টেন এসে তার মহাবীরপুরুষের অবস্থা দেখুক!

নকুল, সুবীর ও দীপালী এসে পৌঁচেছে বজবজ স্টেশনে। শিয়ালদা যাবার দুটো টিকিট কেটে দিয়েছে দীপালী আর সুবীরের জন্য। দিয়ে নকুল সিগারেট কেনবার নাম করে অন্যদিকে সরে গেছে একটু—যাতে সুবীর আর দীপালী একটু কথাবার্তা বলতে পারে। এরা দু'জনে এখন স্টেশনের এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কথা কইছে।

দীপালী বললো, সুবীরদা! তুমি কাল থেকে আমাকে যেভাবে সাহায্য করে বাঁচিয়ে রেখেছো—এর কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা আমার নেই—সত্যই তোমার কাছে আমি চিরদিনের জন্য

ঋণী। কাল দুপুরে আমি কুমীরের হাতে পড়েছিলুম, সেই কাকদ্বীপে। আমায় তুমি উদ্ধার করলে—তা না হলে কুমীরের পেটেই তো যেতাম! তারপর ষ্টীমারের ফাঁদে পড়ে ঐ বাড়িতে বন্দী হয়ে গেলাম, সেখান থেকেও তুমি আমায় বাঁচালে। সত্যি সুবীরদা তুমি কাছে না থাকলে—

সুবীর বললো, দ্বিতীয় বারের কথাটা ধরা হোক। ঐ বাড়ী থেকে আমি তোমাকে বাঁচাতে পারতাম না কিছুতেই। কারণ আমি জানবই বা কি করে—তুমি কোথায় এবং কিভাবে আছো? আমি নিজেই ষ্টীমারেব খুপরীব মধ্যে আটকা পড়ে ছিলাম! তোমায় বাঁচাবো কী? আমাকে মেরে ওরা মৃতদেহটা গঙ্গার জলে ফেলে দিতো পাথরে বেঁধে। এইসব মালবাহী জাহাজের মধ্যে কি ঘটে যাচ্ছে, কে তার খবর রাখে? আমরা ষ্টীমারে উঠেই জানালা দিয়ে ভিতরের যে দৃশ্যটা প্রথম দেখেছিলাম—মনে পড়ে? যাক গে সেকথা, এক কথায় ঐ নকুলবাবু আমাদের সাহায্য না করলে আমার পক্ষে কোন সম্ভব ছিল না তোমায় বাঁচাবার। ওঃ! আমাদের বিনা স্বার্থে যেভাবে সাহায্য করেছেন—আমি ভাবতেই পারি না! ষ্টীমারের মধ্যে আমাকে ওরা খুন করে ফেলতো, নয়তো আমি অনাহারে মরতাম। স্রেফ নকুলবাবুর জন্যই ওখান থেকে আমি উদ্ধার পেয়েছি, তুমিও পেয়েছো ঐ বাড়ীটা থেকে। অবশ্য, তোমার ক্ষেত্রে প্রাণ-সঙ্কটের ভয়টা তেমন ছিল না। দীপালী, তুমি কৃতজ্ঞতা জানাতে চাইলে নকুলবাবুকেই জানাও।

দীপালী বললো, উনি আমাদের বিপদে সত্যিই দেবতার মত সাহায্য করেছেন। আচ্ছা উনি তোমাকে ষ্টীমারে কি করে সাহায্য করলেন।

সে অনেক কথা দীপালী। এখন তোমাকে সব কথা বলে উঠতে পারবো না। আর জীবনে কোনদিন বলবার সুযোগ

পাবো কি না তাও জানি না—তবে ঐ যে বললুম, ওর সাহায্য ছাড়া আমরা ক্যাপ্টেন শয়তানের হাত থেকে মুক্তি পেতাম না। তিনি আমাদের বিপদের সম্ভবনা অনুমান করে সারারাত্রি জেগে ছিলেন; তোমাকে চুরি করে নৌকায় তুলতেও দেখেছেন। কিন্তু উনি অন্ধকারে একা আর কি করবেন? —যদিও তাঁর কাছে একটা পিস্তল ছিল—কিন্তু অন্ধকারে গুলি ছুঁড়তে গেলে তোমাকেও তো লেগে যেতে পারতো। নকুলবাবু আমার জন্য একটা মোটা কাছি ঝুলিয়ে রেখেছিলেন স্টীমারের ছাদ থেকে। যার ফলে আমি শেষে ঐ দড়িটা বেয়ে বাইরে আসতে পেরেছি।

সুবীরদা, এবার আমাদের ট্রেনে উঠে বাড়ী ফিরতে হবে যে।

হ্যাঁ। কিন্তু দীপালী, আমি যাচ্ছি না! তুমি এখন বাড়ী ফিরে যাও। আমি আর বাড়ীতে যাবো না!

দীপালী বিস্ময় প্রকাশ করে বললো--সে কি সুবীরদা! তুমি তবে এখন কোথায় যাবে?

জানি না! যেদিকে চোখ যাবে, সেদিকে যাবো ভাসতে ভাসতে --নৌকা তো একটা আছে।

দীপালী আশ্চর্য হয়ে তাকালো সুবীরের মুখের দিকে ভালো করে। বললো কই নৌকা?

সুবীর মৃদু হাসলো, বললো, কেন তুমি নৌকা চড়া ভুলে গেলে এর মধ্যেই? যে-নৌকোটা আমরা স্টীমারের পিছনে বেঁধে রেখেছিলাম, সেটায় চড়েই তো নকুলবাবু আর আমি আজ ভোরে স্টীমার থেকে চুপি চুপি চলে এলাম পাড়ে। নৌকাটা এখন ঘাটে বাঁধা আছে, ওটায় চড়েই আমি এখন রওনা দেবো।

বুঝেছি সুবীরদা। তোমার নিরুদ্দেশ হয়ে যাবার সখ। না সুবীরদা—না, তোমাকে আমি তা হতে দেবো না। তুমি নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে চাও, না? আমি আটকে রাখবো! তুমি আমার এত করলে—বলতে বলতে সে একটা হাত চেপে ধরলো সুবীরের।

ধরা-গলায় বললো, তোমাকেও বাড়ী ফিরতে হবে আমার সঙ্গে। আমি তোমাকে স্বার্থপরের মতো পথের মাঝে একা ফেলে নিজে গটগট করে বাড়ী ফিরে যাবো—এরকম মেয়ে আমাকে ভেবেছো? তা হবে না, তু'জনে একসঙ্গেই ফিরবো। কুমীরের হাত থেকে আমায় তুমি না বাঁচালে—

সুবীর বললো, হ্যাঁ, কুমীরের হাত থেকে তোমায় বাঁচাতে পেরেছি ঠিকই। ওদের হাত থেকে বাঁচানোটা তবু সহজ, ওরা যে জলজন্তু। আমি যদি সহস্রটা কুমীর হত্যা করে ফেলি—তবুও আমাকে ফাঁসি যেতে হবে না, আমার জেল হবে না। কিন্তু, মানবরূপী কোটি কোটি জন্তু নিরীহভাবে গৃহে গৃহে রয়েছে---তারা সাপের চেয়ে বেশী বিষাক্ত, আরো ভয়ংকর! ওদের হাত থেকে বাঁচাও যায় না, ওদেরকে অপসারণও করা যায় না। মানবরূপী জন্তুদের একটাকে হত্যা করলেই আবার আজীবন জেল! যাক গে, দীপালী, তুমি বাড়ী ফিরে যাও লক্ষ্মী মেয়েটির মত। আমার জন্য কিছু ভাবতে হবে না, যেখানে হোক, আমি এক জায়গায় থাকবো। তা ছাড়া তুমি যেখানে আমায় যেতে বলছো, সেখানে কোথায় যাবো?

কেন সুবীরদা, এরকম করছো! যে-বাড়ীটায় তুমি থাকো, সেখানে যাবে।

বেশ জোর দিয়ে সে বললো মোটেই আমি ঐ বাড়ীর লোক নই, ওখানে আমি একজন গলগ্রহ প্রার্থী। আমাদের মতো ছেলেদের কোথাও স্থান নেই, আমাদের চলে যাওয়াই শ্রেয়—এই আমার এক কথা।

দীপালী ভালো করেই জানে, যে-বাড়ীতে সুবীর বর্তমান থাকে, সেটা সুবীরের নিজস্ব নয়। ইন্দিরা দেবী আপন পুত্রের মত স্নেহ করে তাকে কাছে রেখেছেন। এবং দীপালী এখন বুঝতে পারছে যে, তার সুবীরদা চলে যাবেই, তাঁকে আর আটকে রাখা

যাবে না কিছুতেই। যখন যে কথাটা সে বলে, তা করবেই! দীপালীর চোখে দু'ফোঁটা জল টলমল করছে। কাঁদো-কাঁদো স্বরে সুবীরের একটা হাত চেপে ধরে বললো—না সুবীরদা, তোমাকে এভাবে ছেড়ে যেতে আমার বড়ো খারাপ লাগছে। আমি তোমার কাছে সারাজীবন ঋণী—আমার একটা কথা রাখো সুবীরদা! এখন তুমি বাড়ী চলো। তোমার সামনে তো পরীক্ষা; পরীক্ষা-টরীক্ষা হয়ে গেলে, তখন নৌকায় বেড়াতে চাও কিংবা অন্য কোথাও যেতে চাও যাবে। এখন তুমি বাড়ী চলো—আমার কথাটা রাখো, প্লীজ!

সুবীর দীপালীর একটা হাতে ধীরে ধীরে চাপ দিয়ে বললো, দীপালী, তোমাকে আমার মনে থাকবে চিরদিন। আমি বাড়ী ফিরে যাবার হলে ফিরে যেতুম, তোমাকে এত বলতে হতো না। তোমার সাথে আমার আর জীবনে কোনোদিন দেখা হবে কি না জানি না! হয়তো আজই শেষ দেখা। আমাকে আজ বিদায় নিতেই হবে, তুমি আমার জন্য মন খারাপ কোরো না। কালকের সেই চুরি করা নৌকাটা এখন থেকে আমার আপন সঙ্গী—

দীপালী বুঝতে পারছে—একে আর আটকে রাখা যাবে না। ফল পেকে গেলে এক সময় বোঁটা ছিঁড়ে মাটিতেই ঝরে পড়ে—গাছ তাকে ধরে রাখতে পারে না কিছুতেই। তেমনি আজ নিশ্চয়ই তার হৃদয়ে কোনো বিরাট ক্ষত দিয়ে অকূলে পাড়ি দেবার মুখে দাঁড়িয়ে আছে। তাঁকে ধরে রাখা যাবে না। তাই হাত দিয়ে দীপালী তার অশ্রু মুছলো।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যাবার মতো সুবীর বললো, এই, তুমি আমার কথা বলবে না কাউকে যে, আমি বেঁচে আছি। সবাই যেমন জানে—আমায় কুমীরে নিয়ে গেছে—তেমনি জানুক। তুমি ঘুণাক্ষরেও আমার কথা কিছু প্রকাশ করবে না! সাবধান কিন্তু! আর তুমি নিজের কথা কী বলবে বাড়ীতে?

আমি একটা বানিয়ে নেবো কিছু।

সুবীর হাত নেড়ে বললো না, না দীপালী, শোনো, আমি তোমার জন্য ভেবে রেখেছি। তুমি বলবে—কাকদ্বীপে কুমীর তাড়িত হয়ে তুমি একটা লম্বা ছুট দিয়েছিলে, এবং অনেকটা ভিতরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলে। তারপর স্টীমার ফিরলে ওদের কোনো সাড়াশব্দ তুমি মোটে পাও নি। সূর্য অস্ত যাবার আগেই তুমি একা গঙ্গার কূলে ফিরে এলে, এসে দেখলে, স্টীমার নেই, জন প্রাণী হীন—শুধু তুমি একাকিনী। কাজেই পাড়ে বসে তুমি একা কাঁদতে শুরু করলে। এমন সময় দক্ষিণ দিক থেকে একটা স্টীমার এসে ওখানে থামলো, স্টীমার যাত্রীদের ইচ্ছা তারা গঙ্গায় সূর্যাস্ত উপভোগ করবে। সন্ধ্যায় নদীর মনোরম সূর্যাস্ত দেখবার জন্য স্টীমার যাত্রীরা নেমে পড়লো তীরে। তুমি তখন ওদের কাছে গিয়ে পড়লে। একজন দয়ালু মহিলা তোমায় স্থান দিলেন। স্টীমারে ভিজে পোশাক ছাড়িয়ে তাদের বাক্স থেকে দামী শাড়ী-ব্লাউজ তোমাকে জোর করে পরালে। অবশেষে আজকে স্টীমার বজবজে পৌঁছোলে ঐ মহিলা তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে ট্রেনে তুলে দিয়েছেন। তারপর তুমি শিয়ালদায় পৌঁছে গেলে।

দীপালী মৃদু হেসে বললো, বাঃ! বেশ তো একটা বানিয়ে দিলে! আমি কিন্তু এরকম বানাতে পারি না! তারপর নিজের দেহের দিকে নজর পড়তে মুখখানা কুঞ্চিত করে বললো—উঃ, সারা গা আমার ঘিন ঘিন করছে!—ইস্, আমি এখনও স্টীমারের ঐ শয়তানটার দেওয়া শাড়ী পরে আছি—আমার সারা দেহ ঘেন্নায় জ্বলে যাচ্ছে! ইচ্ছে করছে, এগুলো এক্ষুণি খুলে ফেলে ভিখারীকে দিয়ে দিই! কাছে অন্য জামা-কাপড় থাকলে আমি সত্যিই তাই করতাম! ঐ শয়তানের দেওয়া রাজ-পোশাকে আমি থুতু দিই।

কী আর এখন করবে, সুবীর খানিকটা উদাসভাবে বললো, বাড়ী পৌঁছে তখন সব খুলে ফেলে দিয়ো। আমিও পরবার জন্য

একটা কিছু পেলে ঐ শয়তান বেটার এই পায়জামা-শার্ট এখুনি খুলে ফেলে দিতাম। আরে, ঐ যে নকুলবাবু আসছেন!

নকুল এসে দাঁড়ালো ওদের পাশে।

সুবীর বললো, নকুলবাবু, আপনি আমাদের কাছে সত্যি দেবতুল্য! আপনি না থাকলে আমাদের অবস্থা আর বলবার নয়—আমাকে তো ঐ স্টীমারে মরতেই হতো, আর একে ঐ বাড়ীতে বন্দিনী হয়ে থাকতে হতো আজীবন—সেও একরকম মৃত্যু!

নকুল বললো, তোমাদের তো ট্রেনে উঠতে হবে. চলো তার আগে কিছু খেয়ে নেওয়া যাক।

তার কথা শুনে দীপালী বললো আচ্ছা দেখুন তো, এ বলছে, আর বাড়ী যাবে না। নৌকা নিয়ে নিরুদ্দেশ হবে। আপনি একটু বুঝিয়ে দিন না একে।

কিহে ভাই, তোমার ছোট বোনটি কি বলছে? নৌকা নিয়ে কোথায় যাবে? আমার তো ভাই নেই, তোমায় ভাই বলছি।

তামাশা নয়—আমি নৌকা নিয়ে পাড়ি দেবো নকুলদা। কোথায় যাবে, তা ঠিক নেই আমাকে বাধা দেবেন না—আপনার কাছে আমার একমাত্র অনুরোধ। আর একটা বলি, এ আমার ছোট বোন নয়। এদের বাড়ীর কাছাকাছি আমি থাকি

সে কী! তুমি যে ওখানে তখন বললে—

হ্যাঁ। কিন্তু তখন ওকথা না বলে আর কী উপায় বলুন?

নকুল ওদের দু'জনকে নিয়ে একটা মিষ্টির দোকানে ঢুকে কিছু খাবার কিনে বসলো। খেতে খেতে সে শুনে নিল কাকদ্বীপের কাণ্ড থেকে ওদের স্টীমারে ওঠা পর্যন্ত। শেষে সে সুবীরকে বললো, না ভাই, তুমি কলকাতায় ফিরে যাও। নৌকা নিয়ে ছেলেমানুষি করতে যেয়ো না দীপালীর সাথে তুমিও বাড়ী ফিরে যাও। তোমাকে আমি ভাই বলে ডেকেছি, তোমার ভালোর জন্যই যেতে বলছি। তা ছাড়া দুটো টিকিট তো কিনেছি শিয়ালদা যাবার।

তখনই তো আমি বারণ করেছিলাম, সুবীর বললো, আপনি শুনলেন না—জোর করে কিনলেন দুটো!

সে বাড়ী ফিরতে রাজী না হলে, নকুল বললো, তোমরা সব আজকালকার ছেলে—বাড়ী না গেলে আমি আর কী বলতে পারি!

দীপালী নকুলকে বললো, নকুলবাবু, কলকাতায় এলে আপনি আমাদের বাড়ীতে একবার আসবেন কিন্তু!

আচ্ছা যাবো।

সুবীর খেতে খেতে চমকে উঠে বললো, আপনি এদের বাড়ী যাবেন নাকি! একটু থেমে মাথা নেড়ে বললো, না, মানে—আমার কথাটা যে প্রকাশ হয়ে পড়বে—। আচ্ছা, ঠিক আছে, আপনি যাবেন—কিন্তু আমার কথাটা ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করবেন না, বলে রাখছি! বরং আপনি জানাবেন, দীপালী যে স্টীমারে করে কাকদ্বীপ থেকে ফিরতে পেরেছিল, সেই স্টীমারের একজন সহযাত্রী বা কোন কর্মচারী আপনি—কেমন? আমি দিপালীকেও শিখিয়ে রেখেছি।

দীপালী বাড়ী ফিরে কি বলবে, সেকথা নকুল খেতে খেতে শুনে নিয়েছে। এখন সে হেসে বললো, ঠিক আছে ভাই তাই হবে।

অতপর দীপালী তাকে নিজেদের ঠিকানাটা দিল এবং তাদের বাড়ীতে যাবার জন্য পুনর্বার আহ্বান জানালো।

ওরা তিনজনে আবার এসে হাজির হলো প্ল্যাটফর্মে। শিয়ালদার ট্রেন চলে গেছে; আবার ছাড়বে। সুবীর বললো, নকুলদা, আপনি আমাদের জন্য কিন্তু চাকরিটা হারাবেন! সত্যিই আমার দুঃখ লাগছে।

কিন্তু তোমাদের দুঃখ করার কোন প্রয়োজন নেই। আমার চাকরি ছেড়ে দিয়েছি আজ। এতক্ষণে ক্যাপ্টেন আমার অনুপস্থিতি জেনে গেছে, এবং তোমায় যে মুক্তি দিয়েছি, তাও বুঝে ফেলেছে। ঐ স্টীমারে আমি আর ফিরছি না। জাহাজের একটা চাকরি

যোগাড় করেছি, সামনের মাস থেকে সেখানে আমি যোগ দেবো।

প্ল্যাটফর্মে একটা ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। নকুল বললো, চলো দীপালী, তোমার ট্রেন ছেড়ে দেবে—তোমায় তুলে দিই।

দীপালী দু'পা গিয়ে আবার দাঁড়ালো, সুবীরের দিকে তাকালো। দীপালীর দু'চোখে অশ্রু টলমল করছে—এই টলমলে অশ্রুবিন্দুদ্বয় তার সুন্দর মুখখানিতে এনে দিয়েছে অপরূপ বর্ণচ্ছটা।

সে বললো, সুবীরদা, তোমায় এত করে বললুম, তবু তো তুমি যাবে না! তোমার হাতে তো কোন টাকাকড়ি নেই, কোথায় তুমি কিভাবে পড়ে থাকবে, আমি ভাবতে পারি না। আমার একটা কথা নাও—

বলতে বলতে তার হাতের সোনার চুড়ি দুটো খুলে ফেলে। বললো: সুবীরদা, এই দুটো নাও, কাছে রাখো। এগুলো বিক্রি করলে তুমি অন্ততঃ কম করেও তিনশো টাকা পাবে।

সুবীর তা দেখে বলে ওঠে, এ কী—এ কী করছো! তুমি পাগল হয়ে গেলে নাকি! আমার ও লাগবে না—

না সুবীরদা, আমার এই কথাটা অন্ততঃ তুমি রাখো! তোমাকে এই চুড়ি দুটো নিতেই হবে। যদি তুমি না নাও—এক্ষুণি আমি এই রেল লাইনের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দেবো!

সুবীরের নেবার ইচ্ছে নেই। সে বললো, বাঃ, তোমার এই দামী চুড়িগুলো কেন আমায় দিচ্ছো—আর আমি বা কেন নেব? তোমার বাড়ীর লোকই বা তোমাকে কি বলবে!

সে আমি অন্য কথা বলবো বাড়ীতে, তোমাকে কিছু চিন্তা করতে হবে না

সুবীর চুড়ি নিতে রাজী নয়। শেষে দীপালী জোর করে তার পায়জামার পকেটে ঢুকিয়ে দিল। সে তবুও পকেট থেকে বার করে তাকে ফিরিয়ে দিতে গেল, কিন্তু দীপালী গ্রহণ করলো না। চুড়ি হাতে নিয়ে সুবীর বুঝতে পারলো, দীপালীর মত মেয়ে

বলেই এরকম কথা বলতে পারে। অন্য কোন মেয়ে হলে সুবীরকে একা ফেলে কখন প্রস্থান করতো।

দীপালী কামরায় ওঠবার আগে তাকে একবার সুবীর বললো, দীপালী, বাড়ী গিয়ে আমার কথা কিন্তু কউকে বোলো না।

আচ্ছা। বলে দীপালী কামরায় উঠে পড়লো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রেন চলতে শুরু করলো শিয়ালদার অভিমুখে। দীপালী জানালা দিয়ে হাত নাড়া দিচ্ছে। সুবীর আর নকুল ঐ প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে হাত নাড়া দেখছে। দেখতে দেখতে ট্রেন প্ল্যাটফর্ম অতিক্রম করে চলে গেল। সুবীর তবুও সেদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে, তার হাতে দীপালীর চুড়ি দুটো। যেন সে এখনও দীপালীর হাত নাড়া দেখতে পাচ্ছে!

নকুল সুবীরের কাঁধে একটা হাত রেখে বললো, চলো ভাই—

॥ সাত ॥

গঙ্গাবক্ষে সুবীরের নৌকা ভেসে চলেছে উত্তর মুখে। সে একা। দীপালী চলে যাবার পরও নকুল সুবীরকে ফিরে যেতে বলেছে অনেকবার, তবুও সে রাজী হয় নি। নকুল আর ও সম্পর্কে বৃথা চেষ্টা করে নি।

নকুল সুবীরকে আপন ভাই বলে ভেবে নিয়েছিল। ভাইয়ের ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের জন্য তাই সে একশো টাকা দিয়েছে সুবীরকে শুধু তাই নয়, নকুল তাকে একটি চিঠি লিখেও দিয়েছে।

নকুল তার জ্যেঠার কাছে মানুষ। জ্যেঠা থাকেন বারাণসীতে। তিনি অবিবাহিত। বারাণসীতে তাঁর একটি কাপড়ের ছোট মিল আছে; মিলটি একদিন নকুলই পাবে। তিনি একজন দয়ালু—ইচ্ছে করলেই সুবীরকে একটা কোনো চাকরি যোগাড় করে দিতে পারেন। তাই নকুল ঐ চিঠিখানি লিখে সুবীরের হাতে দিয়েছে।

বর্ষা সমাপ্ত হয়নি বলে হুগলী নদী এখন কানায় কানায় ভরা। তার বুকে ভাসছে সুবীরের চুরি-করা তরীটি। হাওড়া ব্রীজের তলা দিয়ে অতিক্রম করলো নৌকা। সুবীর ভাবলো, এই তো পাড়ের ওপর দিয়ে সোজা পুবদিকে চলে গেছে মহাত্মা গান্ধী রোড। এই পথে সোজা চললে আবার দীপালীর বাড়ীতে পৌঁছোনো যাবে। এতক্ষণে দীপালী বাড়ী পৌঁছে গেছে; সে এখন কি করছে? তার মা কাঁদতে কাঁদতে হারানো মাণিক আবার খুঁজে পেয়েছেন। ওর মা এতক্ষণে বাড়ীসুদ্ধ লোককে সন্দেশ ভোজন করাচ্ছেন—হয়তো রাজবাড়ীর উৎসব লেগে গেছে। একটি মাত্র প্রাণী ছাড়া আর কেউই জানতে পারবে না—সুবীর কী করছে। সত্যিই তো, সুবীর আর কে। পথের ধুলো

ঝড়ের সময় উড়ে এসে গায়ে লাগে, আবার সে-ধূলো লোকে পরে ধুয়ে ফেলে—

হঠাৎ কোথা থেকে এক মহাশক্তি এসে সুবীরের দেহে ভর করলো—হ্যাঁ, সে এবার লছমনঝোলা পর্যন্ত যাবে তরী নিয়ে! সেখানে গিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে যেতেও পারে। যত শীগগির সম্ভব, সে এ দেশ থেকে চলে যাবে। হ্যাঁ, সুবীর নিজেকে নির্বাসন দেবে।

সুবীরের গ্রাম ব্যাণ্ডেল। সেখানে সে গত বছর পর্যন্ত কাটিয়েছে। শেষে এমন একটা ঘটনার ফলে তাকে গ্রাম ছাড়া হতে হয়েছে।

এককথায় সুবীররা দারিদ্রগ্রস্ত নয়—বাড়ী ঘর-জমি-সম্পত্তি সবই তো রয়েছে। উপরন্তু সে পিতার একমাত্র পুত্র।—তবুও সুবীর মনে মনে বিগত দুই বৎসর ধরে ঘোর পাগল হয়ে আছে গৃহত্যাগের জন্য। সুবীরের কাছে পিতামাতা বলে কোনো পদার্থ নেই। সব সর্বনাশের গোড়া হলো ঐ পিতা আর মাতা। পনেরো বছর বয়েস থেকে সুবীরের মনের গুপ্ত আগ্নেয়গিরি তার পিতামাতার ওপর আজ পর্যন্ত চরম বিক্ষুব্ধ।

গ্রামের বাড়িতে সুবীরের দেহটা শুধু পড়ে ছিল, কিন্তু প্রাণটা ছিল না। সে জানতো—সে শয়তানপুরীতে বাস করছে।

গ্রামে সে অনেকের প্রাণ পর্যন্ত বাঁচিয়ে দিয়েছে। একবার একটা কুঁড়েঘরে আগুন লাগলে সেই ঘর থেকে দেড় বৎসরের শিশুকন্যাটিকে সুবীর উদ্ধার করেছিল। মাতা ঘরের বাইরে আছাড়-পাছাড় খাচ্ছে —আর ঘরের মধ্যে রয়েছে ঐ নিষ্পাপ শিশুটি। সুধীর ছাড়া আর কেউ-ই এগিয়ে আসে নি শিশুটিকে বাঁচাতে একটি হাঁড়ি মাথায় গলিয়ে অগ্নি ভেদ করে ঐ শিশুটিকে সে উদ্ধার করেছিল।

আর একবার সে সর্প-দংশনের হাত থেকে একটি তিন বৎসরের শিশুপুত্রকে বাঁচিয়ে দেয়। একদিন সুবীর তার বন্ধু ভদ্রনাথের বাড়িতে গেছে; দুই বন্ধু মিলে একটা বিষাক্ত সাপের পশ্চাতে ফিরছিল। হঠাৎ সাপটি ত্রকজনের বন্ধঘরের কপাটের ফাঁক দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল। ওরা দু'জনে বাইরে কিছুক্ষণ অপেক্ষ করলো; ভদ্রনাথ বিরক্ত হয়ে বললো, সাপ মেরে আজ আর কাজ নেই চল আজ মাছ ধরি গে। দাঁড়া—আমি ছিপ দুটো নিয়ে আসি। সুবীর, এই ঘবে তো-বউটা থাকে, ঐ যে রোদে দাঁড়িয়ে গল্প করছে ওখানে। বউটা যদি ঘবে ফেরে একটু সাবাধান করে দিস রে—। বলে সে ছিপ আনতে গেল এমন সময় ঐ ঘরের মধ্য থেকে শিশুর ক্রন্দন-ধ্বনি ভেসে এলো। সুবীর ভাবলো, সাপে নিশ্চই বাচ্চাকে কামড়াচ্ছে! অমনি সে ছুটে গিয়ে বউটাকে খবর দেয়, বউটা এসে দরজা খোলাব পর দৃশ্য দেখে মূর্ছা গেল। ছেলেকে ঘুমন্ত অবস্থায় ঘরে তালাবদ্ধ রেখে সে এব আগে পর্যন্ত মজাসে গল্প করে যাচ্ছিল। সাপ কিন্তু কামড়ায়নি, তক্তপোষের পায়া বেয়ে উঠে সবে বিছানায় মুখ বাড়িয়েছে—সুবীর এমন সময় সজোরে মারলো সাপেব মাথায় লাঠির এক ঘা।

পরে সুবীর ভদ্রনাথকে বলেছিল, আমি শুধুমাত্র নিষ্পাপ শিশুগুলোর মুখ চেয়ে ওদের বাঁচিয়েছি। তা না হলে, কোন বাপ মা হওয়া ব্যাক্তি বাঁচাতামই না! আমার বয়ে গেছে! শিশুরা নিষ্পাপ, তারা এখনও কাউকে কোনরূপ কষ্ট দিচ্ছে না—তাই ওদের বাঁচাতে আমি সব সময় এগিয়ে যাবো।

একটু থেমে, আমার সামনে দিয়ে যদি কারো বাবা বা মাকে বাঘে টেনে নিয়ে যায়, এবং আমার হাতে যদি বন্দুক থাকে—তবুও আমি বাঘ প্রতিরোধের এতটুকু চেষ্টা করবো না! কেন করবো? এক্ষেত্রে শিকার আর শিকারীর মধ্যে কোন পার্থক্য আছে? দুটোই তো সমান! অগ্রজ অনুজ ভাই বলা যেতে পারে

বাঘ যেমন নিষ্ঠুর, হিংস্র, রক্তলোভি, এই মানুষটিও তো সেইরকম। তবে বাঘের স্বভাব-চরিত্রটা যা উলঙ্গ—ওরা একটু বেশী লম্ফঝম্ফ করে। মানুষগুলোর স্বভাব-চরিত্র বাৎসল্য প্রেমের ঝলমলে পর্দায় ঢাকা—এই যা পার্থক্য। বুঝলি ভদ্রনাথ?

ডালিয়া বলে সুবীর তার এক বান্ধবীকে একবার সর্প-দংশনে হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে সে নিজেই সাপের হাতে দংশিত হয়েছিল। ডালিয়া ঐ গ্রামের ধনী-কন্যা। তাদের আর্থিক অবস্থা ধন-সম্পত্তির অভাব নেই। সুবীরকে কেন যে ভালো লেগেছিল ডালিয়ার, তা একমাত্র সে-ই জানে। ডালিয়া সুবীরকে তাদের বাড়িতে নিয়ে আসতো, এবং বাগানে বসে গল্প করতো। ওদের গৃহে বন্ধু-বান্ধবীদের যাতায়াতের ওপর কোন আইন কানুন ছিল না।

ওদের গৃহ-সংলগ্ন বিরাট বাগান আছে। সেই বাগানে বসে বসে এক ছুটির দিনে সুবীর আর ডালিয়া গল্প করছে। একসময় সুবীর বললো, জবাফুলের পাপড়ি যদি সাদা কাপড়ে ঘষে দেওয়া যায়—কাপড়টা লাল হয়। ডালিয়া তর্ক করে বললো, কক্ষনো না! হতেই পারে না! দাঁড়াও—আমাদের বাগানে গাছ আছে—আমি এক্ষুনি তুলে নিয়ে আসছি—আমার সাদা রুমালটায় দেখাও তো—। বলে সে ফুল আনতে চলে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে সুবীর ডালিয়ার চিৎকার শুনতে পেল—সুবীর! সুবীর—আমায় সাপে কামড়ালো!—শীগগির বাঁচাও—। তৎক্ষণাৎ সে তীরবেগে ছুটে গিয়ে দেখে, ডালিয়ার হাত থেকে ফুল মাটিতে পড়ে গিয়ে লুটোপুটি খাচ্ছে, তার মুখ রক্তশূন্য আর একটা দীর্ঘ সাপ দংশনের জন্য আসছে। দেরী না করে ডালিয়াকে দু'হাতে তুলে নিয়েই সুবীর দৌড়োতে শুরু করলো। মূর্ছিত মানুষকে যেমন করে লোকে দু'হাতে তুলে নিয়ে যায়, তেমনি করে ডালিয়াকে নিয়ে লম্বা বাগানের ওপর দিয়ে ছুটছে, আর সাপও পিছন পিছন আসছে। বাগান পেরোবার আগেই সাপ দংশন দিল সুবীরের

গোড়ালিতে।

একেবারে বাড়ীর দরজা পর্যন্ত এনে তবে সুবীর ডালিয়াকে নামিয়ে দেয়। ইচ্ছা করলেই সুবীর সাপ দেখে তাকে সেখানে ফেলে রেখে নিজে পলায়ন করতে পারতো। বরং অপরকে বাঁচাতে গিয়ে সাপের দংশন নিজের দেহে পেতে নিয়েছে! সুবীর না বাঁচালে তাকে অনিবার্য কামড়াতো।

নামিয়ে দেবার পর সুবীর বলেছিল, ডালিয়া আমার পায়ে সাপে কামড়েছে! শুনে সে তাড়াতাড়ি একটা দড়ি এনে দিয়েছিল। দড়ি পায়ে বেঁধে সুবীর ওখান থেকে গঙ্গার তীরে এলো।

সুবীরের রক্তে কিন্তু সর্পবিষ ছড়িয়ে পড়েছিল। গঙ্গার ধারে কিসে একটা হেলান দিয়ে সে কয়েক ঘণ্টা ধরে পড়ে আছে হুঁশ নেই। সূর্য অস্ত গেছে। এমন সময় একটা বেদে তার নৌকায় ওঠবার জন্য পাড় ধরে আসছে। সুবীরকে ওরকম অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে তার মনে একটা সন্দেহ জাগে, এবং সে সুবীরের পাশে আসে। সে বেদে সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে চিনতে তার কোন কষ্ট হয় না। অতঃপর বেদে সুবীরকে কাঁধে করে নিয়ে নিজের নৌকায় তোলে। তারপর নিয়ে আসে নিজের ঘরে।

ওদিকে ডালিয়ার বাবা ও ডালিয়ার মাসতুতো ভাই ভবেশ ছাদে দাঁড়িয়ে ঐ দৃশ্যটা দেখে ফেলেছেন, সুবীর যখন ওকে নিয়ে বাগানে দৌড় দিচ্ছিল। ঐ দৃশ্যটা দেখে ডালিয়ার বাবার অপাদমস্তক আগুন জ্বলে ওঠে। কোথাকার এক হাভাতে ছেলে তাঁর কন্যারত্নকে কিনা কোলে তুলে নিয়েছে! অ্যাঁ! এতবড়ো স্পর্ধা! তাঁর কন্যার অঙ্গে হাত দেওয়া! এক্ষুণি তিনি চাবুকে ঐ কুকুরটার চামড়া ছাড়িয়ে নেবেন!...

ভবেশ ওদের বাড়ীতে প্রায়ই আসে যায়, থাকে। ডালিয়ার সঙ্গে ভবেশের আগে খুব ভাব ছিল; এখন সে ডালিয়ার এক ব্যর্থ প্রেমিক। ডালিয়া ওর আচার-ব্যবহার আর পছন্দ করে না বলে

ওর সাথে মেশে না —'হুঁ'-হুঁ', সাড়া দিয়ে সরে পড়ে। কিন্তু সে আবার ডালিয়ার রূপে মুগ্ধ। তা ছাড়া ওদের বাড়ীতে সে একজন প্রিয়পাত্র। কাজেই তার যাতায়াত কেউ অপছন্দ করে না।

ডালিয়া সাড়াশব্দ না দিলেও ভবেশ নিরাশ হয় নি, ওদের বাড়ীতে আসা কমায় নি। ডালিয়ার প্রেমিকদের ওপর সে ঈর্ষায় থাকে। আজ ছাদ থেকে এই অনুকূল দৃশ্যটা দেখতে পেয়ে ভবেশ একটা অস্ত্র হাতে পেল। সুবীরকে পর্যুদস্ত ও অপমানিত করবার জন্য সে এই দৃশ্যটার পিছনে একটা বিরাট ল্যাজ জুড়ে দিয়ে তার মেসোমশাইকে শোনালো। সে নাকি ঐ বাগানে অন্ধকারে আনাচে কানাচে ওদের অনেক এমন সব দৃশ্য দেখে ফেলেছে··· সব গুপ্ত দৃশ্য।

শুনে ডালিয়ার বাবা আরও রেগে উঠলেন। ঐ কাপুরুষ শয়তানটাকে তিনি তো শাস্তি দেবেনই! অতঃপর তিনি মেয়ের কাছে গিয়ে ধমকালেন খুব। ডালিয়া মুখের ভাব পরিবর্তন না করে অদ্যকার সত্য ঘটনা বলে গেল। সাপ যে তাকে কামড়াবার জন্য তেড়ে এসেছিল, সুবীর ওকে বাঁচাতে এসে শেষে নিজেই দংশিত হলো ইত্যাদি সব বললো। শুনে তিনি কিছুমাত্র বিশ্বাস করলেন না, বললেন—হুঁ। এখন আমার চোখে পড়ে গেছে কিনা তাই সাপে তাড়া করেছে, কামড়েছে আরো কত কী! হুঁ, ওসব চালাকি বুঝি! কাল থেকে আমি আর কাউকে ঢুকতে দেবো না বাড়ীতে, আর তোমাকেও অন্যত্র বেরোতে দেবো না—স্কুল-কলেজ যেখানে যাবে, সঙ্গে আমার ড্রাইভার থাকবে—এই আমার হুকুম!

ভবেশ এখন ডালিয়ার একটু অনুগ্রহ পাবার জন্য তার হয়ে বললো, আহা মেসোমশাই, আপনি ডালিয়াকে কেন শুধু শুধু বকছেন? ওর কথা তো সত্যিও হতে পারে! আপনি কোনো খোঁজ খবর নিলেন না, না নিয়েই—

পাঁচ দিন পর সুবীরের যখন পূর্ণ জ্ঞান ফিরে এলো, তখন সে দেখে, একটা কুঁড়েঘরে মলিন বিছানার ওপর সে শুয়ে, ঘরের চতুর্দিকে দারিদ্রের ছাপ। একজন কে স্ত্রীলোক সুবীরের মুখের ওপর ঝুঁকে আছে, তার হাতে একটা প্রদীপ মাথা ভর্তি রুক্ষ রুক্ষ কেশ, আর তার ডান হাতে একটা দুধের গ্লাস। সুবীর বুঝতে পারছে না যে, সে এখন কোথায় শুয়ে আছে। বিস্ময়ের সঙ্গে সে বললো, আমি এখন কোথায়।

বেদেনী বললো, তুমি এখন আমাদের ঘরে; আমরা বেদে। নাও বাছা, শীগ্‌গির দুধটুকু খেয়ে নাও! এই তো তুমি ভালো হয়ে উঠছো, আর দু-তিনদিনে সম্পূর্ণ সেরে উঠবে! দুধটুকু খেয়ে নাও এখন। আমাদেব ঘরে একটা গরু আছে—তাই তোমাকে একটু দুধ দিতে পারছি—তা না হলে আর কোথায় পাবো!

আবো তিনদিন পর সুবীর সেরে ওঠে এবং পথ-চলার শক্তি পায়। তবুও সে দুর্বলতা বোধ করছে। মোট আটদিন রাখার পর বেদে সুবীরকে নৌকায় করে নিয়ে আবার ব্যাণ্ডেলে নামিয়ে দেয়, কিন্তু নামিয়ে দিয়েই সে অমনি নৌকা নিয়ে প্রস্থান করে নি, তীরে দাঁড়িয়ে সুবীরের গমন দেখছিল।

সুবীব তীরে নামার অল্পক্ষণের মধ্যেই আর একটা কাণ্ড ঘটে গেল। ডালিয়ার বাবা ভবেশকে আর কিছু অনুচর নিয়ে তাঁর নৌকায় করে ফিরছিলেন। সুবীরকে দেখতে পেয়ে ভবেশই তাঁকে পূর্ব কথা সব স্মরণ করিয়ে দিল। ফলে তাঁর হারানো ক্রোধ আবার প্রজ্বলিত হয়ে উঠলো। স্তিমিত প্রায় অগ্নিতে ঘৃত ঢালা হলো। তীরে নেমেই তিনি তাঁর অনুচরদের আদেশ দিলেন ঐ শয়তানটার ওপর চাবুক চালাতে। ওরা যথা আজ্ঞা বলে চাবুক নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

বেশী চাবুক সহ্য করতে হলো না সুবীরকে। অসুস্থ শরীরের ওপর কয়েক ঘা পড়তেই সে আবার জ্ঞান হারাল। তবুও ওরা মেরে

যাচ্ছে! সুবীর মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে। আর ভবেশ মনে মনে হাসছে। ডালিয়ার বাবা জোর হুকুম দিলেন—ওকে চিত করে ধরো! চাবুকধারী দুইজন লোক চিত করতে গিয়ে দেখে, ও কোনো নড়াচড়া করছে না—মড়ার মত নিশ্চল। অচৈতন্য সুবীরকে দেখে ওদের প্রাণে ভয় ঢুকে গেল—মরে যায় নি তো? মরে গেলে ওদের প্রভুর আর কী! ওদেরকেই তো আজীবন জেলে পচতে হবে! ওরা ভীত কণ্ঠে বললো, বাবু, দেখুন—এর বোধ হয় জ্ঞান নেই—। শুনে তিনি বললেন, নেই! ওসব ন্যাকামি! বলে তিনি পায়ের জুতো দিয়ে খোঁচা মেরে দেখলেন সুবীরকে। শেষে অবস্থা বেগতিক বুঝে সবাই হাওয়ার মতো মিলিয়ে গেল।

বেদে সবই দেখেছে আড়াল থেকে। সবাই চলে গেলে সে এসে জ্ঞানলুপ্ত ও রক্তাক্ত সুবীরকে কাঁধে করে আবার তার নৌকায় তুললো।

এবারেও বেদের ঘরে সুবীর পড়ে রইলো টানা দশ দিন। বেদে-বেদেনী আবার বাঁচিয়ে তুললো। ওরা অনেক ওষুধ পত্র জানে।

সুবীরের বাড়ীর কেউ-ই এ খবর জানে না।

সুবীর তার পিতামাতার প্রতি ঘোর বিরোধী। তাঁদেরকে সে জেনেছে মহাশত্রু হিসেবে। সুবীর সবাইকে ক্ষমা করতে পারে, কিন্তু মহাপাষণ্ড পিতামাতাকে কোনদিনই ক্ষমা করবে না। মরে গেলেও না! তাই নিজেদের বাড়ীটাকে আপন গৃহনীড় বলে মনে করে না। সে বাড়ীতে তৃতীয় ব্যক্তির মতো পড়ে থাকতো এক কোণে। সুবীর তার প্রাণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পিতামাতার কাছে প্রকাশ করে নি, বড়ো মুখ করে কোনো কিছু চায় নি—এমন কি অসুখ করলেও সে নিজের মনে চেপে রাখতো উৎসব-সমাগমে। সুবীর কেবল মাত্র শাকান্ন ধরনের সাধারণ খাদ্য গ্রহণ করতো—নিম্নমাণের যেটুকু গ্রহণ না করলে অন্তত মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না। মিষ্টান্ন দুগ্ধজাত দ্রব্য, মাংস, ডিম ইত্যাদি সে পরিহার

করে যেতো। সুবীর দিনদিন অবশ্য এরকম ছিল না, পনেরো বছর পর্যন্ত সে খুব ভক্ত ছিল বাপ মায়ের। পনেরোর পর থেকে, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাকে যত সমস্যায় পড়তে হয়েছে, যত তাকে জীবন-যন্ত্রণা পীড়া দিয়েছে—ততই তার মন বিষিয়ে উঠেছে পিতামাতার প্রতি। সে তার জীবনদর্শন দিয়ে বিচার-রেখা টেনেছে পিতামাতার ওপর। কিন্তু সে তো নিজে অসহায় তার পক্ষে সম্ভব হয় নি পিতৃগৃহ সম্পূর্ণ রূপে পরিত্যাগ করে চলে যাওয়া—তাই তাকে পিতৃগৃহেরই একটা কোণ আঁকড়ে পড়ে থাকতে হয়েছে।

সুবীরের মুখস্থবিদ্যা ভালো নয়। মুখস্থ করতে তার প্রাণ ওষ্ঠাগত। প্রতি বৎসর যে কী করে পাস করে—তা একমাত্র সে-ই জানে, আর জানেন দেবী সরস্বতী। বিশেষ করে ইংরেজিটা তার আয়ত্তে আসে না। এত সব শেখার এত সব পাস করার সুবীরের তো প্রয়োজন নেই—সে জীবনই চায় নি, জন্মাতেই চায় নি। বাপ-মা জন্ম না দিলে আজকে ওকে আর বিষপান করে এইসব জীবন মরণ সমস্যায় লড়তে হতো না. সে তো পৃথিবীর কোনো সুখৈশ্বর্য কামনা করে না! আর তার ইংরেজি শেখার প্রয়োজনীয়তা বা কী? সে তো আর মেম বিয়ে করতে যাচ্ছে না, বা সৌভাগ্য কিনে আনবার জন্য সাহেবদের দেশের মাটি কামড়ে পড়ে থাকবে না! কী আশ্চর্য!—একদিন যাদের বাপ-ঠাকুরদারা একজোটে লাঠি উঁচিয়ে ধরেছিলেন সাহেব তাড়াবার জন্য, আজ তাঁদেরই বংশধরেরা কিনা সৌভাগ্য আমদানি করতে সেই সাহেবদের দেশে গিয়ে পড়ে থাকে।

সুবীরের শুধু আজকের দিনের সমস্যা নয়, যত দিন যাবে, সমস্যা ততই হয়ে উঠবে ঘনীভূত। ছাত্র জীবনের প্রধান সমস্যা হলো লেখাপড়া। তার পরেই তো দুঃখ-সমস্যার এক বিরাট গহ্বর সুবীরকে গিলে ফেলবে। সেই গহ্বরের সুকঠিন পাষাণ-প্রাচীর মানুষকে আবেষ্টিত করে রাখে; সেখান থেকে ভেদ করে আসা

মানুষের পক্ষে দুঃসাধ্য।

স্কুলের পণ্ডিতমশাই সুবীরকে খুব ভালোবাসতেন। তিনি বয়সে একটু বৃদ্ধ কিন্তু সংস্কৃতি ও ব্যাকরণে অত্যন্ত পারদর্শী। সুবীর প্রায়ই তাঁর কাছে যেতো, ব্যাকরণের প্রশ্নোত্তর দেখে-শুনে আসতো। একদিন সন্ধ্যায় সে গেছে পণ্ডিতমশাইয়ের কাছে; তিনি সব বলে-টলে দেবার পর তার হাতে একখানি চিঠি দিয়ে বললেন, সুবীর, তুমি এটা হেডমাস্টারের হাতে পৌঁছে দিয়ো—আমি সাত দিন ধরে অসুস্থ! ডাক্তার বলছেন, এখনও আমাকে আরো সাত দিন ছুটি নিতে—

কিন্তু সুবীরকে হেডমাস্টারের বাড়ী পৌঁছে নিদারুণ অপমানিত হতে হয়েছে। সে সোজা-সরল পথ দিয়ে সব সময় যাতায়াত করে না। শ্মশান ঘাট, গঙ্গার কূল, ক্ষেত, ঝোপ-ঝাড় বনবাদাড়ের ওপর দিয়ে সে স্বাচ্ছন্দ্যে গমন করে। মধ্য রাত্রে ঘর থেকে সে চুপি চুপি বেরিয়ে ঐসব স্থান নিঃশঙ্কে অতিক্রম করে মাছ ধরতে যায় নৌকা নিয়ে। সেই জন্যেই সে তার বন্ধুদের লীডার হতে পেরেছে!

যাই হোক। সে রাত ন'টায় হেডমাস্টারের বাড়ী পৌঁছোয়। স্বভাববশতঃ সে আর সোজা পথে ঐ বাড়ীতে প্রবেশ করে নি। হেডমাস্টারের গৃহের সম্মুখে নিজস্ব বাগান, পিছনে পুকুর। সময়-সংক্ষেপের জন্য মাঠ পেরিয়ে ঐ পুকুর-পাড় ধরে অন্ধকার চিরে আস্তে আস্তে সুবীর হঠাৎ এক কিশোরীর সামনে এসে পড়ে—আর সেই পড়ে—আর সেই কিশোরী অমনি ভীতকণ্ঠে চীৎকার শুরু করে দেয়।

হেডমাস্টারমশাই যেন ঠিক সেই মুহূর্তে মাটি ফুঁড়ে উঠলেন। চেঁচিয়ে বললেন, কে? কে ওখানে!

তিনি সন্ধ্যে থেকে পুকুর ঘাটে কন্যারত্নকে নিয়ে বসে গল্প করছিলেন। ভাদ্রের তপ্ত দিনের পর মৃদুমন্দ হাওয়া খেলে যাচ্ছে। হঠাৎ সিগারেট ফুরিয়ে যাওয়ায় অন্দর মহলের দিকে

তিনি পা বাড়িয়েছিলেন ; সিগারেট নিয়ে ফিরছেন—তখন কন্যার চীৎকার শুনে দৌড়ে এলেন।

হেডমাস্টারের হাত থেকে সিগারেটের প্যাকেট খসে পড়ে গেছে মাটিতে, বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরেছেন সুধীরের ঘাড়। হুঙ্কার ছাড়লেন—কে! কি চাস এখানে? চল শয়তান, তোকে পুলিসে দেবো—

এরকম একটা আকস্মিক কাণ্ড ঘটে যাবে, সুবীর তা কল্পনাই করতে পারে নি। তা হলে সে সামনের পথ দিয়ে আসতো। এই অবস্থায় সে সত্যিই ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছে। শুধু বললো, স্যার, আমি---সুবীর !

সুবীরের একটা হাত বজ্রমুষ্টিতে চেপে তাকে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে চললেন তিনি অন্য হাতে ধরে রেখেছেন কন্যার একটি হাত সুবীরকে তিনি ছাত্র হিসেবে চিনতেন। উঠানের আলোয় ওর মুখটি দেখে বললেন—অ্যাঁ! সুবীর! তুমি অন্ধকারে চোরের মতন চুপি চুপি আমার বাড়ী ঢুকে আমার মেয়ের কাছে এসেছো। ইস্ এত নোংরা হয়েছো! ভালো ছেলে জানতাম তোমায়—আজ চিনছি—হারাম জাদা, শয়তান! বাড়ীতে মা-বোন নেই একটাও; তুমি আমার মেয়ের দিকে নোংরা হাত বাড়াও—

হেডমাস্টার বলে চললেন।

সুবীর নীরবে অপমান হজম করে গেল। তার সমস্ত মুখ লাল হয়ে গেছে—বুঝি এক্ষুণি রক্ত বেরুবে ফেটে! অন্য কেউ বললে সুবীর এতক্ষণে তাকে মাটিতে ফেলে তার বুকে চেপে বসতো—কিন্তু এঁর গায়ে হাত দেওয়া যায় না। এই হেডুটার মুখ সুবীর এক্ষুণি চূর্ণ করে দিতে পারে—তার পকেটে আছে অস্ত্র—পণ্ডিতমশাইয়ের দেওয়া চিঠিটা—

সুবীর যদি কিছু না বলে ঐ চিঠিখানা ছুঁড়ে মারতো হেড-মাস্টারের গায়ে—তা হলে হয়তো ফল হতো। কিন্তু সে তা করে নি, সে নত মুখ তুললো, তার চোখে পড়লো মেডমাস্টারের কন্যাটি।

ঐ মেয়েটাকে কোনোদিন দেখে নি। সুবীর বললো, স্যার, আমাকে কেন এসব বলছেন? আমি কোনো খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে আপনার বাড়ী আসি নি—আমি আপনার কাছেই এসেছি' আপনার জন্য একটা—

ঠাস করে এসে পড়লো সুবীরের গালে একটা চড়, তার কথা অসমাপ্ত রয়ে গেল। পরপর আরও তিনটে চড় এসে পড়লো—সে চোখে অন্ধকার দেখছে। তিনি আবার হুঙ্কার দিয়ে বললেন—চালাকি পেয়েছো! অন্ধকারে হাতে নাতে ধরে ফেলেছি কিনা—তাই আমার কাছে আসছিলে! ওসব আমার জানা! তোমাকে চাবুক পেটা করা উচিত! কালকেই তোমায় সোজা স্কুল থেকে তাড়াবো—আর কোনো স্কুল ঢুকতে দেবে না—

তিনি নাদুস-নুদুস হিন্দুস্থানী দারোয়ান দুটোকে ডেকে সুবীরের ওপর বেত চালাতে বললেন! তারা সুবীরের জামা খুলে খালি পিঠে বেত চালাতে লাগলো। প্রভুর দেওয়া ডাল রুটির জোর কতখানি—তা ওরা দেখিয়ে দিল।

হেডমাস্টারের এক বিধবা বড়ো ভগিনী ছিলেন। তিনি চেঁচামেচি শুনে ওপর থেকে নীচে নেমে এসে দারোয়ানদের বললেন—ওরে থাম, থাম! কারে মারিস! ও কাদের ছেলে? ও কী করলো আবার? ওরে থাম—ওকে ছেড়ে দে—

ঠিক সেই সময় সুবীরের সৌভাগ্য বশতঃ বেত ভেঙে গেল। তবুও দারোয়ান বেত্র-খণ্ড দুটো মেপে দেখছে, কোন্‌টা বড় খণ্ড! ঐ দয়ালু মহিলা এসে সুবীরের একটা হাত ধরে কোমল কণ্ঠে বললেন, যাও বাছা, বাড়ী চলে যাও। আর কখনো বাগানে ঢুকো না—

সুবীর জামা তুলে নিয়ে প্রস্থান করলো! যাবার সময় শুনতে পেল, ঐ মহিলাটি বলছেন, ছিঃ, অমন করে মারে ছেলেটাকে! ও না হয় বাগানে ঢুকে দুটো ফুল-কি ফল তুলেছে—কত তো এমনিই

নষ্ট হয়—তার জন্য এমন করে মারতে আছে!

সুবীর সোজা পণ্ডিতমশাইয়ের ঘরে এসে তাঁকে সব বললো! তিনি শুনে খুব দুঃখ পেলেন। আর সুবীর অদৃষ্টের উপরে দোষারোপ করল।

ডিসেম্বর মাসে পরীক্ষার পরে সুবীর তার মামার বাড়ী থাকাকালীন একটা বাচ্চা মেয়েকে ট্রেনে কাটার হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল।

বালীগঞ্জ স্টেশনের লেভেস ক্রসিং-এর অসংখ্য লাইন। সেই লাইনের ওপর বিক্রেতারা জিনিস বেচে। একদিন মামার নির্দেশে সুবীর কলা কিনতে এসেছে ওখানে, দাম বেশী চাওয়ায় সে ইতস্তত: করছে! বাড়ীতে হলে সে একদামে কিনে ঘরে ফিরে যেতো কখন। যেহেতু মামাকে ভালোবাসে—মামার পয়সা অযথা নষ্ট করবে না। সে দেখলো, এক ভদ্রমহিলা কলা কিনছেন, সঙ্গে একটি ফুটফুটে বাচ্চা মেয়ে। কলা কিনে ফিরছে, লাইনে ট্রেন আসছে, দু'পারে লোক দাঁড়িয়ে, সুবীরও দাঁড়িয়ে। ঐ মহিলার বাচ্চাটি এক ফাঁকে মাকে ছেড়ে গুটিগুটি পায়ে জিনিস দেখতে দেখতে এখন ঐ লাইনের ওপর একেবারে উঠে পড়েছে সরল মনে ও পরম নিশ্চিন্তে। ট্রেনে আর ওর মধ্যে ব্যবধান স্বল্প—দু'পারের লোক একেবারে হৈ হৈ করে উঠলো। কিন্তু কে এগিয়ে যাবে বাঁচাতে নিজের পৈতৃক প্রাণের মায়া ত্যাগ করে! তৎক্ষণাৎ সুবীর কলা ফেলে ঝাঁপিয়ে পড়লো লাইনে, চক্ষের নিমেষে ওকে তুলে নিয়ে লাফ দিল ওপারে। সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনটা ঝড়ের মতো সুবীরের পাশ দিয়ে গেল। লোকেরা তখন ওকে ধন্য ধন্য দিল পুরস্কার হিসেবে।

ভদ্রমহিলা যখন দেখতে পেলেন, তখন এমন ভাবে ধাবিত হলেন যে ঐ কলাওয়ালা তাঁর হাত ধরে না ফেললে তিনিও কাটা পড়তেন।

প্রথমে তিনি কন্যাকে বুকে চেপে ধরলেন। তারপর সুবীরকে

বললেন, বাবা, তুমি না বাঁচালে আমার মেয়েকে আর জীবনে পেতুম না! তোমাকে আমার কোটি আশীর্বাদ! শেষে তাকে বাড়ীতে আসতে অনুরোধ করলেন।

সুবীর শুধু ঐ নিষ্পাপ সরল বাচ্চাটির মুখপানে চেয়ে ওকে বাঁচিয়েছে—ওর মা বা আর কারো জন্য নয়। সে শেষে অনুরোধে পড়ে তাঁর বাড়ী এলো। তাঁর শ্বশুরালয় মহাত্মাগান্ধী রোডে। এই ভদ্রমহিলার নাম ইন্দিরা দেবী। এঁর গৃহেই সুবীর অতঃপর স্থান পেয়েছিল।

সুবীর ইন্দিরা দেবীর আদর-আপ্যায়নে একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে! এইসব যা-হওয়া স্ত্রীলোকদের সংস্রব ও ভালোবাসা সুবীর মোটেই পছন্দ করে না। কিন্তু সে ওঁর হাত থেকে অব্যাহতি পেল না।

কন্যারত্নকে ছেড়ে তিনি একদিনও বাঁচতে পারতেন না। কন্যার মৃত্যু হওয়া মানেই মাতার মৃত্যু। সুবীরের মামাকে ধরে বললেন, আপনার ভাগ্নেটিকে আমাকে দিতেই হবে। আমার তো কোনো পুত্র নেই - ও আমার পুত্র স্থানে থাকবে। আমাদের বিরাট বাড়ীটা প্রায় ফাঁকাই পড়ে, ওর কোনো কষ্ট হবে না। আমি ওকে কাছে রেখে লেখাপড়া শেখাবো।

সে তো পিতৃগৃহ ত্যাগের জন্যই পাগল। এই প্রস্তাবটা কিছুটা মুক্তির পথ বটে! শয়তান বাপ-মায়ের গৃহে সে আর থাকতে চায় না। সে পিতার একমাত্র পুত্র—গৃহে টিকতে পারলে ভবিষ্যতে বিপুল সম্পত্তির মালিক হবে। সে ঐ সম্পত্তিকে ঘৃণা করে—কামনাও করে না। সুবীর না খেতে পেয়ে ঘরে গেলেও ঐ শয়তানদের সম্পত্তিতে কোনদিন হাত বাড়াবে না। তেমনি কোনো পিতামাতারও অধিকার থাকতে পারে না সন্তানের জন্ম দেবার। হেডমাস্টারের হাতে সে যা অপমানিত হয়েছে—আর ঐ স্কুলে পড়ার শখ নেই। কলকাতার স্কুলে ভর্তি হয়ে নতুন করে পড়াশুনা শুরু

করবে। আয়ের একটা ব্যবস্থা হলে সুবীর বাপের বাড়ীর ছায়াও মাড়াতে যাবে না।

কিন্তু ইন্দিরা দেবীর প্রস্তাবে সুবীরের বাধা। তিনি স্বয়ং একজন মা—কাজেই তিনি একই অপরাধে অপরাধী, একই পাপে পাপী! কিন্তু এই সমস্যার সমাধান হলো। তিনি অন্যের মা, পাপী ও অপরাধী হতে পারেন, কিন্তু সুবীরকে তো জন্ম দেন নি; সে অন্ততঃ তাঁর জন্য পৃথিবীতে জীবন-যন্ত্রণা ভোগ করছে না। সুবীরের দুঃখ কষ্টের এতটকুর জন্য তিনি অন্ততঃ দায়ী নন। তিনি তাঁর কন্যার কাছে অপরাধী, কন্যার জীবন-যাতনার জন্য দায়ী! তাঁর মেয়ে ক্ষমা করতে পারে!

সুবীর শেষে রাজী হয়েছে,—সাপের গর্ত চেয়ে ইঁদুরের গর্ত তবু ভালো। এর পর সে একদিনও ব্যাণ্ডেলে বাপের বাড়ী যায় নি।

। আট ।

সুবীরের নৌকা এখন উত্তরমুখী। সে অকূলে পাড়ি দিয়েছে।

ঐ নৌকা থেকে সুবীর অনেকগুলো জিনিস পেয়েছে—একটা মাছ ধরার জাল, ছিপ, কিছু খাবার, দুটো হারিকেন, একটা লোহার উনান, দু-চারটে অন্যান্য জিনিস, উত্তম বঁড়শি, সর্বোপরি একশো পঞ্চাশ টাকা।

ওর অর্থ চিন্তা অনেকটা দূরীভূত। হাতে এখন নগদ আড়াইশো টাকা আর দীপালীর সোনার চুড়ি দুটো। মোট সাড়ে পাঁচশো টাকা! দৈনিক দু'টাকা ব্যয়ে এই টাকায় তার মেয়াদ নয় মাস!

কিন্তু অল্পদিনেই তার নির্দিষ্ট মেয়াদ কমে গেল। এখনো বর্ষা, পশলায় পশলায় বৃষ্টি—সে দাঁড় টানতে বিব্রত। নৌকার পাল, ছাউনি ও রান্নার সরঞ্জাম যোগাড় করতে তার কিছু অর্থ ব্যয়িত হল।

সুবীর রাতদিন জলে ভাসছে, দেখছে শুধু গঙ্গায় ঘোলা জল। যেন মাঝ সমুদ্রে দিক হারিয়ে ফেলেছে ঘন কুয়াশার মধ্যে নিজেকে করে দিয়েছে আত্ম সমর্পণ—বাতাস তাকে যেদিকে নিয়ে যাবে, সেদিকে সে যাবে।

ছাউনির মধ্যে খড়ের বিছানায় সুবীর শয়ন করে, খড়েরই বালিশ। এতে ওর কোনো দুঃখ নেই। শয়তান বাপ-মায়ের কাছে সে তো এখন নেই, তাঁদের পয়সায় খাচ্ছে না, পরছে না, কোনো জিনিসও ব্যবহার করছে না—এতেই সুবীরের অন্তর শান্তি পেয়েছে। নিজের পয়সায় পোড়া রুটি জুটলেই ঈশ্বরের আশীর্বাদ বলে মনে করবে।

আসন্ন শীতের জন্য সে একটু উদ্বিগ্ন। সারাটা শীত তো সমানে এই জলের ওপর কাটানো যায় না। তাই ভাবছে, আপাততঃ কাশী পর্যন্ত গেলে মন্দ হয় না। সেখানে নকুলবাবুর জ্যেঠা আছেন—

দীপালীর সোনার চুড়ি দুটো সুবীর খড়ের বিছানায় লুকিয়ে রেখেছে, টাকাগুলোও সেখানে! প্রয়োজন মতো অল্প বার করে। নৌকায় চুরি-ডাকাতি হলে গঙ্গাজল পান ছাড়া ওর আর কোনো উপায় নেই।

সে দিনে-রাতে একবার মাত্র লোহার উনানটা জ্বেলে রুটি তৈরী করে। চালের দাম আটার চেয়েও বেশী, অত খরচা সম্ভব না। ভাত তো শুধু খাওয়া যায় না সঙ্গে দু-তিন রকম তরকারী লাগে। কিন্তু কিছু না হলেও রুটি খেতে পারে। কখনো সে ছাতু খায়।

শরৎ রাণীর মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য সে গঙ্গাবক্ষে বসে লক্ষ্য করে। চারিদিকে সোনালী ঝলমলে রোদ্দুর—দিগন্তরেখা পর্যন্ত স্পষ্ট দেখতে পায়। আকাশে শঙ্খচিলে চক্কর মারে। গঙ্গার এপারে ওপারে ক্ষেত, বিচিত্র শস্য-ফসলে পূর্ণ। সূর্য-কিরণ-রশ্মিতে সেখানে অপরূপ বর্ণচ্ছটার সৃষ্টি হয়। দর্শনে দূর হয় মনের খেদ। রৌদ্র-আভায় হয়ে ওঠে সবকিছু স্নিগ্ধ ও সুন্দর। আর গঙ্গার প্রাণময় স্নিগ্ধ বাতাস বয়, এই বায়ু শুধুমাত্র সুবীরের মন-প্রাণ জুড়ায় না, তার তরীকে ঠেলতে অনেক সময় প্রধান রূপে সাহায্য করে। নদীর দুই পারে পালিত পশু চরে বেড়ায়—গরু, মহিষ, গাধা, ছাগল ইত্যাদি সব। দুগ্ধবর্ণ গরু আর ঘোর কৃষ্ণ বর্ণের মহিষ দেখে তার মনে হয় যেন ওরা একই প্রাণী, কিন্তু ভিন্ন জাতি। আমেরিকায় যেমন পাশাপাশি সাহেব আর নিগ্রো বাস করছে।

কাঠুরিয়া যখন কাঠে কুড়ুল দিয়ে কোপ মারে, সেই কুড়ুল নেমে আসার দৃশ্যটা সে দেখতে পায়, কিন্তু শব্দটা একটু পরে শোনে। ওর মনে হয়, কে যেন শব্দটাকে বুঝি বন্দী রেখে ছিল। পাড়ে যখন ধোপা কাপড় কাচে, তখনো একই ব্যাপার।

সুবীর মাছ ধরে ভোরবেলায় বিক্রি করে দেয়। এতে কিছু আয় হয়। আজকের ভোরেই তো সে একটা আড়াই কিলো ওজনের মাছ মাত্র পাঁচ টাকায় বিক্রি. করে দিল। এক বুড়ো প্রাতে গঙ্গায স্নান সেরে প্রথমোদিত সূর্যের দিকে জোড়হাতে বুড়ো আঙ্গুলে পৈতে জড়িয়ে কি সব বিড়বিড় কবে বকছিল। সুবীব মাছটা হাতে নিয়ে ঐবুড়োর সম্মুখে এসে বিক্রির বাসনা জানাতে বুড়ো তো সেই মুহুর্তে ওব হাত থেকে মাছটাকে ছোঁ মেবে নিল তারপব গাঁট থেকে পাঁচ টাকা সুবীরের দিকে ছুঁড়ে দিযেই দৌড়োতে দৌড়োতে প্রস্থান করলো বাড়ীব দিকে।

কোনদিন সে মাছ ভাজা কবে খায়নি। মাছ বেচায় তাব ভালো আয় হচ্ছে। এইসব মাছ ধরাব সময়ে তাব মনে পড়ে গ্রামের কথা—মৎসবাজদের প্রতি অতিবিক্ত প্রেমবশতঃ সে তাকে ধরে আবাব জলে ছেড়ে দিতো—এই ধরা-ছাড়ার মধ্যে একটা অপূর্ব আনন্দ পেতো সে।

মাঝে মাঝে সুবীর চড়ায় বা তীরে নৌকা বাঁধে। কখনো ঘাটেও বাঁধে। নৌকা বেঁধে খাওয়া দাওয়া সেরে ঘুমোয়। মাঝে মাঝে লোকালয়ে গিয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস কিনে আনে।

সে একদিন গ্রামে ঢুকে জিনিস কিনতে গিয়ে ঢাক-ঢোলের আওয়াজে আকৃষ্ট হয়ে দেখলো দেবী দুর্গামূর্তি। একি দুর্গাপূজা শুরু হয়ে গেছে! আজ কি তিথি! অষ্টমী না নবমী! ধুনোগন্ধ-বাদ্য মুখোবিত স্থানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেবীকে ভক্তিভবে প্রণাম করে চলে আসবার সময় তার বড়ো ইচ্ছে হলো পুরোহিতকে বা অন্য কাউকে একবার জিজ্ঞেস করে কী তিথি আজ? কিন্তু সবাই তাকে গেঁয়ো ভাববে—তাই জিজ্ঞেস করলো না।

দীর্ঘদিন ধরে সে নৌকায় ভাসছে। এক সাধুকে গঙ্গার ধারে ভোরবেলায় বসে থাকতে দেখে সে আকৃষ্ট হয়ে সামনে এলো। দেখলো, সুদর্শন সাধু উদিয়মান সূর্যের দিকে ধ্যানমগ্ন। অল্পক্ষণের

মধ্যে তাঁর চোখ খুললো—যেন ভোরে পদ্মের পাপড়ি ধীরে ধীরে মেলছে। চ্যালারা তাঁকে ঘিরে বসলো।

সাধু কথা বলতে শুরু করলেন। একজনের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন, তুই ফিরে যা—পায়ের ক্ষত নিয়ে এখনো একমাস ভুগবি!

লোকটা আশ্চর্যে খুব ভক্তিভরে প্রণাম করে বললো, বাবাজী আপনি অন্তর্যামী। তা না হলে মনের কথা আমার জানলেন কেমন করে?

এরকমভাবে তিনি আরো ক'জনের উদ্দেশ্যে বলে দিলেন। সুবীর বুঝতে পারলো, এ সাধু সামান্য নয়। এর কাছেই সে দীক্ষা নিয়ে চির শিষ্যত্ব গ্রহণ করবে। এই জলে জলে ঘুরতে আর ভাল লাগে না। সে ক্লান্ত সারাটা জীবন যদি জলে জলেই মরতে হয়—তার চেয়ে এই সাধুবাবার আশ্রয়ে জীবন কাটিয়ে দিলে মন্দ কি? তাঁর দিকে এগিয়ে যাবার জন্য সে যেই একটু পা বাড়িয়েছে, তখন সাধুবাবা চ্যালাদের বললেন, তোরা সরে যা—ঐ ছেলেটাকে আসতে দে—

সুবীর পেছন দিকে ছিল বলে কেউ-ই এতক্ষণ লক্ষ্য করেনি, এবার সবাই ওর দিকে ফিরে তাকালো।

সে সাধুবাবাকে ভক্তিভরে প্রণাম করে বললো, বাবাজী, আপনার শ্রীপাদপদ্মে আমার স্থান হোক। আমাকে দীক্ষা দিয়ে সেবক করে নিন!

তিনি লঘুভাবে ওর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন, বললেন, এ পথ তোদের জন্য নয়—ফিরে যা নৌকায়। তুই তো গৃহ ছেড়েছিস তবু বলছি, তুই শীঘ্র আশ্রয় পাবি বেটা, এ পথে না এসে কথা শোন!

বাবাজী গ্রহণে রাজী থাকলে সুবীর তো রাজী। কিন্তু হায়!

এবার সাধুবাবা করমণ্ডল হাতে উঠে দাঁড়ালেন। অন্যেরাও

দাঁড়ালো তাঁর সম্মানার্থে। বললেন তোদের কাল যা বলেছি, আজও তা বলছি। মানুষেই কেবল নিজেদের সম্মানের শ্রেণীভেদ করেছে। প্রকৃতির চোখে আমরা সবাই সমান,—মহা পণ্ডিত যা মূর্খও তা, রাজারাও যা ভিক্ষুকও তা! সবাই মরে, সব শব পচে। এটা প্রকৃতির বিচার। তীব্র ভূমিকম্পে দরিদ্র চাষীর তুচ্ছ কুটীর ভেঙে পড়লে, ভেঙে পড়বে রাজপ্রাসাদও।

দুর্গাপূজোর পর একদিন স্থবীর পৌঁছোলো কাশীতে। নৌকটা ঘাটে বেঁধে রাখালো। ঈপ্সিত মন্দিরের চূড়াদর্শনমাত্র তীর্থযাত্রীরা সহসা যেরকম উদ্বেলিত হয়ে ওঠে, সেইভাবে স্থবীর ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে উঠছে। পিচ্ছিল সেই সিঁড়ির ওপর সে হঠাৎ পড়ে গেল পা পিছলে সঙ্গে সঙ্গেই অজ্ঞান।

একজন মাঝি এসে ওর মুখে-চোখে গঙ্গার জল ছিটিয়ে দিতে জ্ঞান ফিরলো। মনে পড়লো সব। স্থবীর উঠে দাঁড়াতে মাঝি তার নৌকায় ফিরে যাচ্ছে দেখে মাঝিকে পিছন থেকে ডাকলো: স্থবীর, শুনুন, আপনি!

বললো, আপনি কি এখানে থাকেন? আমি তো এখানে কিছু চিনি-জানি না! বহুদূর থেকে ক'মাস ধরে নৌকায় ভেসে আসছি—

মাঝি জিজ্ঞেস করলো, কোথা থেকে আসছো?

ডায়মণ্ড হারবার থেকে আসছি।

এই শুনে একটা শব্দ করে ওঠে—অ্যাঁ!

এই মাঝি আর কেউ নয়, স্বয়ং জটাধর! স্থবীর তাকে নিজের নৌকায় এনে বসালো। জিজ্ঞেস করলো, আপনার কি নাম?

আমার নাম—আমার নাম—কি হবে জেনে? আমি একজন মাঝি।

তাকে ইতস্ততঃ করতে দেখে স্থবীর আর তা জিজ্ঞেস করলো না। মাঝির অনাহারক্লিষ্ট শুষ্ক মুখখানি দেখে স্থবীর বললো, এই বেলা পর্যন্ত আপনার কিছু খাওয়া হয়নি বলে মনে হচ্ছে!

আসুন—আমার হাতে অনেক খাবার রয়েছে, বলে ছখানা রুটি আর মাছ ভাজা এনে মাঝিকে দিল।

সে প্রথমে আপত্তি করে পরে খেলো। মাঝির খাওয়া দেখে সে যে এই বিকেল অবধি অভুক্ত আছে সুবীর বুঝলো সে গতকাল মাছ ভেজে রেখেছিলো, সবগুলো মাঝিকে দিয়েছে। নিজের জন্য অবশিষ্ট তিনটে রুটিও এবার তাকে দিলো।

উপবাসী মাঝি গুরুভোজন করে এখন সুবীরের প্রতি অত্যন্ত তুষ্ট। কূট বুদ্ধিমান সে, দয়াপরবশ হয়ে অভুক্তকে ভুরি ভোজন করায়নি। শুধু মিষ্টি কথায় তো মানুষ সন্তুষ্ট হয় না বা সাহায্য করে না। খাইয়ে মানুষকে সন্তুষ্ট করা যায়, সহযোগিতা পাওয়া যায়।

খাওয়ানোর পর সে বললো, আচ্ছা মাঝি, আমাকে একটা থাকবার ঘরটর দেখে দিন না। আমি তো এখানে একা এই সবে এলুম! মাথা গোঁজার একটু আশ্রয় চাই। এখানকার মাঝি-মাল্লারা যে অনেকজন মিলে একত্রে এক জায়গায় থাকে? তাহলে ওরকম একটা আড্ডার সন্ধান দিন।

তুমি আপাততঃ দু'দিন আমার ঘরে থাকতে পারো। মাঝি বললে।

আচ্ছা, আপনি আড্ডায় থাকেন না, আলাদা?

মাঝি জানালো, ভাড়া-করা ঘরে আলাদা-আলাদাভাবে থাকে। সুবীর ভাবলো, মন্দ কি? সে অমনি রাজী হয়ে গেল।

সন্ধের পর মাঝি ওকে নিয়ে নিজের ঘরে এসে আলো জ্বেলে ভিতরে নিয়ে এলো। ভিতরে এসে সুবীর দেখতে পেল একটা ঘরে দুটো বিছানা। সে তৎক্ষণাৎ একটার ওপর বসে পড়লো। আঃ! কতদিন পর আজ একটা সত্যিকারের বিছানা! তুমি একটু বসো, আমি আসছি। মাঝি বাইরে গেল। অমনি সুবীর বিছানার ওপর শুয়ে পড়ে। অল্পক্ষণের মধ্যে তার চোখ জুড়ে এলো।

॥ নয় ॥

পরদিন সকালে সুবীর মাঝির সঙ্গে গিয়ে নৌকা থেকে তার মালগুলো নিয়ে এলো। মাঝির কাছে কয়েকটা দিন থাকবে, স্থির করেছে।

সুবীরের নৌকায় কিছু আটা, ঘি, ছাতু ইত্যাদি ছিল। তাই দিয়ে প্রাতরাশ বানিয়ে মাঝিকে অর্ধেক দিয়ে সে নিজের জন্য নিল। সুবীরের টাকা প্রায় শেষ। দীপালীর চুড়ি দুটো তাব এবার শেষ অবলম্বন।

সে কাল থেকে মাঝিকে দেখছে কেমন যেন অন্যমনস্ক খুব ঋণগ্রস্ত মানুষ বুঝি। তার শরীর দেখলে বোঝা যায়—মাঝি অর্ধাহারে অনাহারে আছে। সুবীর মাঝির জন্য দুঃখ অনুভব করলো।

এবার সুবীর চিন্তা জগতে। কোথায় এখন যাওয়া যায়?··· যে চিঠিটা পকেটে আছে, তা নিয়ে একবার নকুলবাবুর জেঠার সঙ্গে দেখা করলে হয় না?

এক সময় সে রান্নাঘরে ঢুকলো, ঢুকে দেখলো রান্নার সামগ্রী বিশেষ কিছুই নেই—প্রায় ফাঁকা। একটা পাত্রে অল্প চাল পড়ে আছে। সুবীরের কাছে আটা-ডাল আছে, তা-ই দিয়ে সে চটপট খাবার বানিয়ে ফেললো। খেয়ে-দেয়ে শোবার ঘরে ফিরে এলো সে।

আর একই ঘরে দুটো খাটিয়া কেন? একটা খাটিয়ার ওপর মেয়েদের মাথার রঙিন ফিতে পেল সে তারপর উঁকি-ঝুঁকি মেরে এদিক ওদিক দেখতে লাগলো, অনেক মেয়েলি জিনিসের সন্ধানও পেল। সুবীরের ধারনা জন্মালো, মাঝির বউয়ের বুঝি এইসব—।

এবার খাটিয়ার তলায় তাকাতে মেয়েদের একজোড়া চটি দেখতে পেল। তার মনে হলো, সে এরকম চটি কোথায় যেন দেখেছে। হতেও পারে, রাস্তাঘাটে মেয়েদের তো অভাব নেই। পিঁপড়ের সারির মতো মানুষ এখন পথ দিয়ে চলে। পিপীলিকায় পিপীলিকায় দেখা হলে ওরা পরস্পরে যে চুমু প্রদান করে, মানুষে শুধু তা করে না, এ ছাড়া –

দুপুর শেষ হতে চলেছে। সুবীর ভাবলো মাঝি এখনো এলো না—সে তার জন্য ডাল-রুটি তৈরী করেছে—

তক্ষুনি মাঝির গলা পাওয়া গেল। টাঙ্গা নিয়ে দুপুরের শেষে এখন ঘরে ফিরছে। ঘরে প্রবেশ করে সুবীরকে বললো, সারাদিন তোমার অসুবিধা হয় নি তো? আমাকে এখুনি আবার হাসপাতালে যেতে হবে—ভাইঝির অসুখ! তুমি আমার সাথে একবার যাবে? চলো না—

বাঃ? আপনি সেই সকালে বেরিয়ে গেছেন—আর এলেন! আপনার জন্য ডাল-রুটি তৈরী করে রেখেছি এদিকে। এখন খেয়ে নিন, হাত মুখ ধুয়ে এসে ওগুলো আগে খেয়ে নিন। তারপর যাবেন—

আরে তোমার নামটা যে জানা হয়নি!

সুবীর আগে থেকেই ভেবে রেখেছিল, বলল রবি!

ভাই রবি, তুমি আমার জন্য খাবার তৈরী করতে গেলে কেন? আমার ঘরে কিছুই নেই; অতিথি হিসাবে বরং তোমাকে খাওয়ানো আমার উচিত। তুমি সেই সুদূর থেকে খালি হাতে একা এখানে এসেছো—আর কিনা তোমার সামান্য খাবার থেকে বার বার আমায় খায়াচ্ছো।

আমাকে এতটা স্বার্থপর ভাববেন না! ঈশ্বরের দয়ায় আমার কিছু জুটলে তার সাথে আপনারও হবে; তাছাড়া কেউ তো কাউকে আজীবন খাইয়ে যাবে না। সঙ্কোচ না করে খেয়ে নিন।

সত্যিই প্রাতঃরাশ ছাড়া কিছু খায় নি। ক্ষুধাগ্নি নির্বাপিত হলে সে এই মহাপ্রাণ ছেলেটির মঙ্গল-কামনা না করে পারলো না।

মাঝির টাঙ্গায় উঠে সুবীর সম্পূর্ণ আশ্চর্য হয়ে গেল। সে তাকে না জিজ্ঞেস করে পারলো না—এই টাঙ্গা আপনার?

হ্যাঁ ভাই।

কিন্তু কাল যে আপনি 'মাঝি' বললেন—

হ্যাঁ—মাঝিও বটে, আবার গাড়োয়ানও বটে!

সুবীর বিস্ময় প্রকাশ করলো, বাঃ, কেমন সুন্দর শ্বেতঘোড়া!

কাল আমাকে ঘাটে দেখেছিলে—তার কারণ, এই গাড়িটা মেরামত হচ্ছিল। তাই নাগাল না ধরে দাঁড় ধরেছিলুম।

গাড়িতে বেশী কথা হল না ওদের। সুবীর ভাবলো, মাঝি তার ভাইঝির অসুখ হঠাৎ জানতে পেরে বুঝি দেখতে যাচ্ছে হাসপাতালে।

হাসপাতালে রোগীব বেডে পৌঁছে সুবীর চমকে ওঠে। বেডে একটা ষোল-সতেরো বছরের মেয়ে। শরীর তার কৃশ, এখন সে ঘুমিয়ে। মেয়েটির মুখখানি দেখে চেনা চেনা মনে হলো। কিন্তু কে?

সে স্মৃতি হাতড়াতে লাগলো। হঠাৎ স্মরণে এলো। এই মেয়েটাকে সে ইন্দিরা দেবীর গৃহে দেখেছে আসতে। ওর নামটা কী যেন—! অতসী! না, না। এবার মনে পড়েছে, এর নাম তাপসী! এর আপন মায়ের খুড়তুতো বোন হলেন ইন্দিরা দেবী। কিন্তু এ এখানে এলো কী করে?

তাপসী একটু নড়ে উঠে। অমনি সুবীরের হাতের টুপিটা পড়ে গেল ঝুপ করে। নৌকাপথে সস্তায় এই টুপি কিনেছিল কড়া রোদ্দুর আটকাতে। পাছে তাপসীর চোখে সে ধরা পড়ে, ও ইন্দিরা দেবীকে বলে দেয়—এই আশঙ্কায় টুপিটা দ্রুত তুলে মাথায় চড়িয়ে দিল।

সে একটু নড়লেও জাগে নি, পাশ ফিরে শুয়েছে। মাঝি ওর বালিসের তলা থেকে ডাক্তারদের দেওয়া ব্যবস্থাপত্র বার করে পড়ছে পড়ার শেষে ভাঁজ করে তাপসীর পানে চাইলো। ভাবলো ওকে ডাকবে, কি ডাকবে না?

মাঝি বেডরে ধারে বসে ওর তপ্ত কপালে ধীরে ধীরে হাত রাখলো। তাপসী এবার তার রক্তিম ও ক্লান্ত চোখ মেলে চাইলো। মাঝি বললো, পুষ্প! সাড়া না পেয়ে আবার বললো, পুষ্প, আজ কেমন লাগছে?

তাপসী খুব ক্লান্তস্বরে বললো, কাকু! এসে গেছো তুমি—

তাপসীকে চোখ মেলাতে দেখেই সুবীর চট করে বেডের মাথার দিকে দাঁড়িয়েছে। সে ওকে নিজের অস্তিত্ব মোটেই জানাতে চায় না। তার কেবল মনে হচ্ছে—হাসপাতালে না দেখতে এলেই ভালো হতো! কিন্তু ওকে দেখবার জো-টি নেই তাপসীর। সে বেডের মাথাব দিকে দাঁড়িয়ে। তা ছাড়া মাথার চুল (নৌকাপথে একদম চুল কাটে নি বলে বড়ো বড়ো চুল) তার টুপির সীমানার বাইরেও দৃশ্যমান। চোখের পাশ দিয়ে ঝুলছে এক গোছা। এতদিন জলে জলে ঘুরে গাত্রবর্ণ তামাটে।—কাজেই ওকে এখন সনাক্তি করা অসম্ভব।

মাঝির 'পুষ্প'-ডাক শুনে সুবীরের সন্দেহ হলো—এ আবার 'পুষ্প হতে যাবে কেন? এর নাম তো তাপসী! কিন্তু পরক্ষনে তাপসী 'কাকু' বলতে সে বেশ আশ্চর্য? তবে কি এর নাম সত্যিই 'পুষ্প'? মাঝির কোনো ভাইঝি? কিন্তু সে কি এই মেয়েটাকে ইন্দিরা দেবীর বাড়ীতে আসতে দেখে নি?

তাপসী বললো, কাকু, আমার জন্য তুমিও অনেক কষ্ট পাচ্ছ!

থাক ওকথা। এখন তুমি সেরে ওঠো! আমি একটু বাইরে যাই—ওষুধ কিনে আনি। বলে মাঝি সুবীরকে ইশারা করলো দরজার দিকে।

ওরা একটা ওষুধের দোকানে এসে ঢুকলো। তাপসীকে মাঝি অত্যন্ত ভালোবাসে—একে বাঁচাতে আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। ওষুধ পথ্যাদি ক্রয়ে অদ্যকার উপার্জিত সব অর্থ ব্যয়িত। ওরা আবার হাসপাতালে এলো।

ওগুলো নিয়ে মাঝি একা গেছে তাপসীর বেডে। সুবীর অফিস-ঘরের কাছে অপেক্ষায়। আগের বারে সে তাপসীর চোখে পড়তে পড়তে বেঁচে গেছে; এবার আর দেখা দেবে না! ওর চোখে একবার পড়ে গেলে সুবীরের কথা ঠিক চলে যাবে ইন্দিরা দেবীর কাছে। তিনি ওর কোনো ক্ষতি করেন নি—বরং পুত্রাধিক স্নেহে নিজ গৃহে স্থান দিয়েছেন, স্কুলে পড়াচ্ছেন—তাঁর জন্য সে শত্রুপুরী মুক্ত। তাঁর সব স্নেহ বন্ধন কাটিয়ে সে কিনা চোরের মতো চুপি চুপি পালালো!

এখানে দাঁড়িয়ে সে ব্যস্তসমস্ত লোকদের দ্রুত গতিতে ভিতরে যাতায়াত দেখছে। ক'জন প্রসূতি নবজাতককে আপনার বক্ষে আঁকড়ে হাসপাতাল থেকে গৃহে ফিরছে। একজন প্রসূতির আঁচলটা উড়ে এসে সুবীরের মুখে লাগে—যদিও সুবীর দেওয়াল-ঘেঁষে। তার এমন ইচ্ছে হলো ঠাস করে এ স্ত্রীলোকের মুখে এক চড় মারে! ঘৃণার দৃষ্টিতে প্রসূতির দিকে তাকালো—মা হবার এটা ওদের একটা উপযুক্ত স্থান বটে!

তার মনে হলো, মাঝির চোখে না পড়লেই ভালো হতো—এখন আবার কী ঝামেলা! সে তো কাশী এসেছে শুধু আয়ের জন্য। সে অনেককে বাঁচিয়েছে, আর বাঁচাবে না। বাঁচিয়ে কী হবে! বেঁচে উঠলে সবাই তো একদিন সুড় সুড় করে বাপ-মায়ে পরিণত হবে। তাপসী খুব বিপদগ্রস্ত নয় তো? ব্যাপারটা মাঝির কাছে জানতে হবে—

তাপসীর সাথে সুবীর কথা বলেছে, ওদের বাড়ীও গেছে তাপসীর মা আর ইন্দিরা দেবী জ্যেঠতুতো-খুড়তুতো বোন। কাজেই ইন্দিরা দেবী ওর খুড়তুতো মাসী। সে মাসীকে খুব

ভালবাসে, মাসীও ওকে গভীর ভালোবাসেন। সে স্কুল ফেরতের সময় আসতো মাসীর বাড়ী। ওভাবে আসবার ফলে তার বাড়ীর লোক কিছু জানতে পারতো না। তিনি আদর করে ওকে অনেক কিছু খাওয়াতেন; বাড়ীতে সে আদর পেতো না। অনেকদিন সে না এলে তিনি বড়ো উদ্বিগ্ন হতেন, তখন তিনি সুবীরকে পাঠাতেন বাড়ী গিয়ে তাপসীর খবর নিতে এবং ওকে তার বাড়ী আসবার জন্য চুপি চুপি বলে আসতেন। উৎকৃষ্ট কিছু রান্না করলেই সুবীরকে দিয়ে চুপি চুপি ওকে বাড়ী থেকে ডেকে আনাতেন।

সুবীর কিন্তু এখনো পর্যন্ত জানে না, তাপসীর বাবা কয়েকটা কথা শুনে তাকে একটা নারী লোভী শয়তান ভেবে রেখেছেন। সুবীরকে বদমাশ ভাবার পরদিনই মেয়েকে বলেছিলেন, তাপসী, তুই আজ তোর ইন্দু-মাসীর বাড়ী গিয়ে মাসীকে বলে আসবি—সুবীর নামে তার পোষা ছেলেটাকে যেন আমার ঘরে একদম না পাঠায়! একটা বদমাশ, শয়তানকে দুধ-কলা দিয়ে পুষে রেখেছে। আমি হলে ঝাঁটা মেরে বিদায় করতুম!

তাপসীর অসুখ শুনে ইন্দিরা দেবী একদিন ওকে দেখতে গেলেন। এদিকে তার স্বামী বাড়ী ফিরে একটা জরুরী কাগজ বার করতে যাবেন আলমারি খুলে, কিন্তু চাবিটা ইন্দিরা দেবী নিয়ে গেছেন। কাজেই তাঁর স্বামী সুবীরকে পাঠালেন তাপসীদের বাড়ী গিয়ে চাবি আনতে।

তাপসীদের বাড়ীতে সে হঠাৎ গ্রাম্য স্কুলের পণ্ডিতমশাইকে দেখে অস্বস্তিতে পড়ে যায়। তিনি নাকি তাপসীর সৎমায়ের জ্যেঠা। সুবীরকে দেখে বললেন, কি হে, এখানে! উত্তরটা ইন্দিরা দেবী দিলেন ওর প্রশংসা করে। পণ্ডিতমশাই পরে হেডমাস্টারের হাতে সুবীরের প্রহৃত হওয়ার ঘটনা বললেন। শুনে তাপসীর বাবা সম্পূর্ণ উল্টো বুঝলেন, সে বুঝি ঐ রাত্তিরে হেডমাস্টারের বাড়ীর পিছন থেকে ঢুকে তাঁর মেয়েকে অপমান করতে গিয়েছিল।

মাঝি আর সুবীর ঘরে ফিরে এসেছে।

তাপসীর কথা সে কিভাবে মাঝির কাছে পাড়বে—ঠিক করতে পারছে না। বললো, মাঝি, যে-মেয়েটাকে হাসপাতালে দেখলাম, ও কে আপনার?

মাঝি নিঃসঙ্কোচে উত্তর দিল—ভাইঝি।

কিছু মনে করবেন না, আপনার এ ভাইঝি কি কলকাতায় থাকে?

না তো! মাঝি নিজেকে সতর্ক করে নিল—

মাপ করবেন! আমি ঐ মেয়েটিকে চিনি, দেখেছি, ওদের বাড়ীও গেছি, ওর সাথে কথাও বলেছি—ওর মাসীর বাড়ীতে আমি থাকতাম।

এতগুলো কথায় মাঝি একেবারে অপ্রস্তুত, মুখ সম্পূর্ণ ফ্যাকাশে। এমন কথা ইতিপূর্বে কেউ-ই বলে নি। যারা জিজ্ঞেস করেছে—কে এই মেয়েটি?—এই প্রশ্নবানকে শুধু ভাইঝি বলে এতদিন খণ্ডন করেছে। আজ এখন সেই প্রশ্নবান মাঝির উত্তর ভেদ করে তার বুকে এসে বিঁধলো!

মাঝির অবস্থায় সুবীর বুঝলো, এর মধ্যে একটা রহস্য আছে নিশ্চয়ই! ভাইঝির পরিচয় দিতে এত দ্বিধা কেন? সাহস দিয়ে বললো, মাঝি, আমাকে একদম ভয় পাবেন না; বরং আপনাদের সাহায্য করতে পারি!

সে এখনো অপ্রস্তুত। শ্বাস টেনে জোর দিয়ে বললো, তুমি কী সব বলছো! পুষ্প তো আমারই ভাইঝি—আমার কাছে থাকে—

পুষ্প না তো, ওর নাম তাপসী—আমি ভালো করেই জানি! তাপসীর খুড়তুতো মাসীর বাড়ীতে আমি থাকতাম—

এই কথা শুনে মাঝির মনে ভয় ও আনন্দ মিশ্রিত আশা দু-টোরই উদয় হয়—পুষ্পকে এবার তা হলে বাড়ী পাঠানো যেতে পারে! এই জটিল রোগের সময় ওর বাড়ীতে যদি একটা খবর

দেওয়া যেতো—। আবার অন্যদিকে মাঝির বুকে পুলিসের ভয় যমের মতো। কুক্ষনে আগত এই ছেলেটিকে আর আটকে রাখা যাবে না—বাঁধ ভাঙার মতন এক্ষুনি সব প্রকাশ হয়ে পড়বে। শেষ চেষ্টা করলো! রবি, তুমি অন্যের কথা বলছো—সে আমার ভাইঝি নয়

সুবীর বুঝতে পারছে, মাঝি সম্পূর্ণ মিথ্যে বলছে। তাই বললো, আচ্ছা, আপনার ভাইঝি তবে কতদিন ধরে আপনার কাছে আছে?

এই প্রশ্ন শোনামাত্রই তার মুখ আবার রক্তশূন্য! দোতলা ঘরে মৃদু আলোকের সামনে ওরা দুজন বসে। বাইরে ঘোর অন্ধকার।

আমি এই গত আগষ্ট মাসেই দেখেছি তাপসীকে, সুবীর বললো। মাঝি নীরব। সে মাঝিব একটা হাত ধরে বললো, ঘাটে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলুম আপনি আমায় বাঁচিয়ে আপনার ঘরে অশ্রয় দিলেন। আপনার এই হাত ছুঁয়ে বলছি—আপনার কথা কাউকে বলবো না। আমাকে বিশ্বাস করুন! এবার সত্যি করে বলুন তো—ঐ মেয়েটা কে, এবং কোথা থেকে কি করে আপনার কাছে এসেছে?

ওর কথায় মাঝি ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো। গাড়োয়ানজীর মৃত্যুর পর আজ তার প্রথম কান্না- যে বাঁধ ভাঙা জল।

অতঃপর মাঝি তাপসীর কথা তারপর নিজের কথা সব বললো।

এপর্যন্ত সুবীর ঠিক করেছিল, তাপসীর ভয়ে শীঘ্র পালাবে। কিন্তু এখন আর পলায়ন করবে না— ওর কথা ভেবে ওরা ব্যথিত।

সুবীব বললো, তাপসী যখন আপনার শত বলাতেও ঘরে ফিরে যায় নি, তখন আপনার তো কোনো দোষ নেই। পুলিসে খবর দিলে ও আত্মহত্যা করে বসতো! এরকম ঘটনাও ঘটে। কারণ, যে মনেপ্রাণ ঠিক করেছে—ঘরে আর ফিরবে না—তাকে জোর-জবর দস্তি ঘরে ফিরিয়ে দেওয়া মানেই তাকে আত্মহত্যার পথে ঠেলে দেওয়া!

মাঝি ভীতকণ্ঠে বললে—কিন্তু পুলিস! পুলিস আমায় এখনঃ

ধরলে, ও তা হলে তো আত্মহত্যা করে বসবে, আর আমাকেও জেলে —

ওকে এখন ওর পরিচয়টা জানালে অসুখ খুব বাড়বে—

না—পুষ্পকে এখন কিছু শোনাবো না!

সুবীরের তীব্র প্রতিবাদ—না, না, পুষ্প ওর নামই নয়! তাপসী!

বুঝেছি—ছদ্মনাম! ওর চিকিৎসায় আমি হিমশিম খাচ্ছি। ওর এক্স-রে, অন্যান্য পরীক্ষা করতে হবে। এখন গাড়িটা বন্ধক দেওয়া ছাড়া উপায় নেই!

সুবীর কিছুক্ষণ ভাবলো। তাপসী বা মাঝি কেউ শয়তান জাতীয় নয়। কিশোরী তাপসী তো আজও মা হয়নি—কাজেই ওকে সাহায্য করবে। সে মা হলে, সুবীর ওকে কোন প্রকারেই সাহায্য করতো না।

সুবীর বললো, টাঙ্গা বন্ধক দিলে আপনি দিন যা আয় করছেন—তাও যাবে। আর ঠিক সময়ে টাকা ফেরত না দিলে গাড়ি আর ঘোড়া দুই-ই যাবে! বরং আপনার ঐ নৌকাটা—

এখন কেউ নৌকা ভাড়া নিতে চায় না—বন্ধক নেবে কে?

ঠিক আছে, আমি ওর চিকিৎসার জন্য টাকা সাহায্য করছি—ফেরত লাগবে না—আপনাকে নিতেই হবে! কত দিন ওকে রোগে ভোগাবেন?

মাঝি সুবীরের হাত ধরে অশ্রুনেত্রে বললো, তুমি সত্যিই মহৎ। কিন্তু অত টাকা তোমার কোথায়? সেই সুদূর থেকে নিঃস্ব হয়ে দীর্ঘদিন ধরে একা দাঁড় টানতে টানতে এখানে কি জন্য এসেছো জানি না!

সত্যিই তো সে এখন নিঃস্ব! অর্থোপার্জনে কাশীতে। তবে কি সে কথা দিয়ে এখন কথা ভাঙবে? আরে যাঃ! দীপালির চুড়ি বেচে—

সে পকেট থেকে নকুলের সেই চিঠি বার করে মাঝির সামনে

মেলে বললো, এটা পড়ুন! কেন এ মুল্লুকে এসেছি, জানুন! যিনি আমায় এ চিঠিতে সুপারিশ করেছেন, তাঁর জেঠ্যার এখানে কাপড়ের কল আছে। বেনারসীও নাকি তৈরী হয়। তাঁর জেঠ্যা ভালো লোক আমাকে চাকরি দেবনই প্রথম মাসের মাইনেটা আগেই দিতে পারেন —

রাত সাড়ে ন'টা। সুবীর বললো, আজ রাতে কি খাওয়া হবে না? মাঝি আমাকে কিন্তু আপনার ভাই বলে ভাববেন। আমার কিছু জুটলে আপনারও হবে, আপনার হলে আমারও হবে। আমরা উভয়ে ভাই-ভাই!

আমার কাছে মাত্র একটা টাকা আছে—মাঝি বললো।

থাক ওটা। কাল ঘোড়ার ঘাস-ছোলা কিনতে হবে না? ওকে খাওয়াবেন কি? ঘোড়াকে প্রভু চাবুক মারে, অথচ সেই ঘোড়া প্রভুর অন্ন দেয়! আমার কাছে পয়সা আছে, দোকান থেকে রুটি কিনে আনি বরং আচ্ছা, এখানে হাতে গড়া রুটির দাম কত প্রতিটার?

হায়, মাঝির এমন দুরবস্থ্যা আজ অতিথিকে অভুক্ত রেখেছে! এই তরুন অতিথি কিনা তাকেই বার বার খাওয়াচ্ছে! হায় তার এমন দুর্ভাগ্য!

মাঝির ভালোই চলছিল। তাপসী নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হওয়ায় মাঝির আর্থিক অবস্থা এখন নিদারুন শোচনীয়।

পরদিন দীপালীর চুড়ি নিয়ে সুবীর সোনার দোকানে ঘুরছে।

প্রথম দোকানদার চুড়ি দেখে মুখ সিঁটকে বলছে—এ আর কত দাম! পঞ্চাশ টাকা দিতে পারি বড়জোর। সুবীরের দাম শুনে দোকানদার তার ত্রিভুজের মতো মুখখানা দুলিয়ে বললো সোনার ব্যবসা করতে করতে বুড়ো হয়েছি! আর তুমি তো বাবা ছেলেমানুষ, তাই তিনগুন দাম চাইছো! যাও—অন্য দোকানে দ্যাখো—

দ্বিতীয় দোকানদার পঁচাত্তোর টাকা দিতে রাজী। সুবীরের দাবী সেই দেড়শো টাকা। তৃতীয় দোকানদারের প্রস্তাব নব্বই টাকা ; শেষে একশত। সুবীর বুঝেছে, দাম যখন বাড়ছে—তা হলে আসল দাম আরো বেশী। প্রথম দোকানদারকে ভাবলো—শালা ! এক নম্বরের পাক্কা চোর !···

চতুর্থ দোকানে প্রবেশ করলো। দোকানদারকে দেখে মনে মনে হলো, নাঃ, ইনি সাধু ব্যবসায়ী। আমার ন্যায্য পাওনায় বঞ্চিত করবেন না—

অপূর্ববাবু এই সোনার দোকানের মালিক। গদিতে উপবিষ্ট। ব্যবসায়িক ধূর্ততা তাঁর অঙ্গে একটুও মেখে নেই। দেখলে নিবাসক্ত মনে হয়। আশে পাশে মন্দলোক আছে কিনা দেখে নিয়ে সুবীর চুড়ি বার করলো।

কাগজের মোড়াটা খুলতেই অপূর্ববাবু ভীষণ চমকালেন। চুড়ি স্খলিত হয়ে পড়লো গদির ওপর। এ কী দেখছেন ! চুড়ির এই নক্সা তো আজো তাঁর মনপটে বিদ্যমান ! তাঁর কন্যার চুড়ি ছিল অবিকল এইরকম। তাঁর মৃত কন্যা আলেয়ার মুখখানি ভেসে উঠতেই দু'ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়লো।

অপূর্ববাবু বললেন সুবীরকে, এ চুড়িটা কার ?

আমারই এখন। আপনি কিনবেন ? তা হলে তাড়াতাড়ি দাম-টাম বলুন !

খাঁটি সোনার এটা তুমি বিক্রি কোরো না ! একবার হাতছাড়া হলে আর এরকম কোথাও পাবে না ! তবু তো একটা খাঁটি জিনিস।

খাঁটি হলেও এটা, আমাকে বিক্রি করতে হবে। আপনি না নিলে অন্য কোথাও—আমার এখন টাকার খুব দরকার ! আপনার কেনার ইচ্ছে থাকলে বলুন ! আমি বেশী দেরী করতে পারছি না—

কেন তোমার এত টাকার খুব দরকার ?

নিউমোনিয়া হয়ে আমার বোন হাসপাতালে—তাই টাকার খুব প্রয়োজন।

তিনি ভাবলেন, বোনের অসুখের জন্য বাধ্য হয়ে এই ছেলেটি চুড়ি বেচতে এসেছে। সেই সঙ্গে কন্যা-স্মৃতি মনে ভেসে ওঠায় তাঁর সব মমতা অদৃশ্য ভাবে গিয়ে পড়লো তাই সেই হাসপাতালে না-দেখা শয্যাগত মেয়েটির ওপর। বললেন, আহা, তোমার বোন নিশ্চয়ই খুব কষ্ট পাচ্ছে!

কিন্তু সুবীরের এসব ভালো লাগে না। সে জিনিস বেচতে এসেছে, বেচে চলে যাবে। ঘরের কথা কাউকে পরিষ্কার বলতে চায় না। নম্র স্বরে বললো, আপনি যদি দয়া করে এই চুড়িটা কেনেন খুব ভালো হয়! না হলে আমাকে আবার অন্য দোকানে ঘুরতে হবে। নিন—কম করে আমার দেড়শো টাকা পেলেই হবে—

তিনি চুড়িটা হাতে আর একবার ঘুরিয়ে দেখে তারপর ওজন করলেন। এবার সুবীরের সম্মুখে এসে ওর মুখের দিকে চেয়ে আছেন। সুবীর ভাবছে, উনি বুঝি মনে মনে দাম-নির্ণয় করছেন। আসলে তা নয়, তিনি মূল্য-নির্ধারণ করছেন না। সেই সম্পূর্ণ অপরিচিতা মেয়েটার ওপর অপূর্ববাবুর সন্তান-প্রেমের তরঙ্গ আছড়ে পড়ছে—

কিছুক্ষণ পর তিনি বললেন, অ্যাঁ, তুমি কত দাম চাইলে? দেড়শো টাকা? আমি কিনবো— তোমায় দুশো টাকা দিচ্ছি!

শুনে সে লাফিয়ে উঠলো। ভেবেছিল, দেড়শোর নীচেই বেচতে হবে। ইস্, প্রথম দোকানদারটা তাকে কী ঠকান ঠকাচ্ছিল! ভাগ্যিস বেচে নি!

তিনি সুবীরকে সযত্নে বসিয়ে মিষ্টি আনিয়ে তুষ্ঠ করে খাওয়ালেন।

টাকা গুনে রেখেছেন, কিন্তু দেন নি এখনো। বললেন, তোমার বোনের অসুখ শুনে আমার মন খুবই খারাপ। ইচ্ছে হচ্ছে,

হাসপাতালে গিয়ে দেখে আসি। তুমি তো এবার বোনকে দেখতে যাবে, সাথে আমাকে নিয়ে চলো—তোমার অসুস্থ বোনকে একটু দেখি।—তা ছাড়া অনেক হাসপাতালে আমার জানাশোনা আছে ডাক্তারদের সঙ্গে পরিচয় আছে, আমি বললে বা আমার আত্মীয় জানতে পারলে ডাক্তাররা তোমার বোনকে সুচিকিৎসা করবেন। জানোতো, আজকের দিনে একটু ভালো জানাশোনা না থাকলে রোগ সারে না।

সুবীর দু-টানে পড়লো। এঁকে হাসপাতালে একটু নিয়ে যাওয়া বেশী কষ্ট নয়! কিন্তু তাপসীর ব্যাপারটা যদি কোনোক্রমে ফাঁস হয়ে যায়? কি দরকার অজ্ঞাত ঝামেলা ডেকে এনে! কিন্তু সঙ্গে ডাক্তারদের জানাশোনা আছে এত বড়ো একটা সুযোগ কোথাও মেলে না! তাপসী যদি চটপট সেরে ওঠে—তার হিতের জন্য মন্দ কী! সত্যিই তো—পিরিত না থাকলে আজকের দিনে নার্সরা ডাক্তাররা পাইকারী হারে রোগী দেখে যায়! কে আর দরদ দিয়ে দেখে।

সুবীর তবুও রাজী হলো না। অপূর্ববাবুকে এড়িয়ে যেতে চায়।

শেষে তিনি হাত ধরে অনুরোধ করলে সুবীর ফেরাতে পারলো না।

অপূর্ববাবু নিজেই টাঙ্গা ভাড়া করলেন। সুবীর তাঁকে প্রথমে মাঝির বাসার বাইরে এনে কিছুক্ষণের জন্য দাঁড় করিয়ে রাখলো।

সে দারুণ ভয় নিয়ে ঘরে ঢুকে মাঝির হাতে দুশো টাকা দিল। মাঝির মুখ খুশীতে উজ্জ্বল, তখুনি সুবীরকে আলিঙ্গন করলো বুক জড়িয়ে। মাঝি হাসপাতালে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে সুবীরের অপেক্ষায় ছিল। আর একজন কোন ভদ্রলোক তাদের সঙ্গে হাসপাতালে তাপসীকে দেখতে যাবেন শুনে মাঝি রেগে ওঠে। বলে, কি দরকার ছিল এসবের? জানো তো ভাই সব ব্যাপার! এখন বাইরের লোকে কিছু সন্দেহ করলে বা জানতে পারলে ব্যাপার

কতদূর গড়াবে—

সুবীর পূর্বেকার ঘটনা সংক্ষেপে বললো মাঝির কাছে। কেবল দীপালীর দেওয়া ঐ সোনার চুড়ির কথা না বলে সে বললো যে, তার কাছে একটা সোনার জিনিস ছিল; নৌকাপথে টাকা-পয়সা অধিক রাখার চেয়ে ওটা বেশী নিরাপদ বলে সাথে নিয়ে বেরিয়েছিল।

শেষে মাঝি যখন জানতে পারলো, আগন্তুক ব্যক্তির সঙ্গে ডাক্তারদের বেশ জানাশোনা আছে, এবং সমব্যথীর মতন তিনি স্বেচ্ছায় হাসপাতালে গিয়ে দেখবেন, তখন তার ভয় অনেকটা কমলো। অতঃপর দুজনে সামান্য পরামর্শ করে ঈশ্বরের নাম নিয়ে বেরিয়ে পড়লো।

মাঝির টাঙ্গায় তিনজন। অপূর্ববাবু টাঙ্গায় বসে সুবীরের সঙ্গে কথা বলছেন। তিনি ওকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নামটি কি ভাই?

সে ছদ্ম নামই ব্যবহার করলো—রবি। কিন্তু আপনার নাম?

আমার নাম অপূর্ব সেনগুপ্ত।

অপূর্ববাবু, আমাকে মাপ করবেন। আপনাকে একটা মিথ্যে বলছি। যে মেয়েটিকে দেখতে যাচ্ছেন, সে আমার আপন বোন নয়, তবে ঐ বোনেরই মতন আর কী!

টাঙ্গা এসে থামলো হাসপাতালের সামনে। সুবীর বললো, আপনারা দুজনে ওপরে যান, আমি এই অফিসের সামনে আছি।

তিনি প্রতিবাদ করলেন, না, আমরা একসাথেই যাবো। তুমিও চলো রবি!

সুবীর তাপসীর জন্য টাকা সংগ্রহ করলো কত কষ্টে—কিন্তু সে এখনও সঙ্কোচ বোধ করছে তাপসীর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে। হয়তো সে মনে করছে—বিধাতার মতন প্রচ্ছন্নভাবে ওকে সাহায্য করে সরে পড়বে—ওর চোখে ধরা দেবে না। কিন্তু একথা তো

বলা যায় না, তবে কী উত্তর দেবে? হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে বললো, আমাদের তিন জনকে একসঙ্গে ঢুকতে দেবে না! তাই আপনারা আগে যান, আমি পরে যাবো।

তাপসীর কাছে একজন রোগিনী এসে কথা বলছিল। আগন্তুকদের দেখে সে বেণী ছুলিয়ে লজ্জিত ভাবে স্ব-বেডের দিকে গমন করলো।

তাপসী অপূর্ববাবুকে দেখে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে। তিনি গৌরবর্ণ, অঙ্গে ধবধবে ধুতি-পাঞ্জাবী। তাঁর গলায় একটা সোনার হার।

মাঝি ওকে বললো, তোমাকে একজন দেখতে এসেছেন –

তিনি দেখছেন তাপসীকে। এর মুখটা তাঁর মেয়ে আলেয়ার মতন একেবারে না হলেও কতকটা বটে। বয়সে, লম্বায়, বর্ণে, মাথার কেশে এ আলেয়ারই মতন। প্রথম দর্শনেই তিনি একে কন্যার আসনে বসালেন।

ওদিকে সুবীর একা দাঁড়িয়ে আছে। কিছুক্ষণ বাদে মাঝি নেমে এলো। অফিস-ঘরে তাপসীর জন্য টাকা জমা দেওা হলো।

যা কেনবার ছিল, তা কিনে মাঝি আবার তাপসীর বেডে গেল।

শেষে ঘণ্টা বাজতে মাঝি অপূর্ববাবুকে নিয়ে নীচে নেমে এলো আবার। তিনি সুবীরকে বললেন, আজ দেখতে যাবে না রবি?

আজ তো হবে না। ঘণ্টা বেজে গেছে – এখন ঢুকতেই দেবে না! এরকম একটা অজুহাতে বেঁচে যাবে ভাবতেই পারে নি সে।

ওঃ, তাই তো! বলে তিনি ডাক্তারদের সন্ধানে গেলেন। কিন্তু পরিচিত ডাক্তারদের কাউকে পেলেন না। সবাইকে এবার টাঙ্গায় উঠতে হলো।

মাঝি টাঙ্গা চালাচ্ছে। বললো, অপূর্ববাবু, আপনার বাড়ী কোন্‌দিকে, বলুন?

অপূর্ববাবু অত্যন্ত পরতুষ্টকারী লোক। এক স্থানে গাড়ি থামিয়ে নেমে ওদের তুজনকে একটা মিষ্টির দোকানে নিয়ে গেলেন জোর করে।

মাঝি বা সুবীরের মিষ্টি ভক্ষণের স্পৃহা নেই ; কিন্তু তাঁর অনুরোধে পড়ে গলধঃ করণ করতেই হলো। খেতে খেতে তিনি বললেন, কাল আমি সকালে এসে ডাক্তারদের সঙ্গে দেখা করবোই। তারপর মাঝিকে বললেন, আপনার ভাইঝিটিকে কিন্তু আমাকেও একটু ভাগ দিতে হবে। আমি ওর বড়ো জ্যেঠা ও আমার মেয়ের মতন !

মাঝি বললো, চলুন, এবার আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসি।

ঘোড়া আবার ছুটছে। তিনি বললেন, চলুন, আপনার ঘর দেখে আসি। আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে আজ খুব আনন্দ পেলাম ! মেয়েটার ভয় বেশী কিছুই নেই—আর কয়েকদিনের মধ্যেই সেরে উঠবে।

মাঝি বললো, সে কী ! আমাদের ঘরে কিছু নেই দেখবার — শুধু শুধু কষ্ট করে গিয়ে আর কি করবেন ! আপনার কোনদিকে বাড়ী, একবার বলুন, আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দিচ্ছি। আমি কিন্তু ভাড়া নিতে পারবো না, আমাকে জোর করে দেবেন না যেন !

উঁহু, আমি সহজে ছাড়ছি না ! আমাকে এত পর ভাবছেন—

দেখুন অপূর্ববাবু, সুবীর বললো, আপনি উঁচুদরের লোক। আমাদের দরিদ্র ঘরে পদার্পণ করবেন, অনেক ভাগ্যের কথা ! কেন কষ্ট করে আপনি আমাদের তুচ্ছ ঘর দেখতে চাইছেন ? কিছু নেই—শুধু দারিদ্রের চিহ্ন—আপনাকে তা দেখাতে চাই না। আপনারও ভালো লাগবে না।

তিনি কিছুতেই ছাড়লেন না। বাধ্য হয়ে তাঁকে আনতে হলো।

অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে তাঁর কষ্ট হচ্ছে। সুবীর বললো, এজন্য আপনাকে বারণ করলাম, তবু শুনলেন না ! দাঁড়ান এখানে,

.সিঁড়িটা ভাঙা—পড়ে গিয়ে হাত পা ভাঙবেন! আমি ঘর থেকে আলো আনছি।

মোমবাতির ক্ষীণ আলোয় অন্ধকার ভেদ করে তিনি দোতলায় উঠলেন। ঘরের খাটিয়ায় বসলেন। ওরা দু'জনে ভিতরে ভিতরে শঙ্কিত হয়ে উঠলো—ইনি তাপসীর সম্পর্কে আবার কী প্রশ্ন করে বসেন!

তিনি ঘরের চারিদিক দেখে বললেন, গাড়োয়ানজী এই অন্ধকার রাজ্যের মধ্যে এই ছোট ঘরে আপনারা বাস করেন কি করে! আমার বিরাট বাড়ীর প্রচুর ঘর। ফাঁকা দুটো ঘব যদি আপনারা অধিকার করে থাকেন তো আমার কোনো অসুবিধেই নেই। কালই আমার বাড়ীতে মালপত্র নিয়ে চলে আসুন—আমি কোনো ভাড়াপত্র নেবো না। বাগানে আলো-বাতাসপূর্ণ অনেকগুলি ঘব পড়ে রয়েছে একদম ফাঁকা—পছন্দমতো যে-কোন ঘর বেছে নেবেন আসুন কালকেই—

না, না, আর কোন প্রয়োজন নেই, এখানেই বেশ আছি।

তা আমি শুনছি না! কালকেই আমার বাড়ি চলে আসুন—কত ভালোভাবে থাকতে পারবেন। আমি কাল গাড়ি পাঠিয়ে দেবো কিন্তু সুবীরের দিকে ফিরে বললেন, রবি রাজী তো? প্রতিবাদ শুনবো না। আমাদের বাড়িতে থাকলে তোমাদের কোন অসুবিধা হবে না, আমারও না।

সুবীর বললো, এজন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ! কিন্তু কেন শুধু শুধু আপনি আমাদের ঝামেলা পোহাবেন? আমাদের তো ঘরের অভাব নেই এই ঘরই যথেষ্ঠ!

মাঝি বুঝতে পারছে, অচেনা এই লোকটা দয়ালু, হৃদয়বান। কিন্তু তা বলে তাঁর বাড়িতে গিয়ে ওঠবার মাঝির কোন ইচ্ছা নেই।

তিনি উঠে দাঁড়ালেন, মাঝির হাত ধরে অনুরোধ করলেন, গাড়োয়ানজী, ধনী বলে কী আমাকে এতই পর ভেবে নিচ্ছেন? আমি

গরীবদের একটুও নীচু চোখে দেখি না। আমার বাড়িতে আপনারা এলে সত্যিই আমি খুশী হবো! কাল আমি গাড়ি পাঠিয়ে দেবো—

তারপর সুবীরের হাত ধরে বললেন, রবি, তুমি আমার ছেলের বয়সী, আমি তোমার জ্যেঠার মতন। তোমাকে হাত ধরে এত করে বললেও তুমি কি যাবে না?

সুবীরের এ সব মোটেই ভালো লাগে না। চুড়িটা ন্যায্য দামে কেনার জন্যই এঁর প্রতি তুষ্ট। তা বলে ওঁর আতিথ্য গ্রহণে মোটেই আগ্রহী নয়। সে কারো গলগ্রহ হতে চায় না। যার জন্য তার এত কাণ্ড হয়ে গেল! সে আবার গলগ্রহ হবে অপূর্ববাবুর? উনি হয়তো কারো পিতা—এধরনের লোকেরা ওর প্রতিপক্ষ! সে এদের সঙ্গে ওপর ওপর কথা বলে। তবে কি সুবীর নীতিভঙ্গ করে তার প্রতিপক্ষদের সঙ্গে আপোষ করবে?—কক্ষনো না! তাঁর শিশু-কলরব-মুখরিত গৃহে পদার্পণ করবার আদৌ প্রয়োজন নেই।

সুবীর বললো, ঠিক আছে, মাঝি যেতে চাইলে আপনি তাঁকে নিয়ে যান। আমার যাবার প্রয়োজন নেই। আমি তো এখানে আশ্রিত।

কিন্তু পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। যখন সুবীর জানতে পারলো—তাঁর কোন আপনার জন নেই, তখন কিছুটা নরম হলো। সুবীর কিন্তু এখনো জানে না—অপূর্ববাবুর একটি কন্যা ছিল।

. তাঁর পীড়াড়িতে শেষে ওরা জানায়—গলগ্রহ হতে চায় না; ভাড়ায় থাকতে রাজি। কিন্তু ভাড়া নেবার ইচ্ছে তাঁর নেই, শেষে রাজী হন।

সে রাত্রে তিনি কখনো পায়চারি, কখনো ধূমপান, কখনো বিছানায় গড়ালেন। একটি মাত্র স্বর্ণ-চুড়ি তাঁর মৃতকন্যাকে আজ স্থানান্তরিত করে দিয়েছে তাপসীর মধ্যে। এখন তাপসী যেন তার সেই আলেয়া—

পরদিন সকালে হাসপাতালে এসে ডাক্তারদের সঙ্গে দেখা

করলেন তিনি। স্বব্যায়ে তাপসীকে স্থানান্তরিত করালেন কেবিনে দিনরাতে দুটো নার্স রাখলেন।

অতঃপর হাসপাতাল থেকে তিনি এলেন মাঝির ঘরে, সঙ্গে একটি টাঙ্গা। হাসপাতালের কথা সব শুনে, এবং বাকি বেড-ভাড়া মিটিয়ে তিনি ওকে কেবিনে রেখেছেন, তা জেনে মাঝি আশ্চর্য হয়ে বললো, এ কি করছেন আপনি! আমাদের জন্য এত করতে গেলেন কেন?

ও আমার মেয়ে,—দেখেই চিনেছি! গতরাত ওর জন্য ঘুমাতে পারি নি।

ভালোবাসার জনকে যে ভালবাসে, তাকে না ভালবেসে পারা যায় না। মাঝি তাই এঁর প্রতি তুষ্ট। তিনি ওদের নিয়ে স্বগৃহে ফিরলেন।

সুচিকিৎসায় ও সেবায় তাপসী ক'দিন পর হাতপাতাল থেকে ছুটি পেল।

গৃহে এনে ওকে অপূর্ববাবু কন্যাধিক স্নেহ-যত্ন করতে লাগলেন। —দৈবচক্রে তাঁর মৃত কন্যাকে ফিরে পেয়ে গেছেন!

॥ দশ ॥

ট্রেন ছুটছে কানপুরের দিকে। ট্রেনের অভ্যন্তরে অপূর্ববাবু, তাপসী, সুবীর ও মাঝি জটাধর। সঙ্গে আরো দু'জন অনুগত ভৃত্য। তাপসী সম্পূর্ণ রোগমুক্ত। ডাক্তারের পরামর্শে—এই সময় কিছুদিন জল-হাওয়া বদলালে স্বাস্থের পক্ষে উত্তম। ডাক্তারের ও নিজের ইচ্ছায় তিনি তাই কানপুর চলেছেন। সেখানও তাঁর বাগান-বাড়ী ও ব্যবসা।

অপূর্ববাবুর পুত্রকন্যা নেই বলে তাপসীকে স্নেহ-যত্ন করে তৃপ্তি পাচ্ছেন, তাকে কিভাবে ভালোবাসেন—ভেবে পান না। তাপসী তাকে 'জ্যেঠা' বলে।

ওর সম্পর্কে মাঝির খুব দুশ্চিন্তা ছিল। এখন নেই। সে এখন বড়লোকের আদুরে মেয়ে—এবার ভালো করে লেখাপড়া করবে।

সুবীর ঘোড়া চালাতে শিখে গেছে। মাঝি তাকে কাশীর রাস্তাঘাট সব চিনিয়ে দিয়েছিল। সে মাঝির পাশে টাঙ্গায় বসে থাকে, ঘোড়া ল্যজ দোলালেই ল্যাজের কেশ চামরের মতো উড়ে এসে ওর গায়ে লাগে। কোনদিন মাঝি না বেরোলে সেদিন সুবীরই গাড়োয়ান।

তাপসীর বাড়ীর কথা থেকে তার সব কথা আদায় করেছেন অপূর্ববাবু। কিন্তু সুবীরের কথা পাননি। ওকে বলেছেন, কি হে, তুমি তোমার নাম 'সুবীর' না বলে মিথ্যে করে আমায় 'রবি' বলেছো কেন?

সে তাপসীর দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলেছিল, এ তবে 'পুষ্প' নাম ধারণ করেছিল কেন? 'সুবীর' তো বাপ-মা-র দেওয়া নাম! ওটা আমার পছন্দ-করা নাম তো নয়—অন্যের পছন্দ করা নাম

আমি কেন গ্রহণ করবো? আমি ও-নাম পরিত্যাগ করেছি। নিজের পছন্দ করা নামই আসল নাম!

শুনে হেসেছেন। যখন সবাইকে নিয়ে আহারে বসেন, তখন গল্প হয়। ওরা পরে জেনেছিল তাঁর মৃতকন্যার কথা। কিন্তু এমনভাবে সবার মন কেড়ে রাখলেন—কেউ আর পালায়নি—তাই একত্রে আহার-বিহার।

সুবীর গাছে উঠতে অস্তাদ। তাঁর বাগানের গাছে চড়ে। সুবীর ও তাপসীর ভাব কলকাতায় কম ছিল, কিন্তু এখানে যেন ভাই বোন। তাপসী ওর কাছ থেকে গাছে ওঠা বেশ শিখে নিয়েছে।

প্রথম প্রথম অপূর্ববাবুর ওপর সুবীর নজর রাখতো। স্টীমার থেকে তার ভালোভাবে অভিজ্ঞতা জন্মেছে। যে-রকম মিষ্টি কথায় আচারে-ব্যবহারে দীপালীকে হস্তগত করা হয়েছিল, নকুল না বাঁচালে তো ওকে খুঁজেই পাওয়া যেতো না · ও ঘটনার পুনরাবৃত্তি সে আর চায় না।

এক সন্ধ্যায় সুবীর বাগানে ঘুরতে ঘুরতে বৈঠকখারার জানালার ফাঁকে উঁকি মারলো। ভিতরে তাপসী একা বসে। তিনি ওদের জন্য আলাদা ঘর দিয়েছেন। সুবীরের ইচ্ছে হলো ওকে ডাকতে। তক্ষুনি অপূর্ববাবু সুটকেস হাতে ঐ ঘরে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

তাপসী ভয় পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, এ কী আপনি দরজা বন্ধ করছেন কেন? তিনি বললেন, তুমি সত্যই ভয় পেয়ে গেছো! তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে—ভয় পেয়ো না! বলে তাপসীর থেকে একহাত ব্যবধানে সোফার ওপরে বসে পড়লেন। ওর মুখে ভয় লেগে। তাঁর কোলের ওপর ঐ সুটকেসটা, তিনি একটা কিছু বলবেন বলবেন করছেন আবার পরক্ষণে ইতস্ততঃ করছেন—

সুবীর ফাঁক দিয়ে সব দেখছে। নিজেকে বললো দাঁড়াও বুড়ো

তাপসীকে একবার অপমান করলে হয়! —মাথা এক্ষুনি গুঁড়িয়ে যাবে! সে দ্রুত একটি লম্বা বাঁশ এনে আবার দেখতে লাগলো। দরজা বন্ধ থাকলে বিপদে ঘরে ঢুকে ওকে উদ্ধার করা যাবে না— তাই প্রয়োজন হলে জানালা দিয়ে লম্বা বাঁশ গলিয়ে ওঁর মাথায়—

অসৌজন্য কিছুর প্রকাশ পেল না। সুটকেসের ডালা খুলতেই বৈদ্যুতিক আলোয় ঝলমল করে উঠলো একরাশি গয়না। পচ্ছন্দমতো গয়না বেছে নিতে তাপসীকে শত অনুরোধ করলেন। কিন্তু সে ওসব কিছুতেই নেবে না। বললো, না জ্যেঠু, গয়না আমি চাই না—ওসব পরতে পছন্দ করিনা। তিনি হাজার অনুরোধে রাজী করাতে না পেরে শেষে ওর হাত ধরে বললেন, তোমায় আমি কত ভালবাসি তাপসী—তুমি তা জানো না! তুমি আমার একটিও কথা রাখোনি—কিচ্ছু নিলে না, অন্ততঃ একটা হার বা আংটি নিলেও তো খুশি হতাম! চাকররা যাতে ঘরে ঢুকে না পড়ে, তাই আমি দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলাম—! বলতে বলতে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন

তাঁর মনটা নিষ্পাপ জেনে সুবীর পরে লজ্জিত হয়েছিল।

অপূর্ববাবু ওদের নিয়ে কানপুরে এলেন। সুখে দিন কাটছে। এখানেও একত্রে আহার-বিহার। তাপসী পূর্ণ স্বাস্থ্য ফিরে পেয়েছে আর পাবে না-ই বা কেন? সে বাপের কাছে আদর-যত্ন পেতোই না। তিনি ওদের নিয়ে তাঁর বাগানে সময় কাটান, বিকেলে গঙ্গার ধারে যান।

তিনি সবাইকে নিয়ে একবার দিল্লী-আগ্রা ঘুরতে গেলেন। সেখানকার প্রসিদ্ধ স্থানগুলি দেখলেন। জ্যোৎসনা-রাত্রে তাজমহলের রূপ দেখে সবাই মুগ্ধ।

আজ কানপুর ফিরলেন। মেঘপুঞ্জ ভেদ করে বিদ্যুৎ যেমন হঠাৎ চমকে উঠে, আগামী কাল এই ক'জনের সুন্দর সরল জীবনে যে একটা বিষাদ ঘনিয়ে আসবে—কেউ জানতে পারলো না।

পরদিন দুপুরে সুবীর অপূর্ববাবুর কাছে বাজী রেখে বাগানের নিমগাছ বেয়ে দোতালার ছাদে উঠে গেল; তাই দেখে তাপসীও বায়না ধরলো। সে তো গাছে ওঠা শিখেছে—তবে কেন পারবে না? অন্যেরা বারণ করলেও সে শুনলো না। অনেকদূর উঠেছে. হঠাৎ একটা গিরগিটিকে নীচে নামতে দেখে তখন ভয়ে চীৎকার করে উঠে সে হাত ছেড়ে দেয়—

মাঝি উঠতে বারণ করেছিল, কিন্তু সে তা শোনেনি। মাঝি ঐ গাছের নীচে ওপর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, তাপসীকে ওপর থেকে পড়তে দেখে সঙ্গে সঙ্গে হাত পেতে ওকে লুফে নেয়।

ঐ উঁচু থেকে পড়লে ওকে আর বাঁচাতে হতো না! মাঝির কোলে পুন্যভাগ্যবলে যমের মুখ থেকে বেঁচে গেল স্বল্পাহত হয়ে।

অতখানি বড়ো ও ভারী মেয়েটাকে ওভাবে লুফতে গিয়ে মাঝির নিজের হাড় পাঁজর ভেঙ্গে যায়। তার বুকে দারুণ আঘাত, দেহের অনেক জায়গায় হাড় ভেঙে গেছে। তার তো বয়েস হয়েছে—তবুও বাঁচিয়েছে।

মাঝিকে আর বাঁচত হলো না। সঙ্গে সঙ্গে তাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল। হাসপাতালে কয়েকবার রক্তবমিকরে কয়েক ঘণ্টায় মাঝির ইহলীলা সাঙ্গ হলো। মরবার আগে শুধু বলতে পেরেছিল—ওকে যে বাঁচাতে পেরেছি—এইজন্য মৃত্যুতে আর দুঃখ নেই

মাঝির মৃত্যুতে তাপসী সর্বাধিক আহত। সে-ই তো দস্যুর হাত থেকে ওকে উদ্ধার করেছিল, ওকে আশ্রয় দিয়েছিল, সব রকম সাহায্য করে বাঁচিয়ে রেখেছিল—তা না হলে সে তো এতদিন কোথায় ভেসে যেতো।

সুবীর ও অপূর্ববাবু শোকাচ্ছন্ন। আনন্দের মাঝে হঠাৎ বিষাদের ঘনছায়া নামলো।

কানপুরে শীত পড়েছে খুব। ডিসেম্বর মাস। অপূর্ববাবু স্থির করছেন, আগামী বছরেই তাপসীকে স্কুলে ভর্তি করে দেবেন এবং

সম্পত্তি উইল করবেন, সুবীরকেও বঞ্চিত করবেন না। তাঁর পূর্বেকার পরিকল্পনা ছিল সমস্ত সম্পত্তি ধর্ম-প্রতিষ্ঠানের নাম লিখে দেবেন জীবের কল্যানার্থে। তাঁর উত্তরাধিকারী নেই বলে আত্মীয়দের হাতে তুলে দেবেন না।

তাপসীর বাবা যেখানে জীবিত, তাঁর কাছে মেয়েটাকে চেয়ে নেবেন স্থির করলেন। কিন্তু সে কিছুতেই রাজী নয়। শেষে অনুরোধে রাজী হয়েছিল।

অতি সংক্ষেপে ওর বাবাকে চিঠি লিখলেন, হারানো তাপসীকে পেয়েছেন। সুনির্দিষ্ট সময় তিনি যেন হাওড়া প্ল্যাটফর্মে কন্যার অপেক্ষায় থাকেন!

ওর সৎমা একদিন চুপি চুপি থানায় গিয়ে জানিয়েছিলেন, তাপসী ঘরে ফিরেছে —। বাবা কিন্তু জানতেন, পুলিস আজো ওকে খুঁজছে।

ট্রেন থেকে নেমে হাওড়া প্ল্যাটফর্ম অপূর্ববাবু, তাপসী ও সুবীর দাঁড়িয়ে।

দেখতে দেখতে সমস্ত কামরা থেকে সব যাত্রী নেমে পড়লো। তারপর শূন্য ট্রেনটা প্ল্যাটফর্মে ত্যাগ করে চলে গেল।

অপূর্ববাবু তবুও দাঁড়িয়ে তাপসীর বাবার জন্য অপেক্ষা করছেন। স্থির করেছেন, ঘণ্টা দুই পর্যন্ত প্ল্যাটফর্মে থাকবেন। তিনি জানতে চান - ওর বাবা কন্যাকে গ্রহণ করতে আসবেন কিনা! যদি তিনি না আসেন,—তখন তাপসীকে নিয়ে ওর পিতৃগৃহে যাবেন।

তাপসীর বাবা এখন মাঝপথে। চারিদিকে তাঁর শত্রু—সাবধানে আসছেন।

তিনি পূর্বের চেয়ে বর্তমানে আরো বেশী বদরাগী। চরিত্র কর্কশ। তাঁর সাবানের ফ্যাক্টরিটা বন্ধ রেখেছেন দু'মাস ধরে। গত দুর্গাপূজায় শ্রমিকদের এক পয়সাও বোনাস দেন নি; প্রতি বৎসর দেন। এ নিয়ে শ্রমিকরা বিদ্রোহ তুললো, ওদের সঙ্গে তাঁর বেশ

রেষারেষি চলছিল। শেষে তিনি ফ্যাক্টরি বন্ধ করে রাখলেন—এবার কত বিদ্রোহ করবি কর!

শুধু তাই নয়, শ্রমিক-নেতাদের মধ্যে দু'জনকে তিনি ছাঁটাই করেছিলেন। বাজার থেকে ফেরবার পথেই তিনি আক্রান্ত হলেন। ক'জন তাঁকে ঘিরে ধরলো, তাদের মধ্যে শ্রমিক নেতাও ছিল। সেদিন তাঁকে নিহত বা আহত হতেই হতো। পকেট থেকে চাবুকটা বার করে সশব্দে ওদের ওপর চালালেন—দেখতে দেখতে ভিড়ে পিছু হটে পড়লেন—

এবার তিনি প্ল্যাটফর্মে ঢুকছেন। সমস্ত পথ সতর্কে পেরিয়েছেন, সঙ্গে সেই চাবুকটা আনতে আজ ভোলেন নি। দিনরাতই ওটা সাথে রাখেন। অন্ধকারেও আজকাল তিনি পেঁচার মতন দেখতে পান।

তাপসীর বাবা কী বিচিত্র লোক! দীর্ঘদিনের পর হারানো মেয়েকে প্রথম দেখতে পেয়েই কোথায় তিনি তাকে বুকে জড়িয়ে নেবেন—তা নয়! চোখ লাল করে তাপসীর পানে চেয়ে রইলেন। আসবার সময় তিনি আজ খানিকটা মদ গিলে এসেছেন বলে চোখ লাল। মেয়েকে বুকে টেনে নেওয়া তো দূরের কথা, সেই প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে কর্কশ গলায় হুঙ্কার ছেড়ে বললেন, কী তাপসী, কোথায় এতদিন ছিলিস! এখন আবার ফিরলি কেন? আর বুঝি থাকতে পারলি না! যা না সেখানে ফিরে—আর বুঝি তোকে কেউ থাকতে দিল না?' বাপের বাড়ীর চেয়েও তোর দেখছি আরো ভালো ঘর আছে—

অপূর্ববাবু সত্যিই অবাক হয়ে গেছেন—এরকম একটা লোক তাপসীর বাবা হতে পারে! তিনি অবাক হয়ে দেখছেন তাঁকে।

সুবীর ওখান থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। তাপসীর বাবা দেখতে ওকে এখনো পান নি, কিন্তু সুবীর ঠিক দেখতে পাচ্ছে।

তিনি মেয়েকে আবার বললেন, মাথা নীচু করে কি দেখছিস!

চল বাড়ী—তারপর তোকে শায়েস্তা করতে হয় কি ভাবে – দেখবি! চল—

বাবুদের গমন আসন্ন বুঝে কুলী তার মাথার পাগড়ি ঠিক করে বেঁধে নিচ্ছে। এতক্ষণ সে বসে ছিল। এই সময় অপূর্ববাবু সুবীরের দিকে ফিরে বললেন, সুবীর, মালগুলো কুলীকে ওঠাতে বলো তো—

ওকে দেখেই তাপসীর বাবা বললেন, তুই তুই সুবীর? তাপসীর ইন্দু-মাসীর বাড়ীতে থাকতিস না? হ্যাঁ—তুই-ই তো ওদের একটা পোষা ছেলে!

সুবীরকে দেখে তাঁর মাথায় আগুন জ্বলে উঠলো। তু-ই তা হলে তাপসীকে চুরি করে পালিয়েছিল—! এই শয়তানটাকে এক্ষুনি খতম করে দেবেন!

হেডমাস্টারের বাড়ীতে সুবীরের সেই ঘটনাটা জানার পর থেকে তিনি ওর প্রতি ঘোর অসন্তুষ্ট, নারীত্ব হরণ কারী একটা শয়তান বলে ভাবেন। তিনি এবার সুবীরের দিকে ধাবিত হলেন, বললেন, শালা! শয়তান! তুই-ই তা হলে আমার মেয়েকে নিয়ে পালিয়েছিলি! এতবড়ো স্পর্ধা তুই একটা শূকর হয়ে—! হ্যাঁ! তোর হেডমাস্টারের মেয়েকে এক রাত্রে তুই অপমান করতে গিয়েছিলি —আজ আমার মেয়ের দিকে তোর নোংরা হাত বাড়িয়েছিস—দাঁড়া শয়তান, আজ তোর দেখাচ্ছি—

বলতে বলতে তিনি পকেট থেকে চাবুক বার করে সুবীরের ওপর চালাতে লাগলেন সশব্দে। হিতাহিত জ্ঞান শূন্যের মতন ওকে মেরে যাচ্ছেন! আর ও বেচারীর অবস্থা এখন রীতি মতো কাহিল।

তাপসী পাথরের মতন হয়ে নতমুখে দাঁড়িয়ে আছে, সে যারপর নেই লজ্জিতা। পিতার প্রশংসনীয় অসুরমূর্তি দর্শন করে সে মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। সে এখনো বেঁচে আছে কেন। কেন মরে যাচ্ছে না! ইস্, অপূর্ববাবু সামনে দাঁড়িয়ে আছেন—কী ভাবছেন!

আর অপূর্ববাবু তো এই কাণ্ড দেখে পুরো হতভম্ব। এ কী

ভীষণ প্রকৃতির লোক! কিছু শুনলেন না, জানলেন না—কোনো বিচার না করেই ওর ওপর একেবারে বাঘের মতন ঝাঁপিয়ে পড়েছেন!

সম্বিত ফিরে পেতেই তিনি স্থবীরকে চাবুকের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে অপূর্ববাবুর গায়েও কয়েক ঘা চাবুক এসে পড়লো কিন্তু তা উপেক্ষা করতেই হলো। তিনি কুলীকে ডাকতে সে মাল ফেলে চলে এলো, তারপর অনেক কষ্টে তিনি আর কুলীতে মিলে চাবুক কাড়লেন। স্থবীরের গায়ে মুখে দেখা গেল রক্ত, সে ছাড়া পেয়ে প্ল্যাটফর্মের ওধারে একটু সরে গেল।

প্ল্যাটফর্মের দু'দিকেই রেল লাইন। স্থবীরের ধারের লাইন টায় একটা ট্রেন প্রবেশ করছে স্টেশনে, কুলীরা তাই এখন গা ঝাড়া দিয়ে উঠে প্ল্যাটফর্মে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর অল্পক্ষণের মধ্যেই প্ল্যাটফর্ম হয়ে যাবে ভিড়ে ভিড়।

তাপসীর বাবা চাবুক হারালেন বটে, কিন্তু রাগ তার পড়ে নি। স্থবীরের দিকে তিনি তেড়ে গেলেন বাঘের মতন। এবার আর চাবুক নয়, দৈহিক অস্ত্র! তিনি বাঁদরের মতন ঠাস ঠাস করে সজোরে স্থবীরকে চড় মারছেন। অপূর্ববাবু ও কুলীর চেষ্টায় তাঁকে থামানো যাচ্ছে না।

তাঁর দেহে অস্থরের মতন শক্তি—স্থবীর ছাড়া পাবে কেমন করে! তিনি বৃদ্ধ কুলীকে এক ঠেলা দিলেন, কুলী পড়তে পড়তে নিজেকে সামলে নিল। ট্রেনটা প্ল্যাটফর্মের মধ্যে ঢুকে পড়েছে, কিছু লোক চীৎকার করে সরে যাবার জন্য বলছে। এই সময় তিনি আক্রোশে স্থবীরকে এক ঠেলা দিলেন—স্থবীর উল্টে পড়ে যাচ্ছিল লাইনের উপর আর ঐ লাইনের ওপর দিয়ে ট্রেনটা মন্দগতিতে আসছে এবং অদূরে এসে গেছে। মুহূর্তের মধ্যে কুলী ওকে খপ করে ধরে ফেলে সামনের দিকে এক হেঁচকা টান দিল। স্থবীর প্রায় মুখ থুবড়ে প্ল্যাট-ফর্মের সিমেন্টের মেঝের ওপর পড়লো, কিন্তু বৃদ্ধ কুলী নিজের টাল

সামলাতে না পেরে পাশের রেল লাইনের ওপর পড়ে গেল। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দৈত্যকায় ইঞ্জিনটা হতভাগ্য কুলীর ওপর দিয়ে চলে গেল!

বহুলোকের হৈ হৈ শোনা গেল। একদল যুবক এতক্ষণ পর্যন্ত ঐ দৃশ্য দেখে রগড় উপভোগ করে যাচ্ছিল। ওরা হয়তো আন্দাজ করে নিয়েছিল কোনো একটা মজাদার নারী-ঘটিত ব্যাপার—তাই বুঝি ছেলেটা অমন মার খাচ্ছে—। কিন্তু কুলীকে শেষে লাইনে পড়তে দেখে যুবকদের মজাভঙ্গ হলো। তাপসীর বাবার দিকে ওরা এবার ধেয়ে এলো চীৎকার করতে করতে—ধর শালাকে! ধর শালাকে! মার শালাকে! মেরে ফ্যাল—

কুলীকে ট্রেনে কাটা পড়তে দেখে তাপসীর বাবা মুহূর্তের জন্ম হতভম্ব হন। তারপর যুবকদের ঐ চীৎকার শুনে তাঁর দারুণ ভয় ঢুকে গেল। তিনি আর এক মুহূর্তও দেরী না করে ছুট দিলেন। সে কী ছুট! তিন চারজন কুলী তো তাঁর ধাক্কায় মালসুদ্ধ পড়ে গেল। একজন কুলী তাঁর ধাক্কা খেয়ে মাল ফেলে দিল এক বুড়ীর ঘাড়ে। তাঁর পিছনে ছুটে আসছে একদল লোক চীৎকার করতে করতে। আর তিনিও দৌড়াতে দৌড়াতে অন্য প্ল্যাটফর্মে ঢুকে পড়েছেন। সেখান থেকে একটা ট্রেন ছেড়ে চলতে শুরু করেছে, তিনি সেই চলন্ত ট্রেনে ছুটতে ছুটতে উঠে পড়লেন। পিছনের লোকেরা ঐ ট্রেন ধরতে পারলো না।

। এগার ।

সে রাত্রেই অপূর্ববাবু ট্রেনে করে কাশী ফিরছেন, সঙ্গে তাপসী ও সুবীর।

স্টেশনে ঐ মর্মান্তিক ঘটনা ঘটার ফলে তিনি কলকাতার কোথাও যান নি, তাপসীদের বাড়ীতেও না, বা অন্য স্থানেও না। তাপসী আর সুবীরকে নিয়ে তিনি হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত এসেছিলেন, আবার হাওড়া থেকে রাত্রের ট্রেনে ফিরছেন।

তাপসীর বাবা যে অপূর্ব চরিত্রের পরিচয় দিয়েছেন—তাতে তাপসীর মাথা লজ্জায় কাটা যাচ্ছে! সে একটা ডানা-কাটা পাখির মতো ট্রেনের জানালার ধারে একটা সীটে নীরবে বসে আছে। অপূর্ববাবু বা সুবীরের দিকে সে একবারও মুখ তুলে তাকাতে পারছে না। সে কথা বলছে না, হাসছে না—এমন কি নড়াচড়াও বন্ধ! জানালা দিয়ে একটা স্টেশনের দিকে সে এখন এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে--

ট্রেনের মধ্যে সুবীর একসময় বললো, অপূর্ববাবু--

বলো সুবীর!

সুবীর প্রতিবাদ করে বলে উঠলো, না, না, সুবীর নয়—রবি! আমাকে 'রবি' বলুন, ও নামে আর নয়!

বেশ। রবি বলবো। তুমি কী বলছো এখন?

আমি বলছিলাম, বৃদ্ধ কুলী বেচারী তো আমাকে বাঁচাতে গিয়েই একান্ত হতভাগ্যের মত ঐ ভাবে ট্রেনে কাটা পড়লো! তা আপনি যদি ইচ্ছে করেন—ঐ কুলীর পরিবারকে কিছু অর্থ সাহায্য করতে পারেন?

তিনি সুবীরের দিকে তাকালেন। ওর মুখ এখনো বেশ ফুলে রয়েছে, মুখে হাতে চাবুকের বড়ো বড়ো ক্ষতচিহ্ন—তাপসীর বাবার দেওয়া এই ক্ষতচিহ্ন ওকে বহন করতে হবে বহুদিন। মাঝির মর্মান্তিক মৃত্যু থেকেই অপূর্ববাবু শোকাচ্ছন্ন, তার ওপর আজকের ঘটনায় চরম মর্মাহত! তাপসী কত ভালো মেয়ে!—কিন্তু তার বাবা একটা—!

তিনি বললেন, ঠিক বলছো, রবি। ঐ কথা আমার একদম মনে ছিল না। অন্ততঃ হাজার দুয়েক টাকা দিতে হয় কুলীর পরিবারকে—

সুবীর কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললো, কিন্তু অপূর্ববাবু, এখানে একটা বড়ো বিপদ আছে। আমরা যে সাহায্য করতে যাবো—কিন্তু তার পরিবার যদি আমাদেরকে দায়ী করে যে আমরাই ঐ কুলীকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছি—তখন পুলিস আমাদের ঝোলাবে!

হ্যাঁ- তা যা একটা কথা বলেছো!

কাশীতে একদিন ইন্দিরা দেবীর সঙ্গে সুবীরের দেখা হলো।

সুবীর সেদিন অপূর্ববাবু ও তাপসীর সঙ্গে যাচ্ছিল। হঠাৎ ইন্দিরা দেবীকে দেখতে পেয়ে সে তখন ভূত দেখার মতন চমকে ওঠে। সুবীরই প্রথম তাঁকে দেখতে পেয়েছিল, কিন্তু তিনি দেখতে পান নি ওকে। সুবীর সেই মুহূর্তে পথপার্শ্বে একটা দোকানে ছুটে গিয়ে ঢুকে পড়ে।

সুবীরের এই আকস্মিক ব্যাপারে তাপসী কিছু বুঝতে না পেরে পিছন থেকে জোরে ডাকলো—এ কি সুবীরদা, কোথায় যাচ্ছো—

এই ডাকে ইন্দিরা দেবী চমকে ঘাড় ফেরালেন। কলকাতা থেকে স্বামীর সাথে এখানে এসেছেন কাশীর বিশ্বনাথের পূজো দিতে ; প্রসাদও এখন তাঁর হাতে। তিনি নিকটেই ছিলেন, এদিক ওদিক তাকাতেই তাপসীকে দেখতে পেলেন। দেখতে পেয়েই স্বামীর হাতে প্রসাদের ঝুড়িটা তুলে দিয়ে তাপসীর কাছে ছুটে এসে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, তাপসী, তুই এখানে? তোদের বাড়ী গিয়েছিলুম আমি তোর খোঁজ নিতে, তখন তো নিখোঁজ হয়ে যাবার খবর পেলুম! তারপর বাড়ী এসে তোর জন্য অনেক কেঁদেছি। কাশীতে এলি তুই কি করে?

এই আকস্মিক ব্যাপারে তাপসী খুব লজ্জিতা। কী উত্তর দেবে—ভাবতে পারছে না। হঠাৎ তার একটা কথা মনে পড়লো—সুবীরকে এখন ধরিয়ে দিলে কেমন হয়? এই সুযোগে তাপসী কিছু ভেবে নিতে পারবে, প্রস্তুত হতে পারবে! সে বললো, মাসীমা, তোমার সেই ছেলে সুবীরদাও আছে এখানে। তোমাকে হঠাৎ দেখতে পেয়ে ঐ যে ঐ দোকানটায় লুকিয়ে আছে—

কই? কই সুবীর? কোথায় সে কোন্ দোকানে? ইন্দিরা দেবী সুবীরের জন্য একেবারে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন।

তাপসী দোকান দেখিয়ে দিল। সেই দোকানে প্রবেশ করতেই সুবীরকে তিনি দেখতে পেলেন, ওর একটা হাত ধরে বললেন—ওঃ! কী দুষ্টু ছেলে! আমাকে একেবারে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলি! আমি এদিকে তোর জন্য কেঁদে কেঁদে মরছি,—শেষে কাশীর বাবা বিশ্বনাথের পূজো দিতে এখানে ছুটে এলুম! আয় বাবা, একটু বাইরে আয়, তোকে ভালো করে দেখি—

অতঃপর ওকে নিয়ে তিনি রাস্তায় নামলেন। বাইরে এসে বললেন, ওঃ! কী দুষ্টু ছেলে তুই! আমাকে একটা চিঠি পর্যন্ত দিস নি! যাক গে—তুই যে কুমীরের মুখ থেকে বেঁচে এসেছিস—এর জন্য কাশীর বাবা বিশ্বনাথকে আমার কোটি প্রণাম! বলে

তিনি আঁখি মুদে করজোড়ে সেই দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালেন।

অপূর্ববাবু এবার ইন্দিরা দেবীকে বললেন, আপনি বোধ হয় তাপসীর সেই ইন্দু-মাসী? আপনার কথা তাপসীর কাছে অনেক শুনেছি, সুবীর তো আপনার পোষা ছেলে। এরা দুজনে বিচিত্র উপায়ে আমার কাছে এসে পড়েছে; এখনো আমার কাছেই আছে —আসুন না আপনারা আমার বাড়ীতে! আপনাদের এখন ছাড়ছি না—চলুন এখন আমার গৃহে—সেখানে গিয়ে সব ব্যাপার শুনবেন—যে ক'দিন ইচ্ছে সেখানে থাকবেন—আপনাদের একটু অতিথি-সেবা করার সুযোগ দিন আমাকে—

অতঃপর অপূর্ববাবু ওঁদের সবাইকে নিয়ে বাড়ী ফিরলেন—।

একটা ঘর তিনি ইন্দিরা দেবী ও তাঁর স্বামীর জন্য ছেড়ে দিলেন। কাশীর এক ধর্মশালায় ওঁরা দুজনে উঠেছিলেন, অপূর্ববাবু সেখান থেকে ওঁদের মালপত্র আনালেন। পাঁচ দিন ওখানে রইলেন ইন্দিরা দেবী। এ কয়দিন ওঁদের দিনগুলি খুব আনন্দে খুশীতে কাটলো। তিনি সুবীরকে ফিরে পেয়ে খুব আনন্দিত। সময় কাটতে লাগলো সুখের মধ্য দিয়ে। তিনি সুবীর ও তাপসীর অনেক কথা জানলেন, শুনলেন, মাঝির ওপর কৃতজ্ঞতায় তাঁর হৃদয় ভরে উঠলো; শেষে তাপসীর বাবার কথা শুনে একেবারে লজ্জায় মাথা নত করলেন।

পাঁচ দিন পর ইন্দিরা দেবী স্বামীকে নিয়ে ঘরে চললেন। সুবীর ও তাপসীকে তিনি সাথে করে কলকাতায় নিয়ে যেতে চেয়েছেন, ওরা যেতে রাজী হয় নি। তিনি কলকাতায় যাবার পথে ব্যাণ্ডেলে নেমে সুবীরের বাবা-মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ওর বর্তমান খবর দিলেন। অবশ্য সুবীর বার বার বারণ করে দিয়েছিল তাঁকে—যাতে তিনি ওর কোনো খবর বাড়ীতে না দেন। কিন্তু ইন্দিরা দেবী সুবীরকে ফিরে পেয়ে এতখানি আনন্দে মেতে উঠেছিলেন যে ওর

বাড়ীতে একটা খবর না দিয়ে পারেন নি।

সুবীরকে কুমীরে ভক্ষণ করেছে জেনে তার পিতামাতা অনেক আগেই তাঁদের মৃত পুত্রের অশৌচ পালন করে শ্রাদ্ধ শান্তি সেরে ফেলেছেন। এখন ওঁরা বিলম্ব না করে প্রয়োজনীয় ক'টা জিনিস নিয়ে কাশীযাত্রা করলেন।

এক দুপুরে অপূর্ববাবু তাঁর কাশীর বাড়ীতে দোতালার ওপর বাগানের দিকে একটা ঘরে বসে আছেন, ওই ঘরে সুধীর ও তাপসীও আছে।

তিনি বললেন ওদের, আজ তোমাদের আমার জীবনের ঘটনা বলে শোনাবো। শুনবে তোমরা?

তাপসী জিজ্ঞেস করলো, কবেকার ঘটনা জেঠ্যা?

তখন আমি সাঁইত্রিস বছরের। তারপর তিনি বলে যেতে লাগলেন—

আমার এক ছোট ভাই ছিল, তার নাম নচিকেতা। সে জন্ম থেকে এক চোখ অন্ধ। একচক্ষু হলে কি হবে, তাঁর হাতের টিপ ছিল দারুণ! লক্ষ্য ব্যর্থ হতো না। ছোটবেলা থেকে সে তীর ও গুলি ছুঁড়তে ওস্তাদ, দূর থেকে ঢিল ছুঁড়ে মাটির সরা ভেঙে দিতো।

পড়াশোনায়ও নচিকেতা খারাপ ছিল না। তবে সে অনেক বেশী কালো—কাঁচা পেঁপের খোলার মতো ওর গায়ের রঙ ছিল। অন্ধত্বের জন্য নচির দুঃখ কম ছিল না—

তখন আমরা সবাই কলকাতায় থাকি। বাবা, মা, আমি ও আমার মেয়ে আলেয়া, আর ভাই নচিকেতা। আমার স্ত্রী মারা যায় আলেয়ার জন্মের দু'বছর বাদে।

কলকাতায় বাবার একটা কারখানা ছিল। ঐ কারখানার আয়ে আমাদের পরিবারটা চলতো। আমি অবশ্য চাকরি করি। ভাই নচিকেতা কিছু করতো না, তবে কারখানায় মাঝে মাঝে বসতো

আর ব্যাঙ্কে টাকা জমা-তোলার প্রয়োজন হলে তখন ওকে পাঠানো হতো।

আমার বাবা ছিলেন ভীষণ রাগী ও গম্ভীর। কোন অন্যায় তিনি সহ্য করতেন না। ছোটবেলায় বাবার পকেট থেকে একবার পয়সা চুরি করতে গিয়ে তাঁর হাতে ধরা পড়েছিলুম, তিনি তখন বেত দিয়ে এমন মার মেরেছিলেন—সাতদিন আমার গায়ে অসহ্য ব্যাথা ছিল। আমার লুকিয়ে সিগারেট খাওয়া দেখতে পেয়ে তিনি এমন একটা চড় দিয়েছিলেন আমার গালে—আমি ঘুরে তক্ষুণি পড়ে গেলুম মাটিতে।

যাই হোক। নচি একদিন বাবার কাছে পাঁচ হাজার টাকা চাইলো। সে কী কারণে টাকা চেয়েছিল, আমি তা জানি না। বাবা কিন্তু টাকা দেন নি। তার ঠিক দু'দিন বাদে নচিকেতার হাতে ছয় হাজার টাকা দিয়ে ওকে ব্যাঙ্কে পাঠান হল ঐ টাকা জমা দিতে। টাকা জমা দেবার রসিদে বাবা সই দিতেন, কিন্তু টাকা কখনো গুনে দিতেন না। ব্যবসায়ের টাকা-পয়সার সমস্ত হিসাব রাখতেন ক্যাশিয়াব সোমনাথবাবু, তিনি টাকা গুনে দিয়েছিলেন।

সোমনাথবাবুর সম্বন্ধে একটু বলি। তিনি বাবার দূর সম্পর্কের গরীব আত্মীয়। বয়েস ষাট। বাবা তাকে দয়া করে চাকরি দিয়ে রেখেছিলেন অনেককাল ধরে, আর তিনি বিশ্বস্ততার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছিলেন। সোমনাথবাবু কোনদিন একটা টাকাও সরান নি। বাবা তাঁর ওপর টাকাকড়ির সমস্ত ভার ছেড়ে দিয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকতেন। গ্রামের বাড়িতে তাঁর পরিবার থাকতো, তিনি মাসে একবার দু'দিনের ছুটি নিয়ে সেখানে যেতেন। কারখানায় বহুকাল ধরে কাজ করছিলেন বলে সবাই তাকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। কারো সাথে তিনি বাজে কথা বলতেন না, সব সময় নিজের মনে কাজ করে যেতেন। ভালো-মন্দ কোন নেশা তাঁর ছিল না, আড্ডা মারতেও যেতেন না। আমাদের বাড়ী থেকে তাঁর দু'বেলা দু'মুঠো

অন্নের সংস্থান হতো, তিনি আমাদের বাড়ীর এইটা ক্ষুদ্র নিরিবিলি কক্ষে থাকতেন।

সুবীর জিজ্ঞেস করলো, কলিকাতার ঐ কারখানা কি এখনো আছে?

অপূর্ববাবু বললেন, না,। আমিই বিক্রি করে দিয়েছি—

তাপসী বললো, কেন সুবীরদা, গল্পের মাঝে বিঘ্ন সৃষ্টি করছো? তুমি ভীষণ ইয়ে—!

সুবীর বললো, বাঃ, তুমি আমাকে ফের 'সুবীর' বলছো! বলছি না—ঐ নামে আমাকে ডাকবে না!

তাপসী মুখ টিপে হেসে বললো, বেশ করবো! ঐ নামে আবার ডাকবো! আমি কখনো 'রবিদা' বলবো না—

তিনি বললেন, এটা গল্প নয়—সত্যি ঘটনা।

তারপর বললেন, নচিকেতা সেই যে টাকা নিয়ে ব্যাঙ্কে দিতে গেল, আর ফিরলো না। পরে ব্যাঙ্কে খোঁজ নিয়ে জানা গেল—টাকা একদম ব্যাঙ্কে জমা পড়ে নি।

বাবা তারপর আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধবের বাড়ী খোঁজ করলেন। কিন্তু ভাইকে কোথাও পাওয়া গেল না। তখন তিনি পুলিসে খবর না দিয়ে আর পারলেন না। বাবার স্থির ধারণা জন্মালো, তাঁর ছেলেই তাঁর টাকা নিয়ে বাড়ী থেকে পালিয়েছে—কেননা সে-ই তো পাঁচ হাজার টাকা তার বাপের কাছে চেয়ে পায় নি—

তারপর একটা কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো যে, ছেলে চোর, ছেলে তার বাপেরই টাকা চুরি করে ঘর থেকে পালিয়েছে। ...সেই সব বাইরে প্রকাশ করলে? নচি না হয় আমাদের ছয় হাজার টাকা নিয়ে গেছে—তজ্জন্য ঐ দুর্ণাম শুনতে হবে আমাদের ছেলের বাপ-মা হয়ে! কি দরকার ছিল ঘরের কথা প্রকাশ করে এই দুর্ণাম কেনবার—ডাকাতরাও তো আমাদের ঐ টাকা লুঠ করে নিয়ে যেতে পারতো! আত্মীয় স্বজনের কাছে এখন আর মুখ দেখাতে

পারবো! এই দুর্নাম এখন আর মুছবে না—যতদিন আমরা বাঁচবো, ততদিন আমাদের শুনে যেতে হবে—

বাবা কোনো অন্যায় সহ্য করবেন না, ছেলের অন্যায়ও না। যে-ছেলে নিজের বাপের টাকা চুরি করে, সে অন্যের টাকায়ও হাত দিতে পারে। কিন্তু, শেষে তিনি মায়ের কথা বুঝলেন—সত্যিই ও-ব্যাপারটা চেপে গেলে ভালো হতো—! এই সময় তিনি একটা মহা অন্যায় করে ফেললেন ছেলের দুর্নাম মুছে দেবার জন্য।

বাবা সোমনাথবাবুর নামে একটা কেস করে দিলেন যে, তিনিই ক্যাশ থেকে নগদ ছ'হাজার টাকা সরিয়ে ফেলেছেন ব্যাঙ্কে জমা দেবার নাম করে। তাই আজও ঐ ছ'হাজার টাকা ব্যাঙ্কে জমা পড়ে নি। আর ক্যাশ বাক্সেও নেই—অথচ ক্যাশবইয়ের সঙ্গে নগদ টাকার হিসাব মিলছে না - ছয় হাজার টাকা কম!

নচিকে টাকা দেবার সময় সোমনাথবাবু ক্যাশবইয়ে লিখেছেন। কিন্তু ঐ টাকা ব্যাঙ্কেও নেই, ক্যাশও নেই দেখে পুলিস এসে তাঁকে পাকড়ালো!

তারপর মামলা চললো। দৃঢ় কণ্ঠে বাবা আদালতে জানালেন যে ছেলে নচিকেতা টাকা নিয়ে নিরুদ্দেশ হয় নি। সে নিখোঁজ হয়েছে সম্পূর্ণ অন্য কোনো কারণে,—তার সঙ্গে টাকা-পয়সার কোনো সম্পর্ক নেই। ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিতে সে মোটেই যায় নি। সে ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিতে বা তুলতে গেলে একটা পয়সাও এদিক ওদিক করে না, বাবা সম্পূর্ণ হিসাবে বুঝে পান। নচি তাঁর মোটেই কু-ছেলে নয়। ভগবান তাকে অন্ধ করেছেন! সে কক্ষনো ওরকম কু-কাজ করতে পারে না!...

নচি ইতিমধ্যে ফিরে আসে নি। আর বাবা, বাইরে কোথাও একথা একবারও প্রকাশ করেননি যে, নচি তাঁর কাছে একদিন পাঁচ হাজার টাকা চেয়েছিলেন। কাজেই ওর যে ওই সময় টাকার খুব প্রয়োজন ছিল—একথা কারো মনে উদয় হলো না।

আদালতে বাবার টাকার সাক্ষী যোগাড় হতে বেশী সময় গেল না। সাক্ষীদের মধ্যে কেউ আদালতে বিচারকের সম্মুখে সাক্ষী দিল যে, নচিকেতার মাথাটা একটু খারাপ আছে, মাঝে মাঝে বিড়বিড় করে বকে। এমন কি হঠাৎ সে দু-চারদিনের জন্য নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। —নচেৎ সে খুব ভালো লোক। অপর একজন সাক্ষী দিল যে, সে নিজেই নচির বাল্যকালের সখা—ওকে সে ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছে। টাকা-পয়সার প্রতি ওর কোন আকর্ষণ নেই—যেন রামকৃষ্ণদেব! নচির মনটি বৈরাগ্যে পূর্ণ। ছেলেবেলা থেকে সাধু-সঙ্গের দিকে নচির একটা আকর্ষণ আছে—সাধুসঙ্গে প্রায়ই যেতো —কাজেই এবারে ওখানে যাওয়া তার বিচিত্র নয়। আরো দু'জন সাক্ষী দিল যে, টাকা চুরি যাবার আগে সোমনাথবাবু ওদের কাছে হাজার পাঁচেক টাকা ধার চেয়েছিলেন, কিন্তু অত টাকা ধার দেওয়া ওদের সাধ্য হয়নি। অপর একজন সাক্ষী বললো, টাকা চুরি যাবার আগে সোমনাথবাবু নাকি তার কাছে দু'দিন জানতে চেয়েছিলেন—কোথায় গেলে সহজ ও অল্প শর্তে হাজার পাঁচ-ছয়েক টাকা ঋণ সত্বর পাওয়া যাবে—

কাজেই এইসব চক্রান্তের ফলে বিচারকের দৃষ্টি গিয়ে পড়লো সোমনাথবাবুর ওপর। আর সোমনাথবাবু অত্যন্ত গোবেচারী। তাঁর পক্ষে কেউ কোন সাক্ষী দিল না। কারখানায় যারা তাঁকে ভালোবাসতো তারাও এলো না তাঁর সাক্ষী দিতে। কে-ই বা আসবে? চাকরি হারাবার ভয় তো প্রত্যেকের!

আদালতে যেদিন মামলার শেষ রায় বেরোবে, সেদিন আমিও গিয়েছিলাম আদালতে, সঙ্গে আমার মেয়েও ছিল। বাবা-মা আর সোমনাথবাবুর বাড়ীর লোক ছিলেনই। তা ছাড়া আরো অনেক লোক ছিল, আদালত-কক্ষ সেদিন পরিপূর্ণ। সোমনাথবাবু আদালতের কাঠগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন মাথা নিচু করে। জজ্ রায় দিলেন - টাকা চুরির অপরাধে সোমনাথ গুহকে দুই বৎসরের

জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হলো—এমন একটা ঘটনা ঘটলো—

অপূর্ববাবুর বলা শেষ হলো না, তাঁর দু'চোখে অশ্রু দেখা দিল।

তাঁর অশ্রু দেখে সুবীর আর তাপসী ভাবলো, এবার বুঝি কোন একটা শোকাবহ দৃশ্য এসে পড়েছে --

তাপসী বললো, তারপব কি হলো জ্যেঠা ?

বেয়ারাকে চা আনতে বলা হয়েছিল, হিন্দুস্থানী বেয়ারাটা এসে চা দিয়ে গেল : অপূববাবু চা হাতে নিয়ে বললেন, কিরে রামলাল, এত দেরী করলি ?

সে জানালো, হিটারের তার কেটে গেছে !

তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে চায়ে একটা চুমুক দিয়ে বললেন, এর পর আর শুনবে ? না, থাকবে বাকী ?

সুবীর আর তাপসী একজোটে বললো, হ্যাঁ, সবটাই শুনবো !

তবে শোনো। ঠিক সেইসময়ে আদালত-কক্ষে ভিড়ের মধ্য থেকে একজন তীব্র চীৎকার করে উঠলো—না, বিচারপতি, না, সোমনাথবাবুকে মুক্তি দিন- উনি সম্পূর্ণ নির্দোষ ! সোমনাথবাবু একটা টাকাও চুরি করেন নি, টাকা নিয়েছি আমি ! ওঁকে আপনি ছেড়ে দিন। শুনুন বিচারপতি, আমার কথা আগে শুনুন—বলতে বলতে সে ভিড় ঠেলে সন্মুখে এগিয়ে এলো।

ঐ লোকটা আর কেউ নয় -আমার ছোট ভাই নচিকেতা। ওর এই আকস্মিক আবির্ভাবে কক্ষের সবাই চমকে উঠছে। আমিও নচির দিকে তাকালাম, দীর্ঘদিন পর ওকে দেখে চমকে উঠলাম। এ কি ওর চেহারা ! শরীর ওর এই বয়সেই ভেঙে গেছে। রোগা। মাথায় বেশ বড়ো বড়ো চুল !

নচিকেতা এবার সজোরে বলতে লাগলো, শুনুন বিচারপতি— আমিই নচিকেতা। আমি ঐ ছয় হাজার টাকা নিয়েছি—আমার কথা আগে সব শুনুন—তারপর যা ইচ্ছে শাস্তি আমায় দেবেন—

আমিও মাথা পেতে নেবো !

তারপর সে (বাবার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে) বললো—ঐ যে-লোকটা দণ্ডায়মান, ও আমার বাবা অলোক সেনগুপ্ত, আর পাশে যে মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে সে সন্ধ্যা সেনগুপ্ত—আমার মা। ওদের টাকা আমি নিয়েছি—বেশ করেছি। কেন নেবো না! হাজার বার নেবো ! শুধু টাকা কেন, ঐ শয়তান দুটোর বাড়ী-ঘর-সম্পত্তি সব পুড়িয়ে ভস্ম করে দেবো ! আজ আমার একচোখ অন্ধ, কালো গাত্রবর্ণ। এই অন্ধত্বের জন্য, কালোবর্ণের জন্য আমি আজ পৃথিবীতে অবহেলিত, অপমানিত, পদদলিত—কিন্তু কেন? এর জন্য দায়ী কে ?

মহামান্য বিচারপতি, আপনি হয়তো এক্ষুণি বলবেন—ওদের ম্যারেজ হয়েছিল। কাদের কবে একদিন বিয়ে হয়েছিল কিনা—তা দেখবার আমার আদৌ প্রয়োজন নেই! আমি জানতেও চাই না! বিয়ে হওয়া দুটো নর-নারীর আভ্যন্তরীণ একটা যৌন-ব্যাপার। আমাকে এই পৃথিবীতে আমৃত্যু একচক্ষু নিয়ে নীরবে মরতে হবে, সক·· জীবন-যাতনা মুখ বুজে সহ্য করতে হবে, আমাকে সব রকম সাফার পেতে হবে—এই-ই আমার কাছে বড়ো কথা।

আদালত কক্ষ তখন পাথরের মতন নিস্তব্ধ। সবার মুখ বক্তার দিকে। বিচারপতি অবাক হয়ে গম্ভীর মুখে শুনে যাচ্ছেন। আর নচির গলা সারা কক্ষে ছড়িয়ে পড়ছে।

নচিকেতা আবার বললো, সম্মানীয় বিচারপতি, আপনি তো ন্যায় বিচারের জন্য আপনার ঐ আসনে আসীন হয়েছেন। শুধু টাকা চুরি কেন, চুরি, ডাকাতি, খুন, জখম, মারামারি, কাটাকাটি, টাকাকড়ি, ঘরবাড়ী, জায়গা-জমি, ধন-দৌলত ইত্যাদির জন্য তো বিচারপতিরা আইন-সংরক্ষণ করেন, ন্যায় বিচার করেন। কিন্তু আমাদের মত হতভাগ্যদের জন্য কোন আইন সংরক্ষিত আছে কি ?

বলতে বলতে সে একটা পিস্তল বার করলো, কেউ কিছু করবার

আগেই গুড়ুম গুড়ুম করে দুটো গুলির শব্দ শোনা গেল। পরক্ষণে গুড়ুম করে আবার একটা গুলির শব্দ! ঘর কেঁপে উঠলো, ঘরের মধ্যে যেন বজ্রপাত শুরু হয়েছে!

তারপরেই হুলুস্থুল কাণ্ড পড়ে গেল আদালত-কক্ষের মধ্যে। চীৎকার আর ঘর থেকে বেরোবার জন্য ঠেলাঠেলি! আমি আগেই বলেছি, নচির হাতের লক্ষ্য অব্যর্থ! বাবা-মা-র রক্তাক্ত গুলিবিদ্ধ মৃতদেহ মেঝেতে পড়ে রইলো! বিচারপতিও হতভম্ব! আর যেখানে নচি দাঁড়িয়ে বলে যাচ্ছিল, সেখানে তার মৃতদেহটা পড়ে। শেষে গুলিটা নচি নিজের বুকেই মেরেছে।

এতক্ষণ বলে অপূর্ববাবু থামলেন!

সুবীর ও তাপসী একমনে শুনে যাচ্ছিল সুবীর জিজ্ঞেস করলো, আর সোমনাথবাবুর কী হলো?

উনি ছাড়া পেয়ে গেলেন। তাঁর বিরুদ্ধে বলবার তো আর কেউ ছিল না—

তাপসী বললো. জ্যেঠু, তারপর?

তিনি বললেন, আদালত-কক্ষের ঘটনা এখানেই শেষ। বাবা মা-ভাই তিনজনেই মারা গেলেন। আমি শুধু বাড়ীতে একা মেয়ে আলেয়াকে নিয়ে। পরে আমি কলকাতার সেই বাড়ী ও কারখানাটা বিক্রি করে দিয়েছি। আমার মেয়েটাও মারা গেল—

ঠিক সেই সময় বাড়ীর হিন্দুস্থানী বেয়ারা ঐ কক্ষে প্রবেশ করে জানালো—ব্যাণ্ডেলসে এক আদমী আউর এক জেনানা এসেছেন, নীচের বয়ঠকমে বসতে দিয়েছে—

অপূর্ববাবু সুবীরকে বললেন, তোমার বাবা-মা এলেন বোধ হয়। যাও রবি, তুমি একবার দেখা করে এসো—

সুবীরের রাগ চড়ে গেল তার বাপ-মায়ের আবির্ভাবে। অপূর্ববাবুর কথায় সে কোনো উত্তর দিল না বা দেখা করতে গেল না।

তিনি আবার বললেন, কৈ রবি, দেখা করতে যাবে না? যাও, যাও—একবার দেখা করে এসো—

সুবীর বললো, আপনি যা বলেছিলেন বলুন না! আমি দেখা করতে যাবো না—আমি বাপ-মা কিছু মানি না—

যাও রবি, তুমি একবার অন্ততঃ দেখা দিয়ে এসো। পরে আমার কথা শুনবে।

অপূর্ববাবুর সঙ্গে সুবীর তর্ক করতে রাজী নয় বা কথা বাড়াতে চায় না। রাগে তার গা ফেটে যেন আগুন বেরোতে লাগলো—শালা, ঐ শয়তান দুটো আবার কাশীতে এসেছে আমাকে আক্রমণ করতে! কোথাও গিয়ে ওদের হাত থেকে রেহাই নেই! দাঁড়াও, ভালো করে দেখা দিচ্ছি—!

কী ভেবে সুবীর উঠে দাঁড়ালো, বললো, আমি যতক্ষণ না আসছি ততক্ষণ আপনি যেন কোনো ঘটনা বলবেন না তাপসীকে। আমি এলে তারপর আপনি শুরু করবেন—। বলে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

বেয়ারাকে নিয়ে সুবীর পাশের ঘরে ঢুকে বললো, ওই দোর গোড়ায় দাঁড়াও। বলেই সে কাগজ-কলম নিয়ে খসখস করে লিখতে লাগলো—

তোমরা আবার কাশীতে ছুটে এসেছো আমার সঙ্গে দেখা করতে? আমাকে আক্রমণ করতে? তোমাদের একটু লজ্জাও হচ্ছে না? তোমরা ফিরে যাও। আমি আজ তোমাদের ছেলে নই।

অতঃপর চিঠিটা ভাঁজ করে সে বেয়ারার হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিল!

তারপর সে অপূর্ববাবুর কাছে ফিরে এসে বললো, বলুন এবার—

তিনি ভাবলেন, ও বুঝি বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা করে এসেছে। বললেন, দেখা দিয়েছো? তা হলে বসো—

সুবীর নীরবে মাথা নেড়ে সায় দিল—যেন সত্যিই দেখা করেছে।

তিনি বলতে লাগলেন, আমার আলেয়াকে অসুখে ধরলো। কী যে ওর ব্যায়রাম ছিল - মাঝে মাঝে দারুণ পেটে বেদনা উঠতো। ও তখন কেঁদে অস্থির হোতো। আমি আলেয়ার গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দিতাম। আলেয়া আমার খুব ভালো মেয়ে ছিল। বড়ো ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করানো হয়েছিল, ওকে অনেক ওষুধ খাওয়ানো হয়েছে—তবুও রোগ ঠিক সারে নি।

তাপসী জিজ্ঞেস করলো, আপনার মেয়ে তখন কত বড়ো?

ঠিক তোমার মতন হবে, তিনি উত্তর দিলেন, আলেয়া বছর ষোলো তখন। ঐ বয়সেই সে মারা গেল!

তারপর বললেন, ডাক্তাররা অনেকদিন পর জানালেন, ওর পেটে টিউমার জাতীয় কী একটা হয়েছে—অপারেশন করাতে হবে—। সেই অপারেশনের সময় আলেয়া মারা যায়! আমায় ছেড়ে ও চলে গেল -

অপূর্ববাবুর চোখে জল এসে পড়লো, তিনি থামলেন।

কিছুক্ষণ পর আবার বললেন, আলেয়া জীবনের শেষের দিকে আমাকে ওর কাছে আসতে দিতো না। ওর ঘরে ঢুকলেই সে চ্যাঁচাতো, বলতো—বাবা, তুমিই তো আমার এই যন্ত্রণার জন্য দায়ী! তুমি আমায় জন্ম না দিলে আমার জন্ম হতো না—সাথে আমার কোনো যন্ত্রণাও থাকতো না! আমার জীবনের সব যাতনার জন্য একমাত্র তুমিই দায়ী...। আজ আমি বুড়ো হয়েছি, তবুও ওর কথা ভুলতে পারি নি একদিনের জন্যও। প্রতিদিনই আলেয়ার স্মৃতি আমার মনে ভেসে ওঠে, ওর কথাগুলিও। অনেক অভিমান বুকে নিয়ে মরেছে আলেয়া! সত্যিই তো ও সম্পূর্ণ নির্দোষ! আমার জন্য সে তার জীবনে রোগ যাতনা, মৃত্যু-যন্ত্রণা—সব সহ্য করেছে! পরে আমি বুঝেছি ওর সব কথাগুলো। আমার বন্ধু অসীমের

বারো বছরের মেয়েটার ছটো চক্ষু বসন্তে নষ্ট হয়ে গেছে—আমৃত্যু তাকে অন্ধ হয়ে থাকতে হবে ; ঐ মেয়েটার এখন অধিকার আছে তার বাপ-মাকে হাজার বার ধিক্কার দেবার! আঃ! বুকে আমার কী যন্ত্রণা! হায়! আমার আলেয়া আর বেঁচে নাই! সত্যিই তো সে আমার জন্য কষ্ট ভোগ করে গেছে। কিন্তু হায়, আর কোনো-দিনই তার কাছে একটি বারও ক্ষমা চাইতে পারবো না! ওর মৃত্যুর পর থেকে এই বেদনা বুকে নিয়ে আমি জ্বলছি—আঃ! বুকটা জ্বলে গেল—

বলতে বলতে গুলি খাওয়া ব্যক্তির মতন দুহাতে তিনি নিজের বুকটা চেপে ধরলেন পাঞ্জাবির ওপরে দৃঢ় মুষ্টিতে। তারপর মাথাটা সম্পূর্ণ নীচু করলেন—

সুবীর এইসময় দোতলার ঐ ঘর থেকে নীচে বাগানের দিকে একটু তাকালো এবং দেখতে পেল তার বাবা-মাকে ধীরে ধীরে হেঁটে ঐ বাগান পার হয়ে চলে যেতে।

শেষ